আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ঊনবিংশ-বিংশ যুগ্ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৯ আশ্বিন ১৪২৬

অমিয়কুমার বাগচী নিত্যপ্রিয় ঘোষ আজিজুর রহমান খান
দেবেশ রায় সৌরীন ভট্টাচার্য পবিত্র সরকার মালিনী ভট্টাচার্য
অরুণ সোম সুভাষ ভট্টাচার্য অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় আশীষ লাহিড়ী
অর্ধেন্দু সেন মানসপ্রতিম দাস স্থবির দাশগুপ্ত যশোধরা রায়চৌধুরী
অমিতাভ গুপ্ত মইদুল ইসলাম মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র অমিতাভ রায়
সেমন্তী ঘোষ তৃষিতানন্দ রায়

মূল্য : ৫০ টাকা

A comprehensive step ahead therapy that

Relieves...Repairs...Revives...Revitalizes...Rejuvenates

MAXMALA FORTE

Pregabalin 75 mg + Mecobalamin 750 mcg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Pyridoxine-5-Phosphate 3 mg

MAXMALA

Pregabalin 75mg+Mecobalamin 0.75mg+ALA 100mg

MAXMALA 50

Pregabalin 50mg+Mecobalamin 0.75mg+ALA 100mg

Does a lot more so that they can do a lot more

SYMENTA

a SUN PHARMA division

L2153054

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ঊনবিংশ-বিংশ যুগ্ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৯, আশ্বিন ১৪২৬
Vol. 7, Issue 19th-20th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদ ছবি: শৈলেন মিত্র

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা / বিশেষ সংখ্যা ৫০ টাকা
বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয় ৫

আমার স্বপ্নের বাজেট
অমিয়কুমার বাগচী ৭

গান্ধী— রবীন্দ্রনাথ
নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১১

বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ ও উন্নয়নশীল বিশ্ব: কিছু ভাবনা
আজিজুর রহমান খান ১৪

আইজাজ আহমদ-এর সঙ্গে দূরত্ব
দেবেশ রায় ১৮

আপোশহীনতার অলিগলি
সৌরীন ভট্টাচার্য ২০

হাবারামের (নির্-) ঈশ্বরচিন্তা
পবিত্র সরকার ২৩

পিসিদের কথা
মালিনী ভট্টাচার্য ৩০

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে
অরুণ সোম ৩৫

এদেশের পাখিচর্চার কয়েকটি দিক
সুভাষ ভট্টাচার্য ৪১

নবযুগ আনবে না?
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ৪৫

দ্বিশতবর্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত
আশীষ লাহিড়ী ৪৯

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বিড়ালের দশামুক্তি
অর্ধেন্দু সেন ৫৫

দেবীপ্রসাদের জার্মানযোগ
মানসপ্রতিম দাস ৫৯

কোষ-কাহিনির ট্যুইস্ট— একটি ভূমিকা
স্থবির দাশগুপ্ত ৬৪

স্মৃতি সত্তার জাদুঘর! ভবিষ্যতের জাদুঘর!
যশোধরা রায়চৌধুরী ৭০

টাকা দিয়ে যা কেনা যায় এবং যায় না
অমিতাভ গুপ্ত ৭৪

লোকবাদ কাকে বলে?
মইদুল ইসলাম ৭৭

বিস্মৃতপ্রায় অবিস্মরণীয় এক ছাত্রআন্দোলন
মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র ৮৩

আলোর বাইরে
অমিতাভ রায় ৮৯

গণতন্ত্র ও হিজিবিজি ভাবনা
সেমন্তী ঘোষ ৯৩

স্মৃতির সরণি ধরে চলতে চলতে
তৃষিতানন্দ রায় ৯৬

বৈ-চিত্র প্রকাশন

আমাদের বই

বইচুটি

মণির পাহাড়
বিভিন্ন সোভিয়েত রাজ্যের উপকথা সংকলন
সম্পাদনা: অরুণ সোম
প্রচ্ছদ: মূলানুগ
৪৫০.০০

পুটুর নাম খরগোশটি
অনুবাদ: অমিতাভ চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ: অমিতাভ চক্রবর্তী
১৫০.০০

চলচ্চিত্রে তৃতীয় দুনিয়া: ইরান
মানস ঘোষ
প্রচ্ছদ : অমিতাভ চক্রবর্তী
৩০০.০০

তান্নার দিম্মা
ইন্দ্রাণী বড়ুয়া
প্রচ্ছদ: অমৃতা সেন
১৫০.০০

দক্ষিণ আফ্রিকার Journal
চয়নিকা চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ : অমিতাভ চক্রবর্তী
২৫০.০০

তানভীর মোকাম্মেল :
কিছু কাজকর্ম কিছু বেঁচে থাকা
সাক্ষাৎকার: শিলাদিত্য সেন
৩০০.০০

তিনি দয়াময়ী
প্রশান্ত মাজী
২২৫.০০

Talks in China - Rabindranath Tagore
edited by Leonard Elmhirst
250.00

চা : ইতি বৃত্ত, আবাদ ও প্রস্তুতপ্রণালী :
শচীন্দ্রনাথ ঘোষ
সম্পাদনা : প্রসাদরঞ্জন রায়
২২৫.০০

হিরোশিমা মন আমুর : মার্গারেট দ্যুরাস
স-টীক বঙ্গানুবাদ : অর্পিতা মুখোপাধ্যায়
২০০.০০

প্রকাশিতব্য বইএর তালিকা

শিকারী হালুম	দীপান্বিতা রায়
আমার সেলিনগুলো	দীপ্ত দাশগুপ্ত
দেশে দেশে	এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
দরোজায় টুংটাং	নন্দিতা বসু

চিত্রনাট্য : ম্যাসকুলাঁ ফেমিনাঁ
স-টীক বঙ্গানুবাদ : সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য : পিয়েরো লা ফু
স-টীক বঙ্গানুবাদ : সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
বিনু বান্নির গপ্পো — অনুবাদ : অমিতাভ চক্রবর্তী
কবিতা সংগ্রহ — সম্পাদনা : অমিতাভ গুপ্ত
চলচ্চিত্রে তৃতীয় দুনিয়া : লাতিন আমেরিকা
মানস ঘোষ
Boichitra Classics - An Account of Egypt
by Herodotus Translation(en) : G. C. Macaulay
হেরোডোটাসের মিশরের কথা
স-টীক বঙ্গানুবাদ : অমিতাভ চক্রবর্তী
লেন্সের বাইরে — সুনীল দত্ত
ভগিনী নিবেদিতার ভারতের ইতিহাসের পদচিহ্ন
স-টীক বঙ্গানুবাদ : অরূপ কুমার দে
উষা গাঙ্গুলি : জীবন ও নাটক চয়নিকা চক্রবর্তী
নিগ্রো জাতির নূতন জীবন — রামনাথ বিশ্বাস
মাউ মাউএর দেশে — রামনাথ বিশ্বাস
আফগানিস্তান ভ্রমণ — রামনাথ বিশ্বাস
তরুণ তুর্কি — রামনাথ বিশ্বাস

আজব দেশে অ্যালিস :
লিউইস ক্যারল
স-টীক বঙ্গানুবাদ:
রাজশ্রী মুখোপাধ্যায় ও সুমিতা সামন্ত
৩৭৫.০০

নাম গুম যায়ে (নেতাজি : সত্য মিথের মাঝখানে)
দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়
১৮০.০০

আত্মজীবনীর মতো :
আকিরা কুরোশাওয়া
স-টীক বঙ্গানুবাদ
ঐত্রেয়ী সরকার
৩৭৫.০০

আউতোবিয়োগ্রাফিয়া :
হোর্খে লুইস বোর্খেস
স-টীক বঙ্গানুবাদ :
অর্পিতা মুখোপাধ্যায়
২৫০.০০

A Pearl in the Oyster
short stories
Ludmilla Chakrabarty
400.00

প্রাপ্তিস্থান : আবার বৈঠক, দে'জ, দে বুক স্টোর, আদি দে বুক, ধ্যানবিন্দু, কথাশিল্প, সুপ্রকাশ বইঘর, আবার বৈঠক (কলকাতা, হায়দ্রাবাদ) ফার্স্ট ফ্লাশ (গড়িয়াহাট), হ্যালো হেরিটেজ(নজরুল তীর্থ), U.N Dhar & Sons, Chuckervertty Chatterjee Oxford bookstore, Starmark, Read Bengali Book Store, বিশ্ব-বাংলা, (রামকৃষ্ণ পেপার এন্ড বুকস ও বইওলা বুক কাফে,শান্তিনিকেতন), amazon.in, readbengalibooks.com

61/7 Station Road, Dhakuria, Kolkata - 700 031 9051333775, 9830482375 | boichitraprakashan@gmail.com

আরেক রকম

প্রকৃতির নিয়ম মেনে আশ্বিনের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মাঠে কাশফুল, ভোরের ঘাসে শিশিরের বিন্দু। বাংলায় এসে গেল শারদীয় উৎসব। উৎসব এলেও মানুষের জীবনে শান্তি আসেনি। দেশের অর্থব্যবস্থা অতল গহ্বরের দিকে তীব্র গতিতে ধাবমান, বাড়ছে বেকারত্ব, কৃষি সংকট, কমে আসছে আর্থিক বৃদ্ধির হার। তবু সরকার নির্বিকার। শুধু কর্পোরেটদের কীভাবে আরো মুনাফা পাইয়ে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে দেশের আর্থিক নীতি। বিরোধীরা দিশাহীন। বিজেপি রাজ্যে বিভাজনের উদ্দেশ্যে এনআরসি-র প্রচলন করতে উদ্যত, যেখানে অসমে ১৯ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রহীন। তদুপরি অমিত শাহ 'এক দেশ-এক ভাষা-এক দল'-এর মতো নাৎসি চিৎকার শুরু করেছেন। একটি আস্ত রাজ্যের মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে, গোটা কাশ্মীরকে জেলখানায় পরিণত করছে মোদী সরকার। কাশ্মীরে লাগাতার অত্যাচারের প্রশ্নে বাকি দেশের মানুষের একাংশ নির্বিকার, অপর অংশ আনন্দে আত্মহারা। কাশ্মীরের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে গেলেও, উৎসব নেই কাশ্মীরে। রাজ্যে অরাজকতা চরমে। ইতিমধ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ কেন দেখা করলেন কেউ জানে না। শুধু আমাদের ভয় বাড়তে থাকে।

প্রত্যেক বছরের মতন এই বছরেও *আরেক রকম*-এর পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শারদ শুভেচ্ছা মেশানো বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা। ক্ষণিকের ভুলে থাকার মধ্যেও সমাজ-রাজনীতির অন্ধকার সময়ের কথা মনে করাবে এই সংখ্যা, যাতে উৎসবের পরে অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বহমান প্রতিরোধ আরো দৃঢ় করা যায়। আমাদের পাঠক, লেখক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞাপনদাতা, পরিবেশক, বিক্রেতা এবং ছাপাখানার বন্ধুদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, আমাদের পাশে থাকার জন্য।

mio
amore
TM
THE CAKE SHOP

আমার স্বপ্নের বাজেট

অমিয়কুমার বাগচী

এই বাজেট রচনা করার সময় আমি ধরে নিচ্ছি যে ভারতবর্ষ ধনতন্ত্রী দেশ থাকবে এবং এখনকার মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কর ধার্য করার এবং বিভিন্ন খাতে খরচ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকবে। এটা নিশ্চয়ই আদর্শ ব্যবস্থা নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অনেক বেশি বাস্তবানুগ।

১৯৯১ সালের আগে আমাদের গণতন্ত্র বা বাজেট মোটেই জনাভিমুখী ছিল না, কিন্তু সরকারের তরফে খানিকটা চেষ্টা ছিল লোকেদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চাষিদের কাছে ব্যাঙ্কের কর্জ সুলভ্য করা, কতকগুলি বড়ো বড়ো শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত রেখে সাধারণের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা।

এই সমস্তই বদলে গেল যখন ১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের ফতোয়া অনুযায়ী আর্থিক সংস্কার শুরু হল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ছোটো ও মাঝারি চাষিকে লোন দেওয়া কমিয়ে দিল, অনেক জায়গায় ব্যাঙ্কের শাখা অলাভজনক বলে বন্ধ করে দেওয়া হল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়ের বৃদ্ধির হার কমে গেল। তাপস মজুমদার কমিটি যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগ ব্যয়ের সুপারিশ করেছিল, সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগও প্রতি বছর পৌঁছোত না (এখন সেটা শতকরা ৩.৮ ভাগ)।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের অবস্থা আরো করুণ। এই অবস্থা নরসিম্‌হা রাও সরকার, ইউপিএ-১ সরকার, এনডিএ সরকার, ইউপিএ-২ এবং বর্তমান মোদী সরকার পর্যন্ত বহাল আছে। এর সঙ্গে আছে ক্রমাগত বেকারির হার বৃদ্ধি। ২০ থেকে ৩০ বৎসরের লোকের মধ্যে এখন বেকারির হার শতকরা ১৬ ভাগ। কর্মসংকোচনের ভয়াবহতা আরো বোঝা যায় যখন দেখি যে ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রায় ২ কোটি লোক কাজ হারিয়েছেন। ভারতের অর্থব্যবস্থা এখন গভীর মন্দায় আক্রান্ত। তার একটা বড়ো সাক্ষ্য হল যে সবরকমের মোটর বাহন— মোটরবাইক, মোটর গাড়ি, লরির বিক্রি গত ১৯ বছরের মধ্যে সব থেকে কম হয়েছে, বিস্কুট, মদের বিক্রি কমে গেছে। এই নিম্নগতি গত ১৯ মাস ধরে চলছে। টাটা মোটরস এবং মাহিন্দ্রা তাদের উৎপাদন ভীষণভাবে কমিয়েছে। তা ছাড়া ভারতবর্ষে এখনও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিরক্ষর এবং সবচেয়ে বেশি অপুষ্ট ও বুভুক্ষু লোক রয়েছে। ভারতবর্ষের বুভুক্ষার হার আফ্রিকার অতি দরিদ্র বহু দেশের চেয়ে বেশি।

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা বোঝার জন্য নীচের সারণি দ্রষ্টব্য (২০০৬-০৭)

	সকল ভারতীয়	দলিত	আদিবাসী
শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি সহস্রে)	৫৭.০	৬৬.৪	৬২.১
পাঁচ বছর বয়সের নীচের শিশুমৃত্যু হার (প্রতি সহস্রে)	৭৪.৩	৮৮.১	৯৫.৭
অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু (শতকরা)	৪২.৫	৪৭.৯	৫৪.৫
টিকাদান হয়নি এমন শিশু (শতকরা)	৫৬.৫	৬০.৩	৬৮.৭
রক্তাল্পতা আক্রান্ত নারী (শতকরা)	৫৫.৩	৫৮.৩	৬৮.৫
শিক্ষিত ধাত্রী বা ডাক্তারের হাতে শিশুজন্ম (শতকরা)	৫৪.৪	৫৯.৪	৭৪.৬

২০০৬-০৭ সালের পর এইসব ক্ষেত্রে খুব অল্পই রকমফের হয়েছে। ২০১৮ সালে বুভুক্ষার সূচকে ভারতবর্ষ ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০৩-তম স্থানে ছিল, সাহারা প্রান্তিক অনেক দেশের নীচে। ২০১৬ সালেও ভারতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ৩৪, কিউবা, কানাডা বা ফ্রান্সের শিশুমৃত্যুর হারের পাঁচ গুণ বা তারও বেশি। ধরেই নেওয়া যায় যে, দলিত বা আদিবাসীদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার এর চেয়েও বেশি হবে।

ভারতের লিঙ্গ অনুপাতের (পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা)

অবস্থাও খুব খারাপ। হাজার পুরুষের মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল চণ্ডীগড়ে ৮১৮, হরিয়ানায় ৮৭৯ এবং গুজরাটে ৯১৯; কেরালা এবং আর দুই একটি রাজ্য ছাড়া কোথাও নারী-পুরুষের সংখ্যায় সমতা হয়নি। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৫ সাল থেকে ভারতে ২৯৬, ৪৩৮ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন। এই সংখ্যা নীচের দিকে কারণ অনেক আত্মহত্যা রেকর্ড করা হয় না। সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা ঘটেছে মহারাষ্ট্রেই। ২০১৮ সালেই মহারাষ্ট্রে ৬০,০০০ চাষি আত্মহত্যা করেছেন— প্রতিদিন দশ জন করে। মহারাষ্ট্রের পরেই স্থান হচ্ছে ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং গুজরাটের। আত্মহত্যার প্রধান কারণ চাষির ঋণগ্রস্ত হওয়া— মহাজন, বীজ ও সার বিক্রেতা, মাইক্রো-ফিনান্স সংস্থা অথবা নতুন মহাজনি সংস্থা জি ই ক্যাপিটাল-এর কাছে। এর একটা প্রধান কারণ হল যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি চাষির কর্জ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। অজুহাত হল যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণ কমিয়ে আনতে হবে, যেখানে অনেক বড়ো বড়ো কোম্পানি ঋণ-খেলাপি করে পার পেয়ে যাচ্ছে।

দেশের এই দুরবস্থার কারণগুলো এখন খতিয়ে দেখা যাক। যদিও অনেকদিন থেকেই Intergrated Child Development Scheme (ICDS) আছে ছয় বছরের নীচের বাচ্চাদের এবং তাদের মায়েদের পুষ্টিসাধনের জন্যে, সেই প্রকল্প কোনোদিনই সমস্ত গ্রামে— বিশেষ করে পাহাড়ি অথবা জঙ্গলঘেরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছোয়নি। এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অনেক রাজ্যেই বহুদিন মাইনে পাননি। তার ফলে পিতৃতান্ত্রিক ভারতে শিশুবালিকারা যথেষ্ট পুষ্টির জোগান পায়নি এবং ছেলেদের তুলনায় বেশি হারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উঁচু জাতের বালিকারা দলিত এবং আদিবাসীদের তুলনায় আনুপাতিকভাবে বেশি মারা গিয়েছে। তা ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কন্যাভ্রূণ হত্যা (বিশেষ করে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, বিহারে) প্রচণ্ড হারে হয়ে চলেছে।

এবার দেখি ভারতবর্ষ তার জাতীয় আয়ের কত ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। ভারত শিক্ষা খাতে খরচ করে জাতীয় আয়ের শতকরা ৩.৮ ভাগ যেখানে সেই অনুপাত হল আফগানিস্তানে শতকরা ৩.৯, আলবেনিয়ায় শতকরা ৪.০, অস্ট্রেলিয়ায় শতকরা ৫.৩, অস্ট্রিয়ায় শতকরা ৫.৫, বুর্কিনা ফাসোতে শতকরা ৪.২, কিউবাতে শতকরা ১২.৮, ডেনমার্কে শতকরা ৭.৬ এবং ফ্রান্সে শতকরা ৫.৫। ভারতে শিক্ষা খাতে খরচের প্রধান অংশই আসে ব্যক্তির পকেট থেকে, আর সরকার জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ১.৩ ভাগ খরচ করে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল অবহেলিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এবং গরিব মানুষের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং তাঁদের শিক্ষায়তনের কাছে ঘেঁষা উত্তরোত্তর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

World Health Organization (WHO)-র পরিসংখ্যানের নিরিখে ২০১৬ সালে ভারত জাতীয় আয়ের শতকরা ৩.৬৬ ভাগ স্বাস্থ্য খাতে খরচ করেছিল, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার হার ছিল শতকরা ৫.২৭ ভাগ, রাশিয়ার হার ছিল শতকরা ৮.১১ ভাগ, আফগানিস্তানের ছিল শতকরা ১০.২০ ভাগ, আলবেনিয়ার শতকরা ৬.৭০ ভাগ, আর্জেন্টিনার শতকরা ৭.৫৫ ভাগ, অস্ট্রেলিয়ার শতকরা ৯.২৫ ভাগ, অস্ট্রিয়ার শতকরা ১০.৪৪ ভাগ, ব্রেজিলের শতকরা ১১.৭৭ ভাগ, বুর্কিনা ফাসোর শতকরা ৬.৭৫ ভাগ, চিলির ৮.৫৩ ভাগ, ডেনমার্কের ১০.৩৫ শতাংশ, ফ্রান্সের ১১.৫৪ শতাংশ এবং জার্মানির ১১.১৪ শতাংশ। ভারতবাসীর গড় আয়ু যে তার ফলে সমস্ত পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গড় আয়ুর চেয়ে কম হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বস্তুত ভারতবাসীর গড় আয়ু গড়পরতা বাংলাদেশির চেয়েও কম, যদিও বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অনেক গরিব দেশ।

এবার দেখা যাক পরিবেশ রক্ষায় ভারতের রেকর্ড কীরকম। ব্রিটিশ শাসনের আগে সারা ভারত বনে ঢাকা ছিল, একমাত্র রাজস্থানের এবং সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি ছাড়া। সেখানেও রাজারা এবং নবাবরা শিকারের জন্যে বন সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রিটিশরা বনসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করল এবং তার ফলে বহু অরণ্যবাসী তাঁদের বাসস্থান এবং জীবিকা হারালেন। এর ফলে বহু জমির উপরে বনের আচ্ছাদন না থাকায় জমির উর্বরতা কমে গেল, অনেক অঞ্চল উষর জমিতে আচ্ছন্ন হল এবং বহু নদী বালিতে ভরে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীন ভারতে এই অবস্থার খুব পরিবর্তন হল না। আদিবাসীদের স্বার্থে অরণ্য আইন প্রণীত হলেও কার্যত কাঠ-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এবং খনি মালিকদের স্বার্থে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হল এবং সেইসব অঞ্চলে মাওবাদীদের প্রভাব বেড়ে গেল।

অন্যদিকে ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ, যিনি বনমহোৎসব আরম্ভ করেছিলেন। এখানেই সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে গাছ বাঁচাবার জন্যে চিপকো আন্দোলন হয়েছিল, কেরালাতে শাস্ত্র পরিষদের নেতৃত্বে Silent Valley-র বৃক্ষ এবং বন্যপ্রাণী বাঁচাবার জন্যে আন্দোলন হয়েছিল। অন্যদিকে হিমালয়ের তীর্থস্থান দর্শনের জন্যে হিমালয়ের বুক ধরে গাড়ি পাশাপাশি যাওয়ার জন্যে পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছিল। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল শুধু হিমবাহের গলে যাওয়া নয়, ২০১০ সালে উত্তরাখণ্ডের আলমোড়া জেলায় বিশাল জমিস্খলন, যার

ফলে বহু মন্দির, বহু আশ্রম (যথা ভারত সেবাশ্রম সংঘের বাড়ি) ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এতে চৈতন্য যে হয়নি, তার প্রমাণ সমস্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য ২০১৮-১৯ সালে মাত্র ৮২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল।

আমার স্বপ্নের বাজেট শুরু হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, নারীদের জন্যে বরাদ্দ খরচ দ্বিগুণ করে। বিশেষ করে আদিবাসীদের এবং দলিতদের জন্যে ICDS, মেয়েদের জন্যে হোস্টেল, তাদের জন্যে আলাদা ছাত্রবৃত্তি দ্বিগুণ করা, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে নয়, সমস্ত অঙ্গরাষ্ট্রের বাজেটেও— বিশেষ করে অঙ্গরাজ্যগুলিরই সামাজিক ক্ষেত্র সংরক্ষণ করার প্রধান দায়িত্ব।

কেরালার মতো সমস্ত রাজ্যেই রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ করা সর্বজনের কাছে লভ্য ও সুগম করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগ করতে হবে, এতে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ ব্যয়িত হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও সরকারি ব্যয় জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগ করতে হবে, তার ফলে জাতীয় আয়ের সর্বমোট ৫ ভাগ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের এবং দলিতদের জন্য ব্যয় তিন গুণ করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যয় চার গুণ করতে হবে। কার্বন দূষণের পরিমাণ সারাক্ষণ মেপে যেতে হবে। এখন শক্তি উৎপাদনের জন্যে কয়লা এবং আকরিক তেল ব্যবহার হয়। তার জায়গায় নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহার করতে হবে। ভারতে সৌরশক্তির ব্যবহার খুব বেশি হতে হবে। এক বর্ষাকাল ছাড়া সমস্ত অঞ্চলেই প্রচুর সৌরশক্তি আছে। সৌরসেলের খরচও খুব কমে গিয়েছে। আরেক নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস হল সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার শক্তি। বনমহোৎসব আবার শুরু করতে হবে। সরকারের উচিত হবে প্রতি বৎসর ২০ কোটি চারা লাগানোর।

এইসব প্রকল্পের জন্যে টাকা থেকে আসবে? টমাস পিকেট্টি তাঁর Capital in the Twentieth Century বইতে সুপারিশ করেছেন যে, সর্বোচ্চ আয়ের ১০ শতাংশ লোকের উপর তাঁদের আয়ের ৮০ শতাংশ, কর ধার্য করতে হবে। আমি ততদূর যাচ্ছি না। ভারতে সকলের জন্যে প্রান্তিক করের হার ৩০ শতাংশ, তিনি মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানিই হোন, অথবা কলেজের অধ্যাপকই হোন। আমার সুপারিশ হবে যে ২০ লাখ পর্যন্ত লোকের ক্ষেত্রে করের হার হবে শতকরা ৩৫ এবং ৫০ লাখের উপর আয়ের লোকের উপর কর ধার্য হবে ৪৫ শতাংশ। এই ধরনের প্রান্তিক করের হার আছে ব্রিটেনে এবং জার্মানিতে। ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্সে প্রান্তিক করের হার শতকরা ৬০ থেকে ৭৫-এর মধ্যে।

আমি চাই বর্তমানে মিতাক্ষরা আইনে হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (Hindu Undivided Family) যে বিশেষ সুবিধে পায় তার অবসান। এই বিশেষ সুবিধার ফলে শুধু যে সরকারি কোষাগারের বিরাট ক্ষতি হয় তাই নয়, যারা দায়ভাগ আইনের আওতায় পড়ে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

আমি এদেশের কোম্পানিগুলির মধ্যে যারা ২৫০ কোটির বেশি আয় করে তাদের উপরে করের হার বর্তমানে ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ ধার্য করার সুপারিশ করব। আর বিদেশি কোম্পানিগুলির মধ্যে যারা ২৫০ টাকার বেশি আয় করে তাদের করের হার ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ শতাংশ করার সুপারিশ করব। এই কর বৃদ্ধিগুলির থেকে যে কর আদায় হবে তাতে উপরিলিখিত সরকারি ব্যয় দিব্যি চলে যাবে।

আমার সুপারিশগুলির ফল কী দাঁড়াবে? আগেই বলেছি যে ভারতে আর্থিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। সে জায়গায় সরকারি খাতে ব্যয়ের ফলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পে, নারীদের জন্য, দলিত ও আদিবাসীদের জন্য প্রকল্পে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। বনসৃজন প্রকল্পেও প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। তার ফলে শুধু শিশুমৃত্যুর হার, বালিকামৃত্যুর হার, কন্যাভ্রূণহত্যার হার কমবে না, শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি হবে। চাষিদের জন্যে বিশেষ প্রকল্পে এবং মাঝারি শিল্পে বিশেষ প্রকল্পের ফলেও প্রচুর নতুন কর্মসংস্থান হবে। সবমিলিয়ে জাতীয় চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে এবং বর্তমান মন্দার অবস্থা কাটিয়ে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

গান্ধী— রবীন্দ্রনাথ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

৫ মার্চ ১৯৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নরওয়ে থেকে একটা চিঠি পান। Friends of India in Norway নামে এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী রবীন্দ্রনাথকে জানান, তাঁরা শুনেছেন, ১৯৩৭-এর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য অন্যান্য নামের সঙ্গে এম কে গান্ধীর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। তাঁরা গান্ধীর জন্য জনমত তৈরি করছেন। ইয়োরোপের কয়েক জন নোবেলজয়ীকে তাঁরা অনুরোধ করেছেন গান্ধীকে সমর্থন করার জন্য। রবীন্দ্রনাথকেও তাঁরা অনুরোধ জানাচ্ছেন, তিনি যদি গান্ধীর অনুকূলে বার্তা পাঠান।

নোবেলের শান্তি পুরস্কার দেয় The Norwegian Nobel Committee. নিয়মকানুন একই, অন্যান্য পুরস্কারের (সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা অথবা চিকিৎসাশাস্ত্র) মতোই। কারা প্রস্তাব পাঠাতে পারেন, কবে পাঠাতে হবে, কবে সেই প্রস্তাবগুলো বিবেচিত হবে, সবই নির্দিষ্ট আছে। এবং পুরো কার্যক্রমই গোপন থাকবে, শুধু পুরস্কার বিজেতার নাম ঘোষিত হবে।

তবে, অন্যান্য পুরস্কারের মতো, দেখা যাচ্ছে শান্তি পুরস্কারের প্রস্তাবিত নামগুলো ফাঁস হয়ে গেছে, এবং বিভিন্ন প্রস্তাবিত নামের জন্য তদবির করা চলছে। ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৭ ছিল নাম প্রস্তাব করার শেষ দিন। ৫ মার্চ ১৯৩৭ ছিল নাম প্রস্তাব করার শেষ দিন। ৫ মার্চ ১৯৩৭-এর আগেই Friends of India in Norway গান্ধীর নাম জেনে গেছেন এবং তদবির করা শুরু করেছেন।

১৯৩৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন ৫৮ বছর বয়সি Carlos Saavedra Lamas নামে আর্জেন্টিনার এক ব্যক্তি। লিগ অফ নেশন্‌স্‌-এর প্রেসিডেন্ট। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, প্যারাগুয়ে আর বলিভিয়ার সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করার জন্য।

১৯৩৭ সালে পাবেন গ্রেট ব্রিটেনের ৭৩ বছর বয়সি লেখক Lord E A R S Cecil। ইনি International Peace Campaign-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি।

বোঝাই যাচ্ছে নরওয়ের ভারতের বন্ধুরা গান্ধীর জন্য তেমন জোরালো সমর্থন সংগ্রহ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন? না, তিনি জবাবই দেননি। তাঁর হয়ে তাঁর তৎকালীন সচিব অনিল কুমার চন্দ জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং ভারতে এম কে গান্ধীর কার্যকলাপ সি এফ অ্যান্ড্রুজ ভালো জানেন। ভারতের বন্ধুরা যেন অ্যান্ড্রুজকে লেখেন।

এই বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ভালোই জানতেন, তাঁর কাছে গান্ধীর bio-data চাওয়া হয়নি। সেটা নরওয়ের বন্ধুরা জানেন। তাঁরা চেয়েছিলেন গান্ধীর জন্য সমর্থন।

কার্যকারণ দেওয়া সমীচীন নয়। তবে, স্মরণ করা যেতে পারে, এই সময়টাতে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি কটু পত্রালাপ। পরিপ্রেক্ষিত এইরকম।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে চিঠিতে অনুরোধ করেন, গান্ধী যদি বিশ্বভারতীর Life Trustee হন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ খুশি হবেন। Life Trustee হওয়ার জন্য গান্ধীকে বিশেষ কিছু করতে হবে না, মধ্যে মধ্যে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া।

গান্ধী উত্তরে জানালেন, তিনি ট্রাস্টি হতে চান না। ২ মার্চ ১৯৩৭-এর এই চিঠিতে গান্ধী জানান, তিনি অনেক ট্রাস্টের দায়িত্ব নিয়ে ভালোমতোই জানেন, ট্রাস্টি হলেই আর্থিক দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে।

এটুকু পড়েই রবীন্দ্রনাথের ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু গান্ধী মড়ার উপর আরো ঘা মারার মতোই জানালেন, তিনি শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথ আসছেন আহমেদাবাদে, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে, বিশ্বভারতীর জন্য ভিক্ষা করতে। তিনি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, গুরুদেব যেন আর ভিক্ষায় না বের হন। তিনি তো দিল্লিতে কথা দিয়েছিলেন, তিনি আর ভিক্ষায় বের হবেন না।

দিল্লিতে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন, আর কেনই-বা বলেছিলেন? ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর এক বিরাট দল নিয়ে উত্তর ভারতের অনেকগুলো শহরে নৃত্যনাট্য

পরিবেশন করে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন। দিল্লিতে পৌঁছোলে গান্ধী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বয়সে, এই অশক্ত শরীর নিয়ে, কেন এত পরিশ্রম করছেন। কত টাকা তাঁর দরকার। গুরুদেব জানালেন, ষাট হাজার টাকা। বিশ্বভারতীর ধার হয়ে গেছে, ওই অর্থ সংগ্রহের নিতান্ত প্রয়োজন।

বিশ্বভারতীর ধার? কার কাছে? বিশ্বভারতীরই কাছে। এটা কোনো হেঁয়ালি নয়। বিশ্বভারতীর অনেক শুভার্থী অর্থদান করতেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে। যেমন টাটারা দিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে এক অতিথিশালা নির্মাণের জন্য, যার ফলে রতনকুঠির নির্মাণ। যাঁরা এই দান সংগ্রহ করতেন, তাঁরা কেউ কেউ দাতাদের কাছে নালিশ জানাতেন, প্রদত্ত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে না। এইসব ফান্ডের নাম ছিল ear-marked fund. ১৯৩৬ সালে ভিন্ন ভিন্ন ফান্ডের টাকা অন্য কোনো কাজে ব্যয় হয়ে গেছে। Ear-marked fund নিয়ে রথীন্দ্রনাথ কয়েকটি ভবন তৈরিতে খরচ করে ফেলেছেন। এতে বিশ্বভারতীর দুর্নাম হচ্ছে। তাই প্রয়োজন ষাট হাজার টাকা।

রবীন্দ্রনাথকে গান্ধী আশ্বস্ত করলেন, তাঁর আর অন্য কোনো শহরে নাচ-গান করার দরকার নেই। ওই টাকা তিনিই সংগ্রহ করে দেবেন। কয়েক দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে একটা ষাট হাজার টাকার চেক এল। চেকের সঙ্গে একটি চিঠি। Your Humble Country Men নামে কেউ। তাঁরা বিশ্বভারতীর নাম শুনেছেন। বিশ্বভারতীর কার্যক্রম তাঁরা বিশেষ জানেন না। কিন্তু তাঁরা এটা জানেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের কবি নন, বিশ্বমানবতার কবি। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করছেন, এতে তাঁদের লজ্জার সীমা নেই। বিশ্বভারতীর যে দেনা হয়েছে সেই দেনা মেটাবার জন্য ওঁরা এই টাকা পাঠালেন। তাঁদের প্রার্থনা সুস্থ দেহে তাঁর সাধনা অব্যাহত থাকুক।

Your Humble Country Men নামে ব্যাঙ্কের কোনো account থাকতে পারে না। স্বাক্ষর কার ছিল, এখন আর জানার উপায় নেই। হয়তো ঘনশ্যামদাস বিড়লার। ওঁর নামেই ওই ষাট হাজার টাকার দান, এই ধারণা প্রচলিত।

গান্ধী যখন তাঁর চিঠিতে আক্ষেপ জানালেন, তিনি শুনছেন, কবি আবার ভিক্ষায় বের হবেন, যদিও তিনি কথা দিয়েছিলেন, আর তিনি ভিক্ষায় বের হবেন না, রবীন্দ্রনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে গান্ধীকে চিঠি দিলেন। ভিক্ষা কথাটা তাঁর আপত্তিকর মনে হয়েছিল। কোনো ব্যক্তি যদি দান করেন, তাঁর দান তিনি নিয়েছেন, নেবেনও, কিন্তু যাঁরা দান করার সময় বলেন, তাঁরা বিশ্বভারতীর নামই শুধু শুনেছেন, বিশ্বভারতী সম্পর্কে আর কিছু জানেন না, তাঁদের দান গ্রহণে গ্লানি হওয়ারই কথা। তাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন পরিবেশন করে অর্থোপার্জনকে তিনি ভিক্ষা নিচ্ছেন, এমন কথা বলে থাকলেও সেটা নিতান্ত আলঙ্কারিক কথা। গান্ধীর 'ভিক্ষা' শব্দটা মনে করিয়ে দেওয়ায় তিনি জানালেন, আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি গান্ধীকে ট্রাস্ট্রি হতে বলেননি। আর ভিক্ষাবৃত্তিতে তাঁর কোনো লজ্জা নেই, কেননা ভিক্ষার পরিবর্তে তিনি দেশকে তাঁর শিল্পসৃষ্টি উৎসর্গ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত গান্ধী ২ মার্চ ১৯৩৭ লিখলেন, 'ভিক্ষা' কথাটায় কবি এত রেগে যাবেন, গান্ধী কল্পনাই করেননি। 'ভিক্ষা' শব্দটা নিয়ে কবি তো নিজেই মশকরা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দেননি।

গান্ধী শান্তির নোবেল পুরস্কার পাননি। কিন্তু কেন পাননি? কিছুটা আন্দাজ করা যায়, রবীন্দ্রবীক্ষায় (সংকলন ৪৫, ৭ পৌষ ১৪১৩) প্রকাশিত নরওয়ে থেকে লেখা চিঠিগুলো থেকে। তার আগে দেখা যাক ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত কারা পেলেন।

১৯৩৮-এ শান্তি পুরস্কার পায় জেনিভার উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনে কর্মরত একটি সংস্থা। নোবেল শান্তি পুরস্কার ব্যক্তিকে যেমন দেওয়া হত, সংস্থাকেও তেমন দেওয়া হত। ১৯২১ সাল থেকে এই সংস্থায় উদ্‌বাস্তুদের জন্য কাজ করে এসেছে। নাম Nausen International Office for Refugees.

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত কোনো শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

১৯৪৪-এর জন্য শান্তি পুরস্কার দেওয়া হল, ১৯৪৫ সালে, ১৮৬৩ থেকে কাজ করে আসা জেনিভার রেড ক্রশকে।

১৯৪৫-এ ৭৪ বছর বয়সি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের, Cordell Hull-কে ইনি রাষ্ট্রসংঘ গঠনে অন্যতম প্রধান কর্মী, একসময় আমেরিকার Secretary of State ছিলেন।

১৯৪৬-এ পুরস্কারটি দুজনকে ভাগ করে দেওয়া হয়। দুজনেই আমেরিকান। ৭৯ বয়সি, ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক, Greene Emily Balch, যিনি Women's International League for Peace and Freedom-এর সভানেত্রী ছিলেন। আর একজন ৮১ বছরের Raleigh John Mott. ইনি তখন World Alliance of Young Men's Christian Association-এর সভাপতি।

১৯৪৭-এ পুরস্কার আবার ভাগ করে দেওয়া হল দুই সংস্থাকে। লন্ডনের কোয়েকারদের (The Friends Service Council, যে সংস্থাটি ১৬৪৭ সাল থেকে কাজ করে আসছে)। আর একটি ওয়াশিংটনের কোয়েকাররা (The American Friends Service Committee, যারা ১৬৭২ থেকে কাজ করে চলেছিল)।

১৯৪৮-এ কাউকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

নরওয়ে থেকে Friends of India in Norway-র পক্ষ

ছবি : রবীন মণ্ডল

থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে ৫ মার্চ ১৯৩৭ যে চিঠি এসেছিল, সেই চিঠির লেখিকা Mrs Brokken Lasson জানিয়েছিলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান নোবেল শান্তি পুরস্কার গান্ধী যাতে পান, তার জন্য বিশিষ্ট লোকদের কাছে আবেদন করছেন যেন তাঁরা গান্ধীর সমর্থনে নোবেল কমিটিতে চিঠি লেখেন। তিনি জানেন, নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর বন্ধু। বিশ্বের শান্তি কামনায়, ভারতে আর দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ সমাধানকল্পে গান্ধীর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথ কিছু লেখেন, তাহলে তাঁরা বাধিত হবেন। ইয়োরোপের নানা নোবেলজয়ীদের কাছেও তাঁরা আবেদন পাঠাচ্ছেন। যদি রবীন্দ্রনাথ সময় পান আর এই আবেদনে সাড়া দেন, তাহলে তিনি একটি ঠিকানা দিচ্ছেন, সেই ঠিকানায় যেন তাঁর লেখাটা পাঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অনিলকুমার চন্দ ৩০ মার্চ ১৯৩৭ Mrs Lasson-কে চিঠি দেন। জানান, রবীন্দ্রনাথের মতে গান্ধীর চাইতে নোবেলের শান্তি পুরস্কারের যোগ্যতর প্রার্থী আর কেউ নেই। তবে ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর কার্যক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সি এফ অ্যান্ড্রুজ সেই বিবরণ লিখতে পারেন। অ্যান্ড্রুজ এখন কেমব্রিজে পেমব্রোক কলেজে আছেন। ওঁকে যদি অনুরোধ করা হয় তবে তিনি সোৎসাহে সাহায্য করবেন।

এই চিঠির উত্তরে নরওয়ের Friends of India-র অস্থায়ী সভাপতি V Sopp Callyomousen ৩ মে, ১৯৩৭ অনিল চন্দকে যে চিঠি লেখেন, সেটা যথেষ্ট ভদ্র হলেও তাঁর বিরক্তি এবং হতাশা চাপা থাকেনি। তাঁর দীর্ঘ চিঠির মূল বক্তব্য এই।

ভারতে আর দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধীর সংগ্রামের সঙ্গে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। দুই খণ্ডে The Story of My Experiments with Truth তাঁরা কয়েক বছর ধরে পড়ে আসছেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকজন সদস্য ভারতে গিয়ে দেখে এসেছেন ভারতের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো। জাতপাতের সমস্যা নিয়ে গান্ধী যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে তাঁরা ওঁকে a true incarnation of the peace-ideal of the entire world গণ্য করেন। সেই ইতিবৃত্ত জানার জন্য তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেননি। তাঁদের প্রয়োজন গান্ধীর সপক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন। বিশেষ করে যখন বিদেশি স্বার্থে গান্ধীর বিরুদ্ধে খবরের কাগজে প্রচার চলছে (press propaganda of foreign vested and adverse interests)। যাই হোক, আশা করি, অ্যান্ড্রুজ কিছু বিশিষ্ট ব্রিটেনবাসীর কাছ থেকে গান্ধীর পক্ষে সমর্থন আদায় করতে পারবেন।

গান্ধীবিরোধী অপপ্রচার কী ছিল, সেটা ১৯৩৬-১৯৩৭ সালের ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো দেখলে বোঝা যাবে। গান্ধীস্মরণে যে বিশাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তাতে সেই ক্লিপিংগুলো থাকার কথা।

গান্ধী বিশ্বভারতীর ট্রাস্টি হতে চাননি, এতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবে তাঁর অভিমান স্থায়ী হয়নি। ১৯৪০ সালে সস্ত্রীক গান্ধী শান্তিনিকেতনে এলে, আবার তিনি অনুরোধ জানাবেন, গান্ধী যেন রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করেন।

বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ ও উন্নয়নশীল বিশ্ব: কিছু ভাবনা

আজিজুর রহমান খান

আমরা কিঞ্চিদধিক বিগত তিন দশক কালকে বিশ্বায়নের যুগ বলে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত হয়েছি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য এবং পুঁজি সঞ্চরণ বিস্তারলাভ করেছে যদিও শ্রমিকদের, বিশেষত অদক্ষ শ্রমিকদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে সঞ্চরণশীলতা বাড়ানোর চেষ্টা হয়নি। শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজির সঞ্চরণশীলতার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান হারে প্রসারিত হচ্ছিল। উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোর উদ্যোগে এই প্রবণতা গত শতাব্দীর আটের দশকে বিস্তারলাভ করতে শুরু করে।

গোড়া থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পুঁজিপতি শ্রেণি ছিল বিশ্বায়নের উৎসাহী সমর্থক। শ্রমিক সংগঠনগুলো মোটামুটিভাবে নিরুৎসাহী অথবা বিশ্বায়নবিরোধী ছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিপতিদের অধিকাংশ এই প্রবণতার সমর্থক ছিল না। তারা যতটুকু শিল্পোন্নয়নে সক্ষম হয়েছিল তার পেছনে ছিল রাষ্ট্রোদ্যোগে আমদানি প্রতিস্থাপক সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার অবসান বিশ্বায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য, অতএব তাদের বাধার কারণ বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে উন্নয়নশীল বিশ্বের বামপন্থী শক্তিগুলো প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিশ্বায়নবিমুখ ছিল। তারা একে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন বলে গণ্য করেছে।

অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে ডেভিড রিকার্ডোর 'আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব' দু-শো বছর আগে প্রমাণ করেছে যে সংরক্ষণ বর্জন করে অবাধ বাণিজ্যে লিপ্ত হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক কল্যাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তত্ত্ব নয়; মূলত জাতীয় কল্যাণ বিষয়ক তত্ত্ব: একটি দেশ এই নীতি গ্রহণ করে নিজস্ব জাতীয় উৎপাদন বা কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে, অন্য দেশগুলো যাই করুক না কেন। কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করলেও অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকরা রিকার্ডোর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যাপক মতৈক্য প্রকাশ করেছে। রিকার্ডোর তত্ত্বে অবশ্য দেশের অভ্যন্তরে কোন শ্রেণির কল্যাণ বাড়বে বা কমবে সে সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য নেই।

বিভিন্ন শ্রেণির কল্যাণ অবাধ বাণিজ্য দ্বারা কেমন করে প্রভাবিত হয় সে সম্বন্ধে নব্যধ্রুপদি অর্থনীতিশাস্ত্রের কিছু তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত আছে। এই সিদ্ধান্তের মূলকথা এই যে, যে দেশটি সংরক্ষণ ত্যাগ করে অবাধ বাণিজ্য অবলম্বন করবে সে দেশে উৎপাদনের যে উপাদানের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে প্রচুর তার আয় বাড়বে এবং তুলনামূলকভাবে বিরল উপাদানের আয় কমে যাবে। এই তত্ত্বানুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের আয় কমে যাবার এবং পুঁজিপতিদের আয় বৃদ্ধি পাবার কথা, কারণ এই দেশগুলি তুলনামূলকভাবে শ্রমবিরল এবং পুঁজিপ্রতুল। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমের প্রাচুর্য এবং পুঁজির অপ্রতুলতা। অতএব এই দেশগুলি অবাধ বাণিজ্য অবলম্বন করলে অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হবে এবং পুঁজিপতিরা সংরক্ষিত অভ্যন্তরীণ বাজারে যে বিপুল মুনাফা অর্জন করত তা হ্রাস পাবে। নব্যধ্রুপদি বাণিজ্যতত্ত্ব অবশ্য নানা বাস্তব ও অবাস্তব পূর্বানুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বহুক্ষেত্রে পূর্বানুমানগুলো সত্যি হয় না।

বিশ্বায়নের কালে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যথার্থই স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের আয় কমেছে বা তুলনামূলকভাবে স্বল্পহারে বেড়েছে। ইউরোপ ও অন্যত্র কিছু দেশে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রমিকদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে এবং অনেকাংশে তা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের বৃহত্তম ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এমন একটা সময়ে যখন উচ্চবিত্তদের আয় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য বিশ্বায়ন ছাড়াও অন্যান্য কারণ এই প্রবণতার পশ্চাতে ছিল, যেমন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং আয়বণ্টন সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি। কিন্তু স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের অসন্তোষকে আশ্রয় করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্ণবাদী নির্বাচনী প্রচারনার ফলে শুধু আমেরিকার নয়, বিশ্বের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচণ্ড আলোড়নে আক্রান্ত হয়েছে। শিল্পোন্নত বিশ্বে বিশ্বায়নের প্রতি আনুগত্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে শিল্পোন্নত দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি— যারা বিশ্বায়নের ফলে নিজস্ব উৎপাদনের বৃহদংশ তৃতীয় বিশ্বের স্বল্প-মজুরির দেশে স্থানান্তরিত করেছে— তারা বিশ্বায়ন বিরোধিতাকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য পশ্চাদপসরণ পরিহারযোগ্য মনে হয় না।

উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব এবং ফলশ্রুতি বিবেচনার আগে বিশ্বায়নের বিভিন্ন উপাদানগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমার বিচারে এই দেশগুলির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের ওপর বাধানিষেধ অপসারণ, এককথায় 'অবাধ' বাণিজ্য, যদিও এই অবাধ বাণিজ্যের নীতিমালা কার্যত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অসহায় করে ফেলার কারণ নেই। পুরোনো আমদানি-প্রতিস্থাপক সংরক্ষণ নীতির গুরুত্বপূর্ণ কুফলগুলো প্রণিধানযোগ্য: এই ব্যবস্থায় আমদানি-প্রতিস্থাপক উৎপাদনের মুনাফা রপ্তানিবর্ধক উৎপাদনের মুনাফার চেয়ে অনেক বেশি; ফলে অধিকাংশ বিনিয়োগ হয়ে থাকে সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য যার চাহিদা উৎপাদন-নৈপুণ্য অর্জনের জন্য প্রায়শ অপ্রতুল। রপ্তানিবর্ধক নীতির ফলে দেশের এবং বিদেশের সমগ্র চাহিদার লক্ষ্যে উৎপাদন হয়ে থাকে বলে উৎপাদন নৈপুণ্যের সুযোগ অনেক বেশি। বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতা নৈপুণ্য অর্জনের অনুকূল। এই ব্যবস্থায় সংরক্ষিত উৎপাদনে পুঁজিপতিদের মুনাফা অত্যধিক এবং আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পগুলো প্রায়শই শ্রমনিবিড় না হওয়ায় কর্মসংস্থানের প্রসার হয় শ্লথগতিতে: ফলে আয়বণ্টনবৈষম্য হয় অত্যধিক। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমদানি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি অনিবার্য অঙ্গ ছিল আমদানির ওপর পরিমান-নির্ধারক সীমা (কোটা) যার ফলে খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে উৎপাদনের অকার্যকারিতা ছিল ব্যাপক। ব্যবস্থাটির সপক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন প্রবল: পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থক শক্তিগুলো সর্বদা যুক্তি দিয়ে থাকে যে সংরক্ষণ হ্রাস হলে দেশের শিল্প ধ্বংস হবে এবং দেশের অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হবে।

কিন্তু আমদানি-প্রতিস্থাপক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবসানের অর্থ সংরক্ষিত শিল্পসমূহের কৃত্রিম সুবিধার অবসান এবং তাদের মুনাফার হার এবং রপ্তানিবর্ধক উৎপাদনের মুনাফার হারের সমীকরণ। এর ফলে উৎপাদন বহির্মুখী হয়, উৎপাদনের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ে, উৎপাদনের শ্রমনিবিড়তা বৃদ্ধি পায়, এককথায় উৎপাদননৈপুণ্য এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। আমদানি-প্রতিস্থাপক ব্যবস্থার অবসানের অর্থ শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্রীয় উদ্দীপনামূলক সহায়তার অবসান নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে— জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানে— রপ্তানিবর্ধক শিল্পের জন্য উদ্দীপনামূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা সর্বজন বিদিত। যানবাহন, জ্বালানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এই উদ্দীপনা ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান। তাছাড়া স্বল্প সুদে ঋণ, আইন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা উদ্দীপনা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ।

অবশ্য বিশ্বায়ন অর্থনীতি ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর অন্য একটি প্রধান উপাদান পুঁজির অবাধ সঞ্চরণ। পুঁজি সঞ্চরণের দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া: প্রত্যক্ষ উৎপাদনে লগ্নি এবং শেয়ার বাজার প্রমুখ ক্ষেত্রে আর্থিক লগ্নি। আমার মতে উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে অবাধ পুঁজি সঞ্চরণে যোগ দেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বোকামি। আর্থিক লগ্নির ক্ষেত্রে এই সতর্কতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমি যতদূর জানি বিশ্বায়নের শীর্ষ পর্যায়েও উন্নয়নশীল দেশগুলি অবাধ আর্থিক পুঁজি সঞ্চরণে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল না, ভবিষ্যতেও হওয়া উচিত হবে না। কপিরাইট, পেটেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শিল্পোন্নত দেশগুলির আইনকানুন থেকে তাদের কিছু বিশেষ ছাড় ছিল।

প্রত্যক্ষ উৎপাদন লগ্নির বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখা প্রয়োজন। যদিও প্রত্যক্ষ লগ্নি লগ্নিকারী দেশের পুঁজিপতিদের মুনাফাবৃত্তি দিয়ে চালিত, তথাপি গ্রহীতা দেশগুলি এর থেকে কিছু কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। এই দেশগুলি পুঁজির স্বল্পতা এবং শ্রমের প্রাচুর্যে আক্রান্ত। বৈদেশিক লগ্নি এই দুই ক্ষেত্রেই সহায়ক। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক লগ্নির প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা যা উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য সুবিধাজনক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে চিন গত তিন দশকে সর্বাধিক বৈদেশিক লগ্নি গ্রহণ করেছে, কিন্তু এইসময়ে বহির্বিশ্ব চিনের কাছে বিপুল পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার চিনের কাছে ঋণভারে জর্জরিত। এর অর্থ এই যে চিন বৈদেশিক লগ্নি গ্রহণ করেছে পুঁজির স্বল্পতা লাঘবের জন্য নয়, প্রধানত প্রযুক্তি আমদানির জন্য। উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বিশ্বায়নের যুগে করণীয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে বাণিজ্যনীতির সংস্কার, অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট নীতি অবলম্বন করে উন্মুক্ত বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা; প্রত্যক্ষ বৈদেশিক লগ্নি বিবেচনা সহকারে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকূল সেসমস্ত ক্ষেত্রে, আহ্বান করা এবং আর্থিক পুঁজি নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংরক্ষণ। খুব অল্প সংখ্যক দেশ এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। সফল দেশগুলির মধ্যে চিন এবং ভিয়েতনাম অগ্রগণ্য। তারা বাণিজ্য প্রণোদনা ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা

রপ্তানিবর্ধক উৎপাদনের মুনাফার হার আমদানি-প্রতিস্থাপক উৎপাদনের মুনাফার হারের সমান বা অধিক স্তরে উন্নীত করেছে, অবকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত বিনিয়োগ করেছে এবং বিশেষভাবে চিন, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক লগ্নিকে প্রযুক্তি সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করেছে। অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশ উন্মুক্ত বাজারের সুবিধা গ্রহণ করে রপ্তানি বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু বাণিজ্যনীতির অপূর্ণ সংশোধন, অবকাঠামোগত বাধা ইত্যাদি কারণে উন্মুক্ত বাজারের যথাযোগ্য সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে শ্রমজীবীদের দ্রুত আয় বৃদ্ধি এবং আয়বণ্টনের সমতা সংক্রান্ত নব্যধ্রুপদিতত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী কোনো ক্ষেত্রেই সত্য প্রমাণিত হয়নি। বৈষম্য সর্বত্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিছুকাল আগে 'আমাদের কালে বৈষম্য' নামের প্রবন্ধে আমি বিষয়টি নিয়ে এই সাময়িকীতে আলোচনা করেছি। এই স্বজ্ঞাবিরোধী ফলশ্রুতির কারণ: রপ্তানিবর্ধক বাণিজ্যনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর অভাব বা অপূর্ণতা নব্যধ্রূপদি তত্ত্বের পূর্বানুমানের সঙ্গে বাস্তবের অসঙ্গতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির আয় বণ্টননীতি। বিষয়টির পুনরাবৃত্তি না করে কয়েকটি বিকাশমান সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

বিশ্বায়নের কালে উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলেও তাদের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল শিল্পোন্নত দেশের বাজার। ভবিষ্যতে এই বাজারের প্রসার সংকুচিত হবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। প্রথমত শিল্পোন্নত দেশগুলির বিশ্বায়নমুখী নীতি ইতিমধ্যেই সংকুচিত হতে শুরু হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'আমেরিকা প্রথম' নীতি এবং বাণিজ্যশুল্ককে সর্বত্র হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও দক্ষিণপন্থী লোকবাদের আক্রমণের মুখে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বহির্মুখীন উন্মুক্ততার নীতি ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে স্তিমিত হবে। কিন্তু তারও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শিল্পোন্নত বিশ্বের প্রবৃদ্ধির হারের অবশ্যম্ভাবী নিম্নগামিতা। ট্রাম্প শাসনের বাণিজ্য অরাজকতা বা চক্রাবর্ত সংকট এর মূল কারণ নয় যদিও এসব কারণে নিকটবর্তী বা অনতিদূরবর্তী প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। শিল্পোন্নত বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বহুকাল যাবৎ হ্রাস পেতে পেতে শূন্য বা তার নীচে নেমে গেছে প্রায় সর্বত্র। সেইসঙ্গে বয়োবিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে শ্রমযোগ্য জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা এখনও স্বল্পহারে বাড়তে থাকলেও নানা সামাজিক সমস্যার ফলে শ্রমজীবী ও শ্রমযোগ্য মানুষের অনুপাত নিম্নগামী। দীর্ঘকালীন প্রবৃদ্ধির নির্ধারকদের মধ্যে শ্রমজীবীদের সংখ্যা অন্যতম। তা ছাড়া এই পরিবর্তনের ফলে এই দেশগুলিতে মাথাপিছু প্রতি শ্রমিক ক্রমবর্ধমান সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত মানুষের জীবিকার জন্য দায়ী হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সমস্ত কারণে শিল্পোন্নত বিশ্বের দীর্ঘকালীন প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। সম্ভবত সবাই অবগত নন যে সম্প্রতি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চিন— যে দেশ গত কয়েক দশক যাবৎ প্রতি বছর বিশ্বের অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির বৃহত্তম একক অংশের অবদান রেখেছে— এই দলে যোগ দিয়েছে। গত কয়েক বছর যাবৎ চিনের শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে এবং এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আগামী কয়েক বছরে চিনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪ ভাগে নেমে যাওয়া সম্ভব।

উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজ নিজ প্রবৃদ্ধির জন্য বহির্বাজারের চাহিদার অংশকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম না হলেও এই চাহিদার হ্রাসকে সীমিত করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হতে পারে। বিগত দুই দশকে এই বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে থাকলেও মানতেই হবে এই দেশগুলির দৃষ্টি সর্বদা ধনী দেশগুলোর বাজারের ওপর নিবদ্ধ ছিল। এই প্রবণতার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

যদি আমাদের নিজস্ব বিশ্ব, দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকাই তবে এই বিষয়ে আশাবাদী হওয়া দুষ্কর। এখানকার যে তিনটি প্রধান দেশ পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশের অধিক মানুষের বাসভূমি তাদের পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যে অনীহা প্রবাদতুল্য। এর অবসান কল্পনা করা কঠিন। সাধারণত মনে করা হয় যে এর কারণ দেশগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সমস্যা যা নাকি সমাধানযোগ্য নয়। এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও সমস্যা থেকে যায়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বড়ো রকমের প্রকাশ্য সমস্যা নেই যদিও-বা নানাবিধ প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা থেকে থাকে। কিন্তু দু-দেশের অর্থনৈতিক বিনিময় সম্ভাবনার তুলনায় অত্যন্ত সীমিত।

ভবিষ্যতে বিশ্বায়নের সহজ সুবিধাগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তুলনামূলকভাবে দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা। আমার স্বদেশ বাংলাদেশের উদাহরণ এ বিষয়ে শিক্ষণীয়। বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তথাকথিত বিপুল সাফল্য মোটামুটিভাবে দুটি উপাদান দ্বারা চিহ্নিত: তৈরি বস্ত্র রপ্তানি এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ। একাধিক সমীক্ষার সিদ্ধান্ত এই যে বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতি এখনও বিপুলভাবে অন্তর্মুখিন: আমদানি-প্রতিস্থাপক উৎপাদনের মুনাফা রপ্তানিবর্ধক উৎপাদনের মুনাফার চেয়ে অনেক বেশি। কেবল তৈরি কাপড়ের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা এবং অনুদান দ্বারা এর রপ্তানিকে লাভজনক করা হয়েছে। বাণিজ্য প্রণোদনা ব্যাপকভাবে রপ্তানিবর্ধক হলে এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত বিনিয়োগ হলে আরো অনেক ধরনের

রপ্তানিবৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, গোড়াতে শুল্কহারসমূহের সরলীকরণ ও লঘুকরণ দিয়ে যে বাণিজ্যনীতি সংস্কার শুরু হয়েছিল অচিরেই দেশীয় শিল্পপতিদের অবিরত প্রতিরক্ষার দাবির চাপে তা পালটানো হয়। ফলত তৈরি কাপড় থেকে রপ্তানি আয় সমগ্র রপ্তানি আয়ের আশি শতাংশের অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যা বহির্মুখীন উন্নয়ন নীতির ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। বস্ত্র রপ্তানির বাজার মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলি। এদের বাজার ভবিষ্যতে খুব বেশি হলে শ্লথগতিতে প্রসারিত হবে এমনকী সংকুচিত হওয়াও সম্ভব কেননা বস্ত্রপরিধানকারীদের সংখ্যা নিম্নগামী। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট বৈদেশিক বাজারে অনুপ্রবেশের পদ্ধতিকে শিথিল করা নয়, দৃঢ় করা প্রয়োজন, উৎপাদন ও বাণিজ্যনীতিকে ব্যাপকভাবে বহির্মুখীন করা প্রয়োজন। এর প্রধান সুফল অবশ্যই অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি, একে অন্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করে।

তবুও বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিবর্তনের আলোকে সম্ভবত বলা যায় যে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর অংশের চাহিদা অভ্যন্তরীণ বাজারে সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিগত দশকগুলির বণ্টনবৈষম্য প্রধান বাধা। বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদন ও বণ্টননীতির সর্বাত্মক পরিবর্তনের ফলেই তা সম্ভব।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের সাফল্যের দ্বিতীয় মূল উপাদান— বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ— সর্বোচ্চ পর্যায়ে জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশে পৌঁছেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এই উপাদানটি প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলির সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন-নিরুৎসাহিতার একটি প্রধান অঙ্গ অভিবাসন বিরোধিতা। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষেত্রে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থের বৃহদংশ আসে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল উৎপাদনকারী দেশ ও মালয়েশিয়া থেকে। ভবিষ্যতে এই দেশগুলির ওপর এ বিষয়ে নির্ভরতাও নিতান্ত অনিশ্চিত। কিছু নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মতে জীবাশ্ম জ্বালানির জন্য বিশ্ব চাহিদার চূড়ান্ত শীর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে; এখন ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্তির পালা। পরিবেশ দূষণ ভাবনা এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানির উৎপাদন ব্যয়হ্রাস এর প্রধান কারণ।

বর্তমান বিশ্বের উন্মত্ত অযৌক্তিকতার একটি মর্মান্তিক অভিব্যক্তি এই যে শিল্পোন্নত বিশ্ব শ্রমশক্তির অভাবে ক্রমক্ষীয়মান প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বের শ্রমিকদের অভিবাসনকে প্রতিহত করার জন্য প্রাচীর নির্মাণে রত। শিল্পোন্নত বিশ্বে শ্রমশক্তির 'স্বল্পতা'-র সমাধান হিসাবে কৃত্রিম-বুদ্ধিভিত্তিক কৃত্রিম মানুষ (রোবট) ব্যবহার ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার যথার্থ শ্রমস্বল্পতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং সম্ভাব্য শ্রমস্বপ্নতার ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। দেড়-শো বছর আগে কার্ল মার্কস কৃত্রিম উদ্‌বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি করে শ্রমিকদের দর কষাকষির শক্তিহ্রাস করার পুঁজিবাদী প্রবণতার কথা বলেছিলেন।

সমতাবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কৃত্রিম যান্ত্রিক শ্রমিকের ব্যবহার মানবসমাজের জন্য শুভ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হত। শ্রমজীবী মানুষ অক্ষুণ্ণ আয় ও ক্রমবর্ধমান অবকাশ উপভোগ করতে পারত। কিন্তু বিপুল বৈষম্যাক্রান্ত পুঁজিবাদে এই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বৈষম্যকে আরো তীব্র করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়নপ্রার্থী এ্যান্ড্রু ইয়াং সম্প্রতি এই সমস্যার সমাধান হিসাবে প্রস্তাব করেছেন যে প্রতিটি মার্কিন দেশবাসীকে প্রতি মাসে এক হাজার ডলার রাষ্ট্রীয় অনুদান দেওয়া হোক। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'মুক্তি লভ্যাংশ' (Freedom Dividend)। এই অনুদানের সমগ্র পরিমাণ হবে মার্কিন জাতীয় আয়ের এক পঞ্চমাংশ; জাতীয় আয় থেকে বিনিয়োগ ও অন্যান্য কিছু উপাদান বাদ দিলে সমগ্র মার্কিন ব্যক্তিগত আয়— personal income-এর তিরিশ শতাংশ। এ্যান্ড্রু ইয়াং দাবি করছেন যে বড়ো শিল্পগোষ্ঠীগুলোকে যে কর-রেহাই দেওয়া হয় তা প্রত্যাহার করে এই মুক্তি লভ্যাংশের ব্যয়ভার বহন করা যেতে পারে। এটি একটি অবাস্তব আশাবাদ হলেও সমতাবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে এই ধরনের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়।

আইজাজ আহমদ-এর সঙ্গে দূরত্ব

দেবেশ রায়

'ফ্রন্টলাইন' পাক্ষিকপত্রের ২ আগস্ট-এর সংখ্যাটি বেরিয়ে গেছে প্রায় জুলাই-এর তৃতীয় সপ্তাহের শেষেই। তার প্রধান কাহিনি বিজেপি-র নতুন সরকার। কিন্তু মলাটে ছবি মার্ক্সবাদী দার্শনিক আইজাজ আহমদ-এর তাঁর সঙ্গে এক দীর্ঘ কথোপকথনের শিরোনাম, 'ভিতর থেকে রাষ্ট্রদখল'। যাকে এখন সাময়িক পত্রের কভার স্টোরি বলা হয় সেটি বিজেপি-র নতুনভাবে সরকার গঠন। আর, তারই শিরোনাম যেন আইজাজ-এর কথালাপের মন্তব্য।

আইজাজ আহমেদ এক সময় দিল্লিতে ছিলেন ও মার্ক্সবাদী হিসেবে সম্মানিত ও স্বীকৃত ছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল সাহিত্য অকাদেমির একটা ছোট সেমিনারে। তাঁর আগে তাঁর দু-তিনটি বই আমাকে চমৎকৃত করেছিল। সেই ছোট সেমিনারে বক্তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় নি বোধহয় এটা ধরে নিয়ে যে আলোচকরা পরস্পরকে চেনেন। একটা কথা নিয়ে বাধ্য হয়েই আইজাজকে বোঝাতে আমাকে বলতে হয়— 'মাই ফ্রেন্ড অন দি এক্সট্রিম লেফট'। আর সভামুখ্য অনন্তমূর্তি প্রায় বিস্মিত হয়ে বলেন, 'হাউ ইজ দ্যাট? আইজাজ অ্যান্ড দেবেশ ডুনট নো ইচ আদার। বাট বোথ অব দেম আর এক্সট্রিম লেফট।' অনন্তমূর্তি খুব স্মার্ট ছিলেন। সঙ্গে যোগ করে দিলেন, 'বাট আই অ্যাম শিয়োর দে হ্যাভ রেড ইচ আদার।' আমাকে শুধরে বলতেই হল, 'আই হ্যাড লার্নড ফ্রম হিজ বুকস বাট আই অ্যাম শিয়োর হি হ্যাজ নট রেড মি অ্যাজ আই অ্যাম নট ট্র্যানস্লেটেড ইন ইংলিশ।'

আইজাজকে একটু লাজুক প্রকৃতির মনে হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে বলে বিব্রতও। কিন্তু উনি যে-কথা বলতে চাইছিলেন সেই কথা উচ্চারণে ও ব্যাখ্যানে যেন দ্বিধা ছিল, বৈজ্ঞানিক সুলভ, যেন তাঁর বক্তব্যের বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। সেই ভঙ্গিটা বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছিল ও বুঝে ফেলে খুব মজা পেয়েছিলাম।

সেই পুরনো কথাটা মনে পড়ল 'ফ্রন্টলাইন'-এ তাঁর কথোপকথন পড়তে-পড়তে। তিনি এখানে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণে নেই, কর্পোরেট থেকে মোদী-শাহ এত টাকা তাঁদের হেফাজতে রেখেছেন যে সেই টাকা থেকে তাঁরা ভোটের সময় বা অন্য প্রয়োজনে শুধু তাঁদের প্রতি অনুগত কর্মী নিয়োগ করতে পারেন, তেমন নিয়োগের জন্য বিজেপি বা সঙ্ঘের অনুমতি বা অবগতি প্রয়োজন হয় না, যিনি পড়বেন তাঁর মনে পড়ে যাবে হিটলার কী পদ্ধতিতে তাঁর নাৎসি বাহিনী তৈরি করেছিলেন। আইজাজ সে কথায় না গিয়ে বরং মনে করিয়ে দিয়েছেন আমেরিক্যান রাজনীতির কথা, গান্ধী থেকে আর-এস-এস সবারই চেষ্টা ছিল জাত-পাঁতকে কিছুটা জায়গা দিয়ে বৃহত্তর হিন্দুত্বের মধ্যে তাদের ধরে রাখতে, ২০১৯-এর ভোটের সবচেয়ে বড় দুর্লক্ষণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বাম-ভোটের বেশ বড় একটা অংশের বিজেপির ভোটার হয়ে যাওয়া, ভারতে বামপন্থীরাই একমাত্র সংগতির সঙ্গে খেটে-খাওয়া মানুষের কথা ভাবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন সবচেয়ে অনড় ভিত্তির ওপর ছড়িয়ে আছে, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানে বামপন্থাই সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারী মতাদর্শ, ২০১৪-এর ভোটে যা হয়েছে, ২০১৯-এর ভোটের ফলে হয়তো বৃহত্তর বিপর্যয় ঘটবে, দেশের এমন হাল হবে যে তরুণরা এক ক্ষতবিক্ষত দেশকে হাতে পাবে ও তাদের গোড়া থেকে দেশের পুনরুত্থানের কাজ করতে হবে, কোটি-কোটি ভারতবাসী পরধর্মসহিষ্ণু— সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে জাতপাঁত ভিত্তিক ভগবানে বিশ্বাসী মানুষজনের সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে, সাম্প্রদায়িকতা করে তো লাভও হয়— শিখ-বিরোধী দাঙ্গার ফলে কংগ্রেসের এম-পি কত বেড়ে গেল, রামজন্মভূমি আন্দোলন করে বিজেপি তাদের এম-পি বাড়াল, ২ থেকে ৮৫, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সেই সংখ্যা বেড়ে হল ১৬১, ২০-বছর আগের চাইতে ভারত এখন অনেক বেশি হিন্দু— ধনী কৃষক থেকে দলিতরা পর্যন্ত।

এই পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তার পর থেকে গ্রামশ্চি তাঁর 'প্রিজন নোটবুকস'-এ কেন আত্মসমীক্ষা করেছিলেন, প্রত্যেক দেশ তার

যোগ্য ফ্যাসিবাদ পায়। সমাজতন্ত্র ছাড়া প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা আসতে পারে না, ফরাসি দেশের প্রতিবিপ্লব, বিপ্লবী কার্যক্রমের পদ্ধতি খুঁজতে লেনিনের নিদর্শন সব সময় প্রয়োজনীয় নয়, আপনারা আমাকে জিগগেস করছেন এখন কি ভারতে ফ্যাসিবাদ আসছে— আমার উত্তর হবে 'না', কারণ বিজেপি বা সঙ্ঘ কারোরই ফ্যাসিবাদী হওয়ার দরকার নেই।

এই লেখাটি লেখার তাগিদ বোধ করতাম না যদি আইজাজ-এর এতটা দীর্ঘ কথালাপের যে-সূচিপত্র আমি তৈরি করলাম— তার দ্বিতীয় অংশ বলা না হত। আইজাজ-এর মারাত্মক ভুল হয়েছে কী নিয়ে কথা বলছেন তার কেন্দ্রীয়তা বিষয়ে তিনি অস্পষ্ট ও তাঁর এই বিষয়ের কেন্দ্রে আছে ইয়োরোপ ও আমেরিকার রাজনীতি ও অর্থনীতি। ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লবের ইতিহাসকে তিনি বেশ বিস্তৃত ভাবেই ব্যবহার করেছেন কিন্তু একবারের জন্যও এ-বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণিক বই মার্ক্স-এর 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব নেপোলিয়ন'-এর উল্লেখই পর্যন্ত করেন না। যদিও মার্ক্স-এর এই বইয়ের ব্যাখ্যা আমাদের দেশের পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এখন। আইজাজ-এর লেখা যখন আমরা পড়ছি তখনই কেন্দ্রের নতুন বিজেপি সরকার প্রতিবিপ্লব সম্পর্কে একেবারে মার্ক্সের লিখিত লাইনগুলির অনুকরণে ভারতের একটা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন করে নেন। যে-ভাবে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে তা প্রায় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে উপহাস্য। সরকারি এক অর্ডার বের করার জন্য জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল হিশেবে নিযুক্ত এক ব্যক্তিকে কখনো জম্মু-কাশ্মীরের সরকার, কখনো জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা ও কখনো রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি ধরা হয়েছে। সংবিধান সংশোধন করার ঝামেলা এড়াতে ৩৭০ ধারা কিন্তু সংবিধানে রয়ে গেল। কিন্তু তার কোনো কার্যকারিতা থাকল না কারণ জম্মু-কাশ্মীর বলে রাজ্যটাই নেই।

লুসে তুলিন লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক। তিনি এ-বছরই 'ইন্ডিয়ান ফেডারেলিজম' নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি প্রায় তালিকা করে দিয়েছেন— ১৯৫৪ থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অধিকার ভুক্ত ৯৭টি বিষয়ের মধ্যে ৯৪টি ৩৭০-এর আওতায় এসেছে ও সংবিধানের দুই-তৃতীয়াংশ ৩৭০-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। তা হলে ৩৭০ ধারা কী করে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের ঐক্যের বাধা হতে পারে ও ভারতের একটা রাজ্যকে বর্হিপৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হতে পারে?

হতে পারে একমাত্র ফ্যাসিবাদী দখলদারি থেকে। ইতিহাসে কতকগুলি ঘটনা কতকগুলি পরিভাষা তৈরি করে দেয়। ফ্যাসিবাদ তেমনি একটি পরিভাষা। সেই পরিভাষাকে পরিভাষা হিশেবেই দেখা ভালো ও সংগত। আইজাজ এক জায়গায় বলেছেন একটা দেশ তার যোগ্য ফ্যাসিবাদ তৈরি করে অথচ তাঁর আলোচনায় তিনি ইয়োরোপীয় ইতিহাসের বাইরে যান না।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ফ্যাসিজিমে ওপর একটা রিডার বের করার উদ্যোগ নেয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক অনেককে আমন্ত্রণ করলেন জানাতে— কী ভাবে এমন একটা সংকলন তৈরি হওয়া উচিত। অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক জানিয়েছিলেন— ফ্যাসিবাদ কোনো সিস্টেম নয়, দার্শনিক শৃঙ্খলাও তার নেই, বিষয় হিশেবে এর কোনো জ্ঞানতত্ত্ব নেই।

সম্ভবত এমন কোনো একটা ভ্রান্তিতেই আইজাক বলতে পারেন ভারতের বর্তমান অবস্থা ফ্যাসিবাদ নয়। কারণ বিজেপি বা সঙ্ঘ কারোই ফ্যাসিবাদ দরকার নেই।

ধরে নিচ্ছি তিনি বলতে চেয়েছেন— ফ্যাসিবাদ না করেই যদি ফ্যাসিবাদী হওয়া যায় সেটাই লাভজনক।

এমন ধরে নেওয়াটা আইজাজ-এর প্রতি বিশ্বাসবশত ঘটে যেতে পারে কিন্তু তাকে আইজাজ-এর ভুলটা শুধরোয় না। আমাদের সকলেরই একবার ১৯৪৭-এর সেই রক্তাক্ত দিনগুলির কথা মনে রাখা দরকার যখন মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উদ্ভাসন ঘটছে ও সংবিধান পরিষদ সংবিধান তৈরি না করে দেশের স্বাধীনতাকে আকার দিচ্ছেন না। সেই কর্তব্যবোধ, তিতিক্ষা, প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব ছিল উপনিবেশ-মুক্তির সবচেয়ে উজ্জ্বল দিগন্ত। সেই সংবিধানকে অকার্যকর করাই দেশদ্রোহিতা। সংবিধান পরিষদের সমস্ত তর্কবিতর্ক বড়-বড় খণ্ডে ছাপা হয়েছে— সেগুলো পড়লেই যে-কারো চোখে পড়বে হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিনিধি সংখ্যায় কত বেশি ছিল। সুতরাং রাষ্ট্র গঠনে তাঁরা তাঁদের সময় পেয়েছিলেন। এখন সেই সংবিধানকে পরোক্ষত নিষ্ক্রিয় করা জাতির প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। আইজাজ তত্ত্বের বাইরের এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা ভুলে থাকবেন কেন?

আপোশহীনতার অলিগলি

সৌরীন ভট্টাচার্য

তাঁর আপোশহীন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। নানা গণ্যমান্য মানুষের প্রসঙ্গে এই বাক্যটা আমরা হামেশাই প্রয়োগ করে থাকি। এবং কথাটা যখন উচ্চারণ করি তখন গলায় খুব সমীহ করার ভাব বজায় রাখি। অর্থাৎ এই দুটো কথা আমাদের কাছে বেশ নির্ভেজাল গুণের কথা হিসেবেই ধরা পড়ে। উনি প্রতিবাদ করেন। বলে না দিলেও ধরা চলে যে, অন্যায় দেখলেই উনি প্রতিবাদ করেন। এইরকমই আমরা মনে করি। কেননা ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে প্রতিবাদ করেন, এটাকে নিশ্চয়ই এখনও তেমন গুণের কথা বলে মনে করা হয় না। এখনও হয় না, তবে কোনোদিন হবে না তা বলা বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কারণ প্রতিবাদ করতে করতে প্রতিবাদ একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। বস্তুত অভ্যাস সেইভাবেই তৈরি হয়।

প্রতিবাদ যে অভ্যাসে পরিণত হয় তার হাতেনাতে প্রমাণ গণপিটুনি। গণপিটুনিরও আবার প্রকারভেদ আছে। সব গণপিটুনি এক রকমের নয়। রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনা আর হাসপাতালে ডাক্তার পেটানো এ দুটো এখনকার গণপিটুনির দুই প্রধান নজির। গাড়ি, বিশেষ করে বাস বা ওইরকম গণপরিবহনের যান হলে সুবিধে হয়, বেশ অনেক লোকজনের ব্যাপার হয়, তার একটা আলাদা তাৎপর্য ও মাদকতা দুই-ই আছে। আর তা ছাড়া বাস যে দুদ্দাড় চালায়, এ-ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে একথা কে না জানে। সেইসময়ে যদি কাউকে ধাক্কা দেয়, বিশেষ করে স্কুলে নিয়ে যাবার সময়ে বাচ্চার হাত ধরা মাকে যদি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় আর তার ফলে যদি ভয়ানক কিছু ঘটে যায় তাহলে প্রাথমিক কর্তব্য অবশ্যই বাসটাকে ধাওয়া করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ড্রাইভার কনডাক্টর কাউকে পাওয়া যায় না, কেননা তাঁরা এই গণপিটুনির ভয়েই বাস ফেলে রেখেও পালিয়ে যান। তখন নিদেন বাসটাকে পুড়িয়ে দিতেই হয়। কারণ শেষ বিচারে বাসের দোষ অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই। বাসটাই তো ধাক্কা দিয়েছে, তবেই-না এত বড়ো কাণ্ড হতে পেরেছে। আর বাসের মতো অমন শক্তপোক্ত একটা লোহা লক্কড়ে বানানো জিনিস ছুটে এসে জোরে ধাক্কা দিলে অঘটন ঘটতেই পারে। সত্যি কথা বলতে ড্রাইভার বা কনডাক্টর নিজেরা হাতে করে ধাক্কাধাক্কি করলেও কত বড়ো সর্বনাশ আর হতে পারত। বড়োজোর রাস্তায় পড়ে যেত, একটু-আধটু হাত-পা ছড়ে যেত। ফার্স্ট এইড একটু দিয়ে দিলেই ব্যাপারটা মিটে যেত। বাচ্চাকে আদর করে তুলে ধরে জীবনের ওঠা-পড়া যেন গায়ে না লাগে বলে বোরোলীন লাগিয়ে দিলেই চলত। কিন্তু বাস এসে ধাক্কা দিলে সে হবার জো নেই। কাজেই প্রাণান্তকর দুর্ঘটনায় বাসের ভূমিকা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না।

এখন এই জায়গায় যাঁরা রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে তাঁদের আধ-খাওয়া চায়ের গ্লাস ফেলে রেখে এই জরুরি কাজের জন্য ছুটে এসেছেন তাঁদের কাছে এরকম ছেলেমানুষি তুলে নিশ্চয় কোনো লাভ নেই যে বাসের কি কোনো ইচ্ছাশক্তি আছে। আরো হয়তো বললেন, বাস তো চালকের হাতে ক্রীড়নকমাত্র। তখন চালক বলতেই পারেন, ক্রীড়নকের কথা যদি তোলেন তাহলে আমি তো কনডাক্টরের হাতের ক্রীড়নক। আমি তো তার হাতের ঘন্টির দাস। কনডাক্টর বলতে পারে আমি তো হেল্পারের হাতে বাসের গায়ে চড়চাপড়ের দাস। সে তখন অত জোরে বাসের গায়ে আওয়াজ তুলল কেন। তা ছাড়া রাস্তায় কেউ পার হচ্ছে কিনা সেটা দেখে তবে তো সে বাস চাপড়াবে। চায়ের গ্লাস রেখে যাঁরা ছুটে এসেছেন তাঁরা এত সময় এইসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চা ঠান্ডা হয়ে যাবে না। তাই যা করার চটপট করে ফেলতে হবে। দোষ বাসের অবশ্যই কেননা এই বাসটাই ধাক্কা দিয়েছে এটা সবাই দেখেছে অতএব পোড়াও। এবং অন্য দু-চারটে গাড়ি ভাঙচুর করাও খুব জরুরি কাজ। নইলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা যাবে কীভাবে। আর ব্যাপারটার যদি তেমন কোনো গুরুত্ব নাই থাকে তাহলে শাসকদল এবং বিরোধী দলের নেতারা তরজায় মাতবেন-বা কেন। ভাঙচুর ও রাস্তার অবরোধ যদি তেমন গুরুত্ব নাই পায় তাহলে খবরের কাগজের হেডলাইনে এ খবর ছাপা হবে কোন যুক্তিতে। আর তাই যদি না হয় তাহলে একটা ঐতিহাসিক

ঘটনার অংশী হবার কোনো অবকাশ তৈরি হয় না। সত্যি সত্যি ইতিহাসে জায়গা পাবার এমন সুযোগ হাতের কাছে বার বার আসে না। তার জন্যে দরকারে চা-ও না-হয় ঠান্ডা হবে, তা হোক।

হাসপাতালে ডাক্তার পেটানোর শিল্পটাও প্রায় এইরকম সংগঠিত শিল্পের চেহারা নিচ্ছে। এমনিতেই আমাদের হাসপাতালগুলোর চারপাশে সামাজিক স্বাস্থ্য রীতিমতো সুরক্ষিত। গাঁজা বা অন্য নেশার দ্রব্যের জন্য হাসপাতালের রোগী বা তাঁদের আত্মীয়স্বজনের খুব বেশি দূরে ঘোরাঘুরির সময় কোথায়। তা ছাড়া যাঁদের সাধারণত সমাজবিরোধী বলে আখ্যা দেওয়া হয় তাঁদের অবস্থান যাতে হাসপাতাল থেকে খুব দূরে না হয় তা দেখা অবশ্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। কেননা হাসপাতালে যদি কোনো 'অবাঞ্ছিত' ঘটনা ঘটে তাহলে তা প্রতিরোধের জন্য যে ব্যবস্থা তা অবিলম্বেই নিতে হবে। নইলে ঘটনা হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। ধরা যাক গভীর রাতে পথ দুর্ঘটনায় আহত কোনো ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগের হাতে আরো জরুরি কোনো কাজ থাকায় তাঁরা সে রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারলেন না। সেকথা জানিয়ে দিলেন বেশ পরিষ্কার ভাষায়। সঙ্গের লোকজনকে বুঝিয়ে বলে দিলেন অন্য কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তাঁরা রাজি হলেন না। শোনা যায় জোরাজুরিও করেছিলেন। দুর্ঘটনার রোগী, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা নাকি দিতেই হবে। তর্কবিতর্ক, একটু ঠেলাঠেলি, হয়তো-বা ধাক্কাধাক্কি হতেই পারে। হয়তো আন্দাজ পাওয়াই যাচ্ছে যে আশেপাশে প্রস্তুত লোকেরা বিশ্রাম নিচ্ছেন, কিন্তু কান মন সজাগ, প্রয়োজনে তাঁদের একটু সক্রিয় হয়ে উঠতে হতে পারে। এবং এই প্রস্তুত লোকেরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনাতেই প্রস্তুত থাকেন। তবে ঘটনা সেদিন হয়তো বেশি দূর এগোয় না। কারণ ওই আহত রোগীর দিকে মনোযোগ বেশি দেবার অবকাশে অন্যেরা যখন তাঁকে অন্য হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত তখন হঠাৎ একজনকে ফটকের ভিতরে ঢুকিয়ে বড়ো গেট, ধরা যাক, বন্ধ করে দেওয়া হল। অন্যেরা তখন হয়তো অন্য হাসপাতালের পথে খানিক দূর এগিয়ে গেছে, ফলে সে রাতে তখন কেউ জানতেই পারল না যে সঙ্গী একজন চিকিৎসা পরিষেবায় তৎপর এক হাসপাতালে বন্দি হয়ে আছেন। বন্দিকে ভাঙচুরের অভিযোগে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হল। এক রাত্রি থানার লক-আপে কাটল। পরের দিন বেশ খানিক কাঠখড় পুড়িয়ে জামিন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা গেল।

ধরা যাক এ গল্পের এখানেই শেষ নয়। যাকে বন্দি করা হল তার সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীরা একদিন প্রতিবাদ করার জন্য মৌন মিছিল করল। যে মিছিল কোনো আওয়াজ তোলেনি, শুধু হাতে ছিল কিছু ধিক্কারধ্বনির পোস্টার। শোনা গেল কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ বাহিনী নাকি একেবারে তৈরি ছিল। একটু বেচাল কোথাও কিছু দেখলে তখনি ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ ছিল। এরকম নির্দেশ থাকে। এই ধরনের নির্দেশ যে-বাহিনীকে পালন করতে হয় তাদের এখনকার একটা পরিচয় বাউন্সার। অনাদায়ী ঋণ আদায় করার জন্য ব্যাঙ্ককে এই বাহিনী নাকি পোষণ করতে হয়। শুনেছি, জানি না, পানশালাতেও নাকি থাকে। মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলে উচিতমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। দৃশ্যমান জগতের আড়ালে কত যে অদৃশ্য জগত থাকে। তাই এসব দেখার জন্য কবি-দার্শনিকদের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়। দেখতে পান বলেই তাঁদের বলা হয় দ্রষ্টা।

জানি এইখানে আমার বন্ধুদের কাছে আবার খোঁটা খেতে হবে। কথায় কথায় এত কবি-দার্শনিকদের গুণ গাইলে অনেকের মুখ ভার হয়। তাঁরা বলেন যত সব ধোঁয়ার চাষ। গাঁজা আফিমের চাষ নিষিদ্ধ করে ভালোই হয়েছে। তাও এই কবি-দার্শনিকদের হাত থেকে মুক্তি নেই। ফস করে কেউ বলে বসবেন, ওই নিষিদ্ধ করতে গিয়ে পোস্ত খাবার সাধ ঘুচেছে। তাই এখন পোস্ত নামের সিনেমা দেখে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। যাক গে এসব কথা, কথায় শুধু কথা বাড়ে। আর এদিকে কী বলতে গিয়ে যে কী বলে ফেললাম তার ঠিক নেই। বলছিলাম প্রতিবাদ করতে করতে প্রতিবাদের অভ্যাস হয়ে যায়। তা এ তো যা দেখছি তাতে অভ্যাস কই, এ একেবারে রীতিমতো নেশা বললে নেশা, তার চেয়েও বেশি, এ তো আস্ত পেশা। আর বাউন্সার যে বলশালী পেশা তা কে না জানে। হয়তো বিজয় মাল্য বা নীরব মোদী তাঁরাও জানেন। না জানলে এঁদের সামলান কি করে।

কিন্তু আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। আমি তো বলব বলে শুরু করেছিলাম আপোশহীনতার কথা। তা প্রতিবাদের কথায় ঢুকে গিয়ে সেখান তেকে আর বেরোতে পারছি না। আসলে ঢোকার আগে বুঝিনি প্রতিবাদে এত জাদু আছে। সাধে কী আর লোকে কাতারে কাতারে প্রতিবাদে শামিল হয়, ক্ষণে অক্ষণে। আমাদের এক সাংসদ সংসদে প্রতিবাদ করতেন। করারই কথা। সংসদে অনাচারের প্রতিবাদ করবেন বলেই-না আমরা সাধারণ মানুষ তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠিয়েছি। তা তিনি ন্যায্য প্রশ্নে প্রতিবাদ করবেন না তো কে করবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, প্রতিবাদ কোনো বিমূর্ত শিল্প না। প্রতিবাদের জন্য ইস্যু লাগে। এবং নিয়মিত পেশাদার প্রতিবাদীর জন্যে ইস্যুতে অনেকসময় অনটন দেখা দিতেই পারে। শুনেছি আমাদের এই সাংসদেরও একসময়ে ইস্যুতে কম পড়েছিল। তিনি স্কুলের প্রভিডেন্ট ফান্ড পর্যন্ত পৌঁছে

ছবি : মনোজ দত্ত

গিয়েছিলেন। কোনো স্কুলের কর্তৃপক্ষ নাকি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উপযুক্ত জায়গায় জমা করেননি সময়মতো। গুরুতর অভিযোগ। সাংসদকে মনোযোগ দিতে হবে বই কী!

প্রতিবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে আপোশহীনতা। আমি প্রতিবাদে যত অভ্যস্ত হই জনমনে ততই আমার আপোশহীন অবস্থান দানা বাঁধে। মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় উনি প্রতিবাদী, আপোশহীন মানুষ। প্রতিবাদী আপোশহীনতা চরিত্রের সদ্‌গুণ হিসেবে কীর্তিত হতেই পারে, হয়ও। তিনি মাথা নোয়ান না কারো কাছে। আজকের কুঁকড়ে যাওয়া কুঁচকে থাকা সময়ে দিব্যি ইস্ত্রি করা ঋজু একটা চরিত্র কার-না হাততালি পাবে। কিন্তু আমাদের অজান্তে একসময়ে এই ঋজুতাই ছোবল বসায় আমার স্বভাবে। যেসব চিন্তাভাবনাকে আমি প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি সারা জীবন, পালন করার চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো সেখানেই একদিন দেখা যায় ঘুণ ধরেছে। পুরোনো বাড়ির দরজা-জানলা এতদিন আমায় সামলেছে বলে যেমন চিরদিন অটুট থাকে না তার কলকবজা, তেমন আমার স্বভাব আর মন মেজাজেও একদিন জং ধরার দাগ দেখা যায়। ভিতর থেকে পেরেকে মরচে পড়ে একদিন। আমার আপোশহীনতা একদিন এমনকী ডেকে এনে ঘরে তুলতে পারে অগণতান্ত্রিকতাকেও।

আমি তো পাশ থেকে কাউকে সরিয়ে দিতে চাইনি কখনো। আমি তো থাকতেই চেয়েছিলাম সবার হাত ধরে। কিন্তু কখন অজান্তে আনমনে টের পাইনি অনেক হাত খসে পড়েছে আলগা হয়ে। আসলে হাতগুলো সমানে সমানে আঙুল ধরেনি অনেকদিন। আঙুলের সে রহস্য খেলায় তাল কেটে গেছে। আমি মেতে ছিলাম আমার আপোশহীনতার গনগনে আঁচে। চোখে পড়েনি। অন্ধকার জমে উঠছে চারপাশে, ডালে ডালে ঝুলে আছে বাদুড়ের মতো।

তাই প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ করতে হয় কখনো।

হাবারামের (নির্-) ঈশ্বরচিন্তা

পবিত্র সরকার

নানা ধর্মে ধর্মতত্ত্ব বা theology-র নানা বিশেষার্থক শিক্ষা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও কখনও কখনও তার কেন্দ্র থাকে, তা বিদেশে নিজের অভিজ্ঞতাতেই দেখেছি। তা ছাড়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আর শিক্ষাকেন্দ্র ধর্মবিষয়ক শিক্ষাই বিশেষভাবে দেয়। এছাড়াও নৃবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞানে ধর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা থাকে। সাহিত্যের বিষয় বা উৎস হিসেবেও ধর্ম সম্বন্ধে একটু আধটু জানতে হয়। অর্থাৎ পড়ে শুনে এবং বলা বাহুল্য, আচরণ করে ধর্মবিষয়ে জানার বহুবিধ উপায় আর সুযোগ আছে। আমি কৈশোরকালের পর সাহিত্যের ওই সংকীর্ণ জায়গা ছাড়া সেই সব নানা সুযোগ কোনভাবেই নিতে পারিনি, ফলে এ লেখা নিছকই এই নবিশের লেখা। ম্যাক্স ভেবার ইত্যাদি কবে পড়েছিলাম, তার আদ্যোপান্ত ভুলে মেরে দিয়েছই। তাই আসলে এটা কোনও লেখাও নয়, একটা প্রশ্নের সম্ভাবনা নিয়ে একটু আলোচনা। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে হাবা বা হাঁদা লোকের তুচ্ছ জল্পনা। তাতেই চার হাজার শব্দ হল, পাঠক অবাক হয়ে ভাবতেই পারেন!

বহু ধর্মে যেমন সাকার ঈশ্বরের কথা আছে, এমনই বহু ধর্মে নিরাকার ঈশ্বরের কথাও আছে। প্রথম দলের মধ্যে আছে প্রাচীন গ্রিক, নরোয়েজীয়, হিন্দু, চিনা, জাপানের শিন্তো ইত্যাদি, তেমনই নিরাকারবাদীদের মধ্যে পড়ে খ্রিস্টধর্ম, ইহুদিদের ধর্ম, ইসলাম আর ভারতে অপেক্ষাকৃত নতুন ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্ম প্রথমে নিরীশ্বরবাদী ছিল, ঈশ্বরের জায়গায় তাঁরা নির্বাণকে বসিয়েছিল, পরে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নানা দেবদেবীর উদ্ভব ঘটে। মহাযান মিয়ানমার চিন কোরিয়া জাপান ইত্যাদি দেশে বিস্তারিত হয়, শ্রীলঙ্কায় প্রাধান্য পায় হীনযান। ফলে ভারতীয় দেবদেবীরাও নানা রূপে, কখনও নাম বদলে, পূর্ব এশিয়ার সে সব দেশের দেববিন্যাসে জায়গা আন। আমি ধর্মতত্ত্ব বা পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলির ইতিহাস খুবই কম জানি, আর আদিম ধর্মগুলির ইতিহাস জানি আরও কম। আমার প্রশ্ন শুধু নিরাকার ঈশ্বর নিয়ে, তাও আমাদের বাংলা সাহিত্যে যে ভাবে তার রূপটি তুলে ধরা হয়েছে তাই নিয়ে। আমার মূল অবলম্বন কিছু রবীন্দ্রসংগীত। কিছু ব্রহ্মসংগীতও হয়তো নেওয়া যেত, কিন্তু আমার মনে হয়েছে ব্রহ্মসংগীতগুলির বেশিরভাগ যথেষ্ট ব্যক্তিগত নয়, রবীন্দ্রনাথের গানগুলি যে রকম।

এটা ঠিক যে, বহু দেবদেবীর (সেই সঙ্গে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের) ধারণার চেয়ে একেশ্বরবাদ এক অর্থে, তর্কসাপেক্ষে, একটা তাত্ত্বিক অগ্রগতি। কারণ বহু দেবদেবী এক হিসেবে সর্প্রাণবাদ বা animism-এরই অধিকাংশত মানবদেহধারী সংস্করণ, নৃবিবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে anthropomorphic বলে। হিন্দুধর্মে অবশ্য 'একোহং বহুস্যাম্' বলে এক ঈশ্বর এবং তার বহু রূপের মধ্যে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা আছে। তবু হিন্দু ধর্ম মূলত বহু দেবদেবী নিয়ন্ত্রিত ধর্ম। সাধারণভাবে হিন্দুরা এক ঈশ্বরের প্রাতিষ্ঠানিক পূজার্চনা খুব করে এমন দেখি না, তাদের আরাধ্যেরা প্রায়ই দেবতা অথবা দেবী, তাদের নামেই সব মন্দির। এদের উদ্ভাবের ইতিহাস বিচিত্র, সব যে বহিরাগত আর্যদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তা নয়। ঋগ্বেদের দেবদেবী বলতে মূলত ছিল প্রাকৃতিক শক্তি। উপনিষদে অবশ্য এক ঈশ্বরের ধারণা কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সনাতন ধর্মী বা হিন্দুদের দৈনন্দিন আরাধনায় বা মন্দিরে বা মন্দিরকেন্দ্রিক তীর্থস্থান তারা মূলত দেবদেবীদেরই পুজো করে। পাড়ার মন্দিরে কখনও কখনও একজন দেবতা বা দেবী প্রধান থাকেন, যেমন শীতলা, তার পরে তারও সঙ্গে বিচিত্র সমন্ধসূত্রে শিব, কালী ইত্যাদি কেমনভাবে জুড়ে যান, সকলেরই ঠাই হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মেই আবার উপনিষদে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা আছে, যা থেকে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

সর্বশক্তিমান কেন? সাধারণভাবে এই ঈশ্বর মূলত তিনটি প্রধান কাজ করেছেন বা করেন। এক, তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, ধর্মে এবং আস্তিক্যবাদী নানা দর্শনে তাঁকে সেইভাবেই দেখে। তিনিই আবার স্থিতি বা পালনেরও কর্তা, সবকিছুকে রক্ষা করেন। রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা বিচারকের দায়িত্ব আছে। তিনি ভালোকে পুরস্কার দেন, খারাপকে শাস্তি

দেন। এ ক্ষেত্রে প্রায় সব ধর্মেই 'পাপ' আর 'পুণ্য'-এর ধারণাটি কমবেশি তৈরি হয়েছে। পুণ্য করলে এই জীবনে শুধু নয়, পরকালেও পুরস্কার মিলবে, আর পাপ করলে এই জীবনে এবং পরের জীবনে উপযুক্ত শাস্তি মিলবে।

অর্থাৎ মানুষের সমাজবন্ধন আর অস্তিত্বের জন্য যে নৈতিকতা বা moral values অত্যাবশ্যক, তার একটা ভিত্তি এখানে। পূর্বজন্ম, পরজন্ম, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি এই নীতিবোধের সঙ্গে জুড়ে যায়, যদিও সব ধর্মে জন্মান্তরের ধারণা নেই, স্বর্গ-নরকের ধারণা থাকেও। তবে ইহজন্মেই পাপের প্রতিষেধক হিসেবে নানা ব্যবস্থা আছে, হিন্দুধর্মে যেমন দৈনন্দিন পূজো-আচ্চা, ব্রাহ্মণদের ত্রিসন্ধ্যা, মন্দির ও তীর্থে গিয়ে পুজো, গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ, নানা দয়াদাক্ষিণ্যের কাজ— আর্তের সেবা, ক্ষুধার্থকে অন্নদান ইত্যাদি। সব ধর্মেই এই সব সৎকর্মের বিধান আছে।

হিন্দুধর্মে অবশ্য পাপক্ষালনের কিছু shortcut উপায়ও আছে। অন্য ধর্মেও আছে। বাংলায় যেমন 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না' বলে একটা কথা আছে, তেমনই হিন্দু বাঙালি যতই পাপই করুক, 'রাম নাম' নিলে ('একবার রাম নামে লক্ষ পাপ হবে'), নামকীর্তন বা গঙ্গাস্নান করলে আপনার সব পাপ বিমোচিত হবে। যে জন্য প্রয়াগে বা গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। নিশ্চয়ই চোর-ডাকাত-জোচ্চোররাও সেখানে গিয়ে রথ দেখা আর কলা-বেচা দুইই করে, অর্থাৎ নিজেদের ব্যাবসাও চুটিয়ে করে, আবার তার 'পাপ' ধুয়েও ফেলে। তা যে সম্ভব, সে কথা বিশ্বাস না করলে এত কষ করে লোকে এই সব স্থায়ী বা অস্থায়ী তীর্থে যেত না। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে এক সময় ভক্তদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাদরিরা ঈশ্বরের 'indulgence' বা ক্ষমা বিক্রি করতেন, তারও ইতিহাস আছে। খ্রিস্টধর্মে confession বা পাপস্বীকারেরও ব্যবস্থা ছিল, তাতেও সম্ভবত পাদরিদের বা গির্জায় টাকা দিতে হত।। যাই হোক, ধর্মের ঈশ্বর এই stick and carrot বা মুদগর ও গাজর নীতির দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন। আর তিন নম্বর, তিনি ইচ্ছে করলে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারেন। মানুষই নিজেই এ কাজটা হাতে নিয়েছে বলে তাঁর বেশি কিছু করবার দরকার নেই বলেই মনে হয়। তিনি নিজে এখনও এ ব্যাপারে হাত লাগাননি, কিন্তু মাঝে মাঝেই আমাদের কাছে কেউ কেউ চেতাবনি দেয় যে 'প্রলয়ের আর দেরি নেই, পৃথিবীর পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে।' এ সব শুনে পাপীরা দূরে থাক, সাধারণ লোকেও এখন আর তত ঘাবড়ায় না। তাঁরা বলবেন যে, ঈশ্বর কি নিজে করবেন, তিনি মানুষকে দিয়েই এই ধ্বংস করাবেন। তা যদি হয় তা হলে তাঁর সমস্ত মন্দির-গির্জা-মসজিদ-সিনাগগ সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, তাঁর কোনও ভক্তও একজনও যদি থাকে তখনও, আর বেঁচে থাকবে না। মনে হয় তিনি ধরেই নেবেন, ভক্ত-ফক্তরা তখন দুনিয়া থেকে ঝেড়েপুছে বিদায় নিয়েছে। জানি না, ঈশ্বরের মনে সেই রকম কোনও প্রকল্প আছে কি না। তবে হিন্দুপুরাণে এর একটা ব্যাখ্যা আছে যে, এই দগ্ধ কলিযুগে পৃথিবীর সবটাই পাপে পূর্ণ হবে, কাজেই উপযুক্ত শাস্তি হিসেবেই ঈশ্বর ধ্বংস-বিধান নেমে আসবে, আমাদের অত হিসেব করার দরকার নেই।

তবে এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মালিক, অনেক সময় এই ঈশ্বর (বা দেবদেবীর) সঙ্গে সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হয় না। হিন্দুধর্মে পুরোহিত আছে, পাণ্ডা আছে— অন্যান্য ধর্মেও নানা রকম মধ্যস্থ আছে। তারা অনেক সময় বিশেষ এক 'জাত'— হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের সঙ্গে সাদারণ লোকের এই মধ্যস্থতার কাজ করে থাকেন, সে জন্য সমাজে দীর্ঘদিন তাঁরা পুজো পেয়ে এসেছেন। শুধু দেবতার মধ্যস্থ নয়, ব্যক্তিগত আর পারিবারিক গুরুদেব হয়েছেন, কানে 'ইষ্টমন্ত্র' দিয়েছেন, পারিবারিক শান্তিস্বস্ত্যয়ন করেছেন, এমনকি গ্রহবিপ্র হিসেবে কোষ্ঠী তৈরি এবং গ্রহবিপ্রের কাজও করেছেন। সেই জন্য ভারতের সংসদের বর্তমান স্পিকার সাহেব, শ্রীযুক্ত ওম বিড়লা ব্রাহ্মণদের প্রায় মানবশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন, বলেছেন অন্যদের এই মহান সম্প্রদায়কে পূজা করা উচিত। এদের মধ্যে ধর্ষণকারী গুরুদেবেরাও পড়েন নিশ্চয়ই। আর এঁরা মধ্যস্থ করেন শুধু ঈশ্বর বা দেবদেবীর নয়, এঁরা একটা ভাষাকেই রেখে দেন ঈশ্বর আর ধর্মের ভাষা হিসেবে— সংস্কৃত, আরবি, লাতিন, হিব্রু ইত্যাদি। হিব্রু ইজরায়েলিরা পুনরুজ্জীবিত করেছে, আধুনিক আরবিও কিছুটা প্রাচীন আরবির কাছে পৌঁছে দিতে পারে, কিন্তু বাকি ভাষাগুলির প্রচুর চর্চা থাকলেও জন্মসূত্রে পাওয়া মুখের ভাষা হিসেবে আর জীবিত নেই। কাজেই সেখানেও মধ্যস্থের প্রয়োজন হয়। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত জানেন, এই রকম একটু কুসংস্কার মানুষের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে নিছক বাণিজ্যিক কারণেই। আর সংস্কৃতের 'অং বং চং' হলেই উচ্চারিত ভাষায় একটা গাম্ভীর্য জেগে ওঠে, আমাদের না-বোঝার মধ্যেও একটা সম্ভ্রম যুক্ত হয়, আমরা হাত জোড় করে বসে থাকি।

বিশ্বাস, বিশ্বাস। প্রশ্ন নয়, 'কী কীভাবে কেন' ইত্যাদির কোনও প্রসঙ্গ নেই, উত্তরাধিকার সূত্রে সব মেনে নেওয়া। আমার বাপ এই ছিলেন তাই আমিও এই, আমি জন্মেছি এই পরিবারে তাই এক ধরনের বিশ্বাসের খাঁচায় আমি আটকে আছি। আর বিশ্বাস এক বার কাঁধে ভর করলে তা থেকে ভূতে বিশ্বাস, তাই ভূতের ওঝা থেকে সাপের ওঝা, নানা 'বাবা' ও 'মা', বৃষ্টি নামানোর জন্য কুকুরের সঙ্গে শিশুকন্যার বিয়ে, গ্রহনক্ষেত্রের অলৌকিক শক্তি, রাস্তায় ধর্মের ষাঁড় আর খাঁচার

মুনিয়ার ঠোঁটে করে বার করে বার করে আনা ভাগ্যের তাস, প্রবাল, গোমেদ, নীলা, তাবিজ-কবচ, জলপড়া, বালা, লালসুতো-নীলসুতো— সবকিছুতেই বিশ্বাস চলে আসে। 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছে নিপুণ হাতে'। সব দিকে বিশ্বাসের জাল বিছানো।

দুই

বিশ্বাসীদের কাছে এই ঈশ্বরের চেহারা কীরকম? অন্তত নিরাকারবাদীরা যা বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য *বোধোদয়* বইয়ের ভাষায়, তিনি 'নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ'। কার চৈতন্য? না, বিশ্বাসীর চৈতন্য। অর্থাৎ, যদি কথাটা ভুল বুঝে না থাকি, বিশ্বাসীর চেতনাতেই তাঁর অস্তিত্ব। তিনি আছেন, এই বোধ; সেই সঙ্গে, নিরাকার হলেও, একটা স্ববিরোধী বিশ্বাস তার সঙ্গে যুক্তি হয়ে গেছে, যা ভারতচন্দ্রের এই ছত্রে খুব স্পষ্— 'অচক্ষু সর্বত্র চা'ন, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি।' বিদ্যাসাগরও ওই একই অনুচ্ছেদে বলেন, 'তিনি সব দেখেন, জানেন।' এখানে জুড়ে দেওয়া ভালো যে, এই পাঠ *বোধোদয়*-এর প্রথম সংস্করণে ছিল না, পরে বিশ্বাসী বন্ধুদের অনুযোগ শুনে তিনি এই অকিঞ্চিৎকর এবং স্ববিরোধী অনুচ্ছেদটি বইয়ে জুড়ে দেন।

অথচ বিদ্যাসাগর agnostic বা সংশয়বাদী, এমন কথাও অজানা নয়। এখানে অবশ্য বিদ্যাসাগর আমাদের আলোচ্য নন, তাঁকে আমরা অন্যত্র পাকড়াও করেছি। আমাদের সমস্যা ওই agnosticism নিয়ে। তিনি আছেন কি না তা জানবার উপায় নেই। পরম সত্যকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই নাকি করা যায় না। এ কথা শুনে এখন আমাদের একটু আশ্চর্য লাগে যে, মানুষ এত কিছু করেছে, আকাশের নক্ষত্রলোকে মহাকাশযান পাঠিয়ে অসীম শূন্যকে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে, হাজার আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রের হদিশ পেয়েছে, চাঁদ সূর্য যে আদৌ দেবতা নয়, বস্তুপিণ্ড মাত্র তা বার করে ফেলেছে, অথচ ঈশ্বরের বেলায় বেমালুম বলে দিল যে, তাঁকে জানা সম্ভব নয়।

তাঁদের কথা আমাদের মতে একটা পরাজয়ের স্বীকৃতি, এবং তাঁদের সততার পরিচয়। পরাজয় এখানেই যে, তাঁরা আমাদের মতো সাধারণবুদ্ধির লোকেদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার দায়িত্ব নিতে চান না। প্রমাণ করতে পারবেন না বলেই কি? আমি এর মধ্যে এক ধরনের নিরীশ্বরবাদই দেখি। তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাহসী বা বিশ্বাসী অনেক মহাত্মা ঈশ্বরদর্শন করেছেন, আর শিষ্যদের নাকি ঈশ্বর দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের অবশ্য সে সব গুরু পাওয়ার সুবিধে হয়নি। দু-একজন 'প্র্যাক্টিজিং' গুরুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁরা দেখেছেন কি না এবং আমাকে দেখাতে পারেন কি না। তাঁর কথাটা কীরকম এড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'তার জন্য অনেক প্রস্তুতি দরকার সাধনা দরকার। আমি যেহেতু সে সাধনা আর করে উঠতে পারব না, আমার সে সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। আমি তবু নাছোড়বান্দার মতো বললাম, সে কী? ঈশ্বর তো পরম করুণাময়, তিনি ইচ্ছে করলে তো অধম পাপীতাপীকেও দেখা দিতে পারেন। আমার মতো অধম আর কোথায় পাবেন? তাঁরা বললেন, ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের দেখা দেন না, কারণ ওই যে ধরতাই বুলি 'বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর।' আমি তবু গোঁ ধরে বললাম যে, কেন তর্ককে ঈশ্বর ভয় পাবেন কেন, তিনি যখন সর্বশক্তিমান। অবিশ্বাসীকে দেখা দিয়েই তিনি তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠা করুন! তা সেই সব গুরুরা ঘৃণাভরে আমার সঙ্গ পরিহার করেছেন। আর আমার এ সব কথায় আমার চেয়ে অনুজ কিন্তু ভক্ত অনেকে বলেছেন, 'এ ব্যাপারটা আপনি বোঝেন না, কাজেই এ নিয়ে কথা বলবেন না।' আমি তাদের বলবার চেষ্টা করেছি যে, আমি বুঝি না, কিন্তু বুঝতে চাই, তোমরা আমাকে বোঝানোর একটা মোটামুটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা করে দাও।' একবার দেখিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়! তাঁকে অনেক পড়াশোনা কসুর জানতে হবে, বা বিশ্বাস নিয়ে বসে চোখ বুজে ধ্যান করতে হবে— এ তো এক জুলুম। সব মানুষ কি তা পারে? নিরক্ষর মানুষ, কর্মী মানুষের কী হবে? তারা আমাকে বোঝানোর দায়িত্ব নেয় না। আমার মতো গোলা লোকের কি ঈশ্বরকে বোঝবার, অন্তত দেখে চিত্তির হওয়ার কোনও অধিকার নেই? ঈশ্বর তবে আছে কী করতে?

আর এ কেমন কথা যে, যাঁকে জানা সম্ভব নয়, তাঁকেই মাথা নত করে মানতে হবে! তার মূলে অবশ্যই একটা নৈতিক উদ্দেশ্য আছে, সেটা আমরা বুঝি। আমরা অপরাধ করার আগে যেমন রাষ্ট্রের আইন-ব্যবস্থা আর পুলিশের ভয় পাই (বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদি, বাবা রাম-রহিম বা স্বামী চিন্ময়ানন্দ বা বিধায়ক সেঙ্গাররা পায় না, যেমন অসংখ্য অপরাধীরা পায় না), তেমনই রাষ্ট্রেরও উপরে একজন আমাদের সব কিছুর উপর কড়া নজর রাখছেন, এমন ভাবলে নিশ্চয়ই অধিকাংশ লোক 'পাপ' বা অপরাধ থেকে নিরত থাকবে। 'তোমার কি ভগবানের ভয় নেই?' কিংবা 'পরকালের ভয় নেই?' কথাগুলিতে এই 'সকল ভয়ের ভয়' সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ হয়েই মানব-সমাজে এক প্রতিষেধক শক্তি, deterrent force. এখানে তাঁর সেই stick and carrot নীতির stick বা মুগুরটি আমরা দেখতে পাই। আর অবশ্যই তিনি, ওই চৈতন্যস্বরূপ হয়েই মানুষকে সুখ দেন, সান্ত্বনা দেন, পরম আনন্দসৌন্দর্য বা beatitude দেন, ভালো কাজের পুরস্কার দেন বলে মানুষ মনে করে, যে জন্য রাস্তার ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা চাইবার সময় বলে, 'ভগবান আপনার

ভালো করবেন।' আজকাল অটোর পিছনেও লেখা থাকে 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' কার্যক্ষেত্রে তা কতটা ঘটে, তা আমরা প্রশ্ন করি না। অর্থাৎ ঈশ্বরের এই একই সঙ্গে বিচারক আর পুলিশের রূপ মানুষকে কতটা অপরাধ থেকে দূরে রাখছে, পুলিশ তার জন্যে ঘুষ খাচ্ছে না, তোলাবাজ তোলাবাজি করছে না, চোর চুরি করছে না, ধর্ষণকারী ধর্ষণ, প্রতারক প্রতারণা ইত্যাদি থেকে সভয়ে বিরত থাকছে, নীরব মোদিরা ব্যাংকের সব ধার ফেরত দিচ্ছে, সুইট্সারল্যান্ডের ব্যাঙ্কের কালো টাকা সব ভারতে ফিরে আসছে, তা নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাই না। কেন ঘামাই না? ঈশ্বর যদি সকলজীবের মঙ্গলবিধানই করবেন তা হলে টেলিভিশনে খবরের কাগজে এত ভয়ংকর ভয়ংকর অপরাধে পাতাগুলি ছয়লাপ হয়ে থাকে কেন? ছেলে বাপ-মাকে কষ্ট দেয়, বউ প্রেমিককে দিয়ে স্বামীকে খুন করায়, রাজনৈতিক শত্রুতার জন্যে খুন বা বিরোধীদলের প্রতিবাদী স্বামী-স্ত্রী সুদ্ধ একসঙ্গে পুড়িয়ে মারা— এই সব উপাদেয় অপরাধগুলি ঈশ্বর দেকছেন তো? বিদ্যাসাগর তো নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের ধারণার পরেই লিখেছেন, তিনি সব দেখছেন, যদিও অন্যত্র তিনি সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কী ভাবে? আমরা আগে 'ধর্মভীরু' কথাটা ব্যবহার করতাম সাধারণ মানুষের আগে। এখনও কি ওই কথাটা ব্যবহার করতে পারব?

আসলে ঈশ্বর দেখছেন, জানছেন বা তিনিই সব করবেন এই সব কথা আমরা, এই তথাকথিত সাধারণ মানুষেরা, থোড়াই বিশ্বাস করি। মানুষের সভ্যতার কস্মিনকালে বিশ্বাস করেনি। তা হলে আমরা এত বিশাল বিচার আর পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুললাম কেন? ঈশ্বরের উপর বরাত দিয়েই যদি আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম তা হলে এ সবের দরকার হত কি? সন্তানের শিক্ষার জন্য আমরা রাত জেগে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের ফর্ম তোলার জন্য লাইন লাগাই, অন্যদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করি, সন্তান অসুস্থ হলে ভগবান যা করার করবেন বলে বসে থাকি না, ডাক্তারের কাছে দৌড়াই। কেন যারা সব ধর্মের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, ইফতার পারটিতে মাথায় হিজাবের মতো করে ঘোমটা দেয় বা গুরুদুয়ারাতে মাথা ঢাকে, তার বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমায় বাধা দেয়, ছাপ্পা ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত বিধানসভা বিরোধীশূন্য করতে চায়। কেন? কেন? যদি তিনি পরম শরণাগতই হন? বেশিরভাগ ঈশ্বরবিশ্বাস কি তা হলে লোকদেখানো, ভণ্ডামি? ঈশ্বরের মধ্যস্থরা অবশ্য 'পুরুষকার' বলে একটা কথা আমাদের দিকে ছুড়ে দেয়। বলে যে, ঈশ্বর দেখতে চান যে, কেউ চেষ্টাহীন হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই, সকলেই উৎসাহ আর ব্যগ্রতা নিয়ে কাজকর্ম করছে। এখানে পুরুষকারের পাশাপাশি 'নারীকার' বা ওই ধরনের কোনও শব্দ খাড়া হয়নি, যাতে নারীরাও যে চেষ্টা-টেষ্টা করতে পারেন তার স্বীকৃতি থাকে। অবশ্যই মধ্যস্থরা বলবেন, আরে গাধা, এখানে 'পুরুষ' মানে পুরুষ নয়। তা হতেই পারে। কিন্তু 'পৌরুষ' কথাটার সঙ্গে পুংলিঙ্গধারীরা এতই জড়িত যে নারীদের ক্ষেত্রে এ কথাটা প্রয়োগ করতে একটু অস্বস্তি হয়। এই রকম জোড়াতালি দিয়ে আমরা ঈশ্বর নামক অলীক ধারণাকে প্রাণপণে ধাড়া রেখেছি, যে কোনোও প্রশ্নের উত্তরে একটা মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরি করে, এবং তাতেই আমাদের চমৎকার কাজ চলে যাচ্ছে, আর বিষয়টা নিয়ে পাজি নাস্তিকেরা ছাড়া আর কেউ নাড়াচাড়া করছিই না।

তিন

এ সবই প্রমাণ করে যে, এই ঈশ্বর, যিনি নিরাকার, বা যাকে জানা, বোঝা বা দেখা আদৌ সম্ভব নয়, তিনি বাস করেন মানুষের মস্তিষ্কে এক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে। ব্যক্তিহিসেবে নয়। ব্যাপারটা শুধু ভয়ংকর কঠিন নয়, অসম্ভব। ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি? সুধু চৈতন্যরূপী ঈশ্বর কি ধুয়ে খাব? শুধু চৈতন্য? ভাবতেই কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে, শুধু সাধারণ মানুষের নয়, বুদ্ধিজীবীদেরও। ফলে 'আইডিয়া'র উপর রূপের পর রূপ চাপানো হল, তৈরি হল নানা allegory. দেখুন, তাঁকে নানা বাংলা গানে কত ব্যক্তিসম্বন্ধে চিহ্নিত করা হয়েছে। পৌত্তলিকেরা এ কাজ করবে, তাতে কোনও বিস্ময় নেই— তাদের সামনে তো পরিষ্কার নানা জাতের নানা রূপের, উদোম জিভ বার-করা থেকে বাহছাল পরা খালি গা কত রকম মূর্তিই খাড়া থাকছে। ফলে মা, বাবা, বন্ধু, নাথ ইত্যাদি হয়েছেন দেবী এবং দেবতারা। বিশেষভাবে প্রিয় ও পরিচিতরা। ওই পর্যন্তই, অবশ্য— ভাই বোন দাদা, খুড়ো জ্যাঠা পিসে কেউ হয়েছেন বলে শুনিনি।

কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মও রেহাই পাননি। দেখুন আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ও গীতিকারের কাণ্ড। তাঁর গানে এই ঈশ্বর কত জায়গায় কত কিছু, আবার একই গানের মধ্যে একাধিক সত্তায় হাজির। কবি নিজেও কখনও বৈষ্ণব অনুষঙ্গ অনুসারে নারী সত্তার Persona বা প্রচ্ছদ গ্রহণ করেছেন ('ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে', 'তোমারি ঝর্নাতলার নির্জনে মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে')। আমরা, বলা বাহুল্য, তন্ন তন্ন করে সব দৃষ্টান্ত তুলব না, কিছু নির্বাচিত ছত্র সাজাব।

মাতা

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
তিমিরদুয়ার খোলো

পিতা

তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃতসদনে চল

বন্ধু, সখা, প্রিয়, প্রিয়তম, রাজা

চিরসভা হে, ছেড়ো না, মোরে ছেড়ো না
জগতে তুমি রাজা
তাইতে কি ভয় মানি, আমি জানি, বন্ধু জানি
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে চলো তোমার বিজনমন্দিরে
প্রিয়তম হে, জাগো. জাগো, জাগো
শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়

নাথ, প্রভু, স্বামী

অনেক দিয়েছ নাথ
প্রভু, তোমার আঙিনাতে তুলি আমার ফসল যত
প্রভু, বলো বলো কবে, তোমার পথের ধূলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে
হৃদয়বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে

গানের গুরু, মহাগায়ক, গানের বিধাতা, বীনকার— কবি যাঁর বীণা ইত্যাদি

আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে, শূণ্য তাহার পূর্ণ করিয়া
ধন্য করুক সুরে
আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান
কান্নাহাসির দোল-দোলানো তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে প্রভু, আমার জীবনে
তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে

আরও অনেক গান তোলা যায়, এবন্ত রবীন্দ্রনাথের কবি বা সংগীতকারের সত্তার সঙ্গে ঈশ্বরের হয়তো আরও অনেক সম্পর্ক বেরিয়ে আসতে পারে। একই গানে, বা নানা গানে হয়তো সম্পর্কের মিশ্রণ বা একটা থেকে অন্যটায় সহজ যাতায়াতও ঘটতে পারে। আমরা তা নিয়ে গবেষণায় বসছি না। আর রবীন্দ্রনাথের গানে এবং কবিতায় 'তুমি' এবং তার নানা প্রাচীন ও আধুনিক কারকরূপের মধ্যে যিনি লুকিয়ে আছেন তিনি এই অন্তরঙ্গ সর্বনামের মধ্যে একাধারে সবই হতে পারেন। এ নিয়ে কেউ কেউ আলোচনা করেছেন, আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। 'সে' এবং তার কারকরূপ 'তার' ইত্যাদিও সম্ভবত একই অস্তিত্বকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে— 'আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী'। ব্যাকরণে যেমন, জীবনেও আমি ছাড়া আর দুটি পক্ষই থাকে। আমি যদি বক্তা হয় তার কথা আর-একজনকে উদ্দেশ্য করে বলা, সে শোনে বা শোনে না তা বড় কথা নয়। সে আছে কি নেই তাও অবান্তর। কবির কাছে সে আছে, নানা রূপে, নানা বর্ণাঢ্য কল্পনায়, এই কল্পনাই কবির কথাকে উৎসারিত করছে— তাই হল আসল কথা। এবং রবীন্দ্রনাথের গানে বা অন্যান্য রচনায় সে নিরাকার নয়? ধর্ম এক রকম শেখায়, আর কবির সৃষ্টি তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

চার

আমরা রবীন্দ্রনাথকে হাস্যাস্পদ করে তোলার জন্য এই ছেঁড়াখোঁড়া অনুশীলন করিনি, আমাদের— আমরা নিজেদের এক ধরনের রবীন্দ্রানুরাগী বলে দাবি করি— ঘূণাক্ষরেও সেই বাসনা ছিল না। আমরা তাঁর বিশ্বাসের সংগীতেও আপ্লুত থাকি, কিন্তু তার দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত হই না। আমরা শুধু দেখাতে চাই যে, (আমাদের কাছে অলীক) ঈশ্বরকে নিরাকার এবং চৈতন্যস্বরূপ বলে তার ভজনা করা মানুষের পক্ষে সহজ নয়, কবি বা শিল্পীদের কাছে তো নই। আর রবীন্দ্রনাথের (এবং আরও অনেকের) সততা এখানেই যে, তাঁরা বলে দেন পরিষ্কার— তোমাকে জানিনে হে', কিংবা 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে...., হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে' এই কথাগুলি তিনি বলে দেন। তার পরের অংশগুলি তাঁদের বিশ্বাস আর আবেগজনিত কল্পনার মিশ্রণ, তার সঙ্গে আমাদের কোনও বিবাদ নেই। 'তবু মন তোমারে চায়' বা 'রয়েছ নয়নে নয়নে.... হৃদয়ে রয়েছ গোপনে' এ কথা তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তা তাঁদের রচনায় একটা দ্ব্যর্থকতা, একটা বিভাজন তৈরি করে। তার সঙ্গে আমাদের কোনও বিবাদ নেই, যতক্ষণ না তা মানুষ এবং সমাজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আর রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস তাঁর সারাজীবন ছিল কি না এ নিয়েও আমাদের সংশয় আছে, কিন্তু তা আলোচনার স্থান এ নিবন্ধ নয়। আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাস, বিশেষত বড় কোনও এক সত্তায় বিশ্বাস মানুষের শিল্পে কী সৌন্দর্য আর মহত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারে। সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের এই ইতিবাচক দিকগুলি সম্বন্ধে আমরা অনবহিত নই। গ্রিসের অ্যাক্রোপলিসের বিশাল বিশাল স্থাপত্য, সেই দেশে, চিনে এবং ভারতে নানা দেবদেবীর প্রস্তরভাস্কর্য, গির্জা, মন্দির আর মসজিদের অসাধারণ সব নির্মাণ, অজন্তার শিল্প, রোমের ভ্যাটিকানের ছাদে ধ্রুপদী ইতালীয় শিল্পীদের চিত্রকলা, মানব সভ্যতার বিপুল সুর আর সংগীতসম্ভার সবই ধর্মের প্রেরণায় সৃষ্ট হয়েছে, এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। তার নির্মানের ইতিহাসে দরিদ্র মানুষের রক্তের দাগ লেগেছে কি না, সেই অনুসন্ধানেও আমরা যাব না। আর ধর্মনির্ভর বহু প্রতিষ্ঠান ও মিশন বিপদে সেবা, শিক্ষাবিস্তার, শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদান ইত্যাদিতে সার পৃথিবীতে মানুষের বহু উপকার করেছে এবং করে চলেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। আবার ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি যুক্ত হয়ে

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধিয়েছে, ইউরোপের ক্রুসেড থেকে তার দৃষ্টান্ত কম নেই। ইজরায়েলের সৃষ্টি এক ধরনের ধর্মের জুলুমবাজিতে, ভারত-পাকিস্তানের বিভাজনও তাই। ধর্মের নামে অজস্র বুজরুকিরও শেষ নেই, তা আমরা আগেও বলেছি।

বিশ্বাস, বিশ্বাস। বিশ্বাস মানুষকে মহৎ করে, আবার ওই বিশ্বাসই মানুষকে ইতরতায় নামিয়ে আনে। সেই কবে আরিস্তোত্‌ল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বলে গিয়েছিলেন মানুষ নাকি চিন্তাশীল জীব (Man is a rational animal), কিন্তু আজ পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের হাতে-পাওয়া বা পথ, মণ্ডপ বা গুরুর মুখ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া বিশ্বাসের প্রবণতাকে তার যুক্তি বা চিন্তাশীলতা দিয়ে প্রশ্ন করার কথা ভাবে না। মানুষ পৌত্তলিকতা থেকে নিরাকারে পৌঁছাল, কিন্তু তার পরে সে যেন হঠাৎ থমকে গেল, তার পরের সিদ্ধান্তটা আর নিতে পারল না, যে ধর্মের ভিত্তি একটা বিপুল কল্পনা। কিন্তু আদৌ কি মানুষের আচরণে কোনও অগ্রগতি ঘটল? ভাবনার ইতিহাস আজ আচরণের ইতিহাসে একরৈখিক বা linear অগ্রগতি হয় না, খানিকটা মার্কসীয় ইতিহাস-সমাজতত্ত্বের ধরনে বিজ্ঞান-দার্শনিক কু-ন্‌ (Kuhn) তাঁর আদল-উল্লম্ফন তত্ত্বে (Paradigm shift) যা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন? তার কারণ, কু-ন্‌ তাঁর ভাবনায় শুধু বিজ্ঞানসাধকদের গোষ্ঠীকে ভেবে নিয়েছেন তার চিন্তাবিশ্বের নাগরিক হিসেবে, সমগ্র জনসাধারণ তার হিসেবের মধ্যে ছিল না। ধর্মের ক্ষেত্রে সমগ্র জনসাধারণ—সেখানে তাঁর সরল ছবিটা গুলিয়ে যায়।

আমরা একটু আগের কথাকে একটু সংশোধন করে বলি, ঈশ্বর বা তৎসংক্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে আগে তা নয়। প্রাচীন ভারতে চার্বাক আর তার দলবল, বার্হস্পত্যরা ভেবেছিলেন এমন কথা, বুদ্ধদেবও হয়তো একভাবে ভেবেছিলেন। আরো নানা দেশে নিশ্চয়ই অনেকে ভেবেছিলেন, আমরা তার খবর রাখি না। মার্কস-এঙ্গেলসের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মার্কসের এক প্রেরণা ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক ওগুস্ত্‌ কঁত্‌ (১৭৯৮-১৮৫৭), যিনি সমাজবিদ্যার জনক, তিনি ভেবেছিলেন দেবতাহীন ঈশ্বরহীন এক ধর্মের কথা, যেখানে মানুষের বিশ্বজনীন রূপকে (সব মানুষ মিলে যে মানবসত্তম) দেবতা করে তোলার কথা, যে দেবতার নাম তিনি দিয়েছিলেন la grande etre, 'the Great Being', যে ধারণা নিয়ে, আমাদের হিসেবে, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 'মানব বন্দনা' কবিতাটি লিখেছিলেন, 'পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম' এক নরদেবকে তিনি নমস্কার করছেন। কঁতের বিজ্ঞাননির্ভর 'পজিটিভিজম্‌' এর এক গুরুত্বপূর্ণ অনুগামীর দল গড়ে উঠেছিল বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস *চতুরঙ্গ*-এর অসামান্য জ্যাঠামশাইয়ের চরিত্রটি ছিল পজিটিভিস্ট। আমি খবর রাখি না, উইকিপিডিয়া বা গুগল সার্চ করলে হয়তো আরও নানা দেশে নানা সময়ে নিরীশ্বরবাদীদের খবর পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সব কথা কি আ-পামর মানুষের কাছে পৌঁছোল? কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ কিছু কথা উচ্চারণ করেছে যা আমাদের মতে সত্য, অর্থাৎ কু-নের ওই প্যারাডাইম শিফট কি এ ক্ষেত্রে কোনওভাবে কার্যকর হল? মোটেই তা হয়নি। তার কারণ ধারণা বা idea শুধু এক প্রজন্ম থেকে আর-এক প্রজন্মে, এক সময় থেকে আর-এক সময়ে পরিভ্রমণ করে না, তাকে সমাজের উপরিতল থেকে নিম্নতল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে হয়। এই অধঃস্রুতি filtering down-এর ক্ষেত্রেই তা আটকে যায়। অর্থাৎ কিছু বুদ্ধিজীবী তার খবর রাখেন, সমস্ত মানুষের কাছে তার তত্ত্ব পৌঁছায় না। মাঝখানে তাকে বিকৃত করার নানা চক্রান্তও চলে, যেমন বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে ঘটেছিল— একটা নিরীশ্বর ধর্ম দেবদেবীতে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল। গৌতম বুদ্ধকে তো হিন্দু অবতারও বানানো হয়েছিল। 'কারণ এখানে পৃথিবীর আর সব প্রবল শক্তি, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, প্রবলপ্রতাপশালী মিডিয়া (সিনেমা, সিরিয়াল), বাণিজ্যিক এলিট থেকে পাড়ার রিকশো স্ট্যান্ডের শীতলা দেবী পর্যন্ত সবাই যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে, সবাই অন্ধবিশ্বাসকে আরও ঘন আর মজ্জাগত করার জন্য বদ্ধপরিকর। আমরা জানি, পথেঘাটে শীতলা, গণেশ, হনুমান, বা অন্য কোনও 'বাবা'র মন্দির, বা অন্য ধর্মের উপাসনালয় তৈরি হওয়ার পিছনে একটা প্রবল বাণিজ্যিক কারণ আছে, তাই যুক্তিবাদী-মানবতাবাদীদের ডবল সতর্ক হতে হবে যে, বিশ্বাস ব্যবসায়ের অর্থনীতির দ্বারা সমর্থিত, সেখানে যুক্তির কানাকড়ি মূল্য বেশিরভাগের কাছে নেই। আর যখন ভারতের বিশাল বিশাল চিত্রতারকারা দক্ষিণের কোনও দেবতাকে কোটি টাকার সোনার অলংকার দেন তখন মিডিয়াতে তার যে মহিমা ঘোষিত হয় তার তুলনা যুক্তিবাদীদের কাজকর্মে কোথাও তৈরি হবে না।

পাঁচ

'এ এক বিশাল অসম যুদ্ধ, তাই' আমার মনে হয়, এইখানেই যুক্তিবাদী এবং অবশ্যই মানবতাবাদীদের বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। এ ব্যাপারে জনবিজ্ঞান আন্দোলন আর বিজ্ঞান-সমিতিগুলি তাঁদের যোগ্য সহচর হতে পারে। তারা সাধারণ মানুষের কাছে যায়, এবং নানা রকম বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী আর শিক্ষণের আয়োজন করে, তাদের হাত ধরে যুক্তি ও বিশ্বাসের এই গোলকধাঁধা খানিকটা পরিস্কার হতে পারে। তাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক যুক্তিবাদীদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়া দরকার। যুক্তিবাদীরা কে কতটা কড়া যুক্তিবাদী— এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক সময় বেশ তিক্ত তর্কে জড়িয়ে পড়েন, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়, এখন বৃহত্তর বাম ঐক্যের মতোই একটা যুক্তিবাদী ঐক্যেরও

প্রয়োজন আছে। 'কারও কারও মধ্যে অল্পবিস্তর স্ববিরোধও থাকতে পারে, তা নিয়ে অসহিষ্ণু মনোভাব দেখানোর কিছু নেই। এ লড়াইটা কঠিন বলেই। মানুষের মনকে বিজ্ঞানের দিকে, সেই সুনিশ্চিত সত্যের দিকে চালনা করা একটি 'বিপর্যয়কর দুরূহ' কাজ। নিজের পরিবারে তার বিরোধ হয়, ঘরের বাইরে পা দিলে বিরোধ বা সংঘাত অপ্রত্যাশিত নয়। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে না, বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিশেষজ্ঞতাও যে বিজ্ঞানবোধ গড়ে তোলে না, তা তো আমরা এই সব শাখার অনেকের হাতে পাথরের আংটি, হাতে লাল সুতো ইত্যাদি থেকেই বুঝতে পারি। স্কুলে স্কুলে বিজ্ঞান-প্রদর্শনী হয় খুব, কিন্তু তাতে বিজ্ঞানের বোধ জন্মায় না। আমি আগেও অন্যত্র লিখেছি যে, এ রকম একটি প্রদর্শনীতে একটি চটপটে ছেলেকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ভূত আছে কি না। সে উত্তর দিয়েছিল, আছে। কারা এবং কীভাবে ভূত হয়ে আছে প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল, যারা অপঘাতে মরে তারা ভূত হয়ে থাকে।

ছেলেটিকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানকর্মীদের কথা তার কাছে পৌঁছায় না, তার শিক্ষকেরাও তাকে সেই চেতনা দেওয়ার চেষ্টা করেন না। কারণ তাঁদের চিন্তাই পরিষ্কার নয়।

সেই খ্রিস্টপূর্বের গ্রিক সভ্যতা থেকে মানুষ যে পৃথিবীর কেন্দ্রে— এ কথা কতবার উচ্চারিত হয়েছে। রেনেসাঁস তাকে পুষ্ট করেছে, কিন্তু পৃথিবীর অগুনতি মানুষ এই বোধের বাইরে থেকে গেছে। তা মানুষ বলতে যাদের বোঝায় তাদের 'সকলের' কাছে পৌঁছেছে কি? শুধু লেখাপড়া-করা মধ্যেবিত্তের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আটকে নেই তো? এখানেও ওই filtering down-এর সমস্যা, জ্ঞানের উপর থাকে তলায় পৌঁছানোর সমস্যা। নিছক স্কুল-কলেজের শিক্ষায় তা ঘটে না, এমনকি তথাকথিত 'উন্নত', 'শিক্ষিত' ধনী দেশগুলির মানুষও কুসংস্কারমুক্ত এ কথা কোনওভাবেই বলা চলে না। মার্কিনদেশে যখন ছিলাম তখন ক্যাথলিক ধর্মের 'প্যারোকিয়াল' স্কুলগুলিতে গালিলেওর কোপার্নিকাসের তত্ত্ব পড়ানো হত না, এখন অবস্থা বদলেছে কি না জানি না। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের প্রথম পরিচয়ের সময় জিজ্ঞেস করত, 'তোমার কী রাশি'। আর সেখানে খ্রিস্টানদের মধ্যেও নানা উটকো সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল, যেমন Creationist বলে একটা দল বিশ্বাস করত ঈশ্বর দশহাজার বছর আগে একদিন সকালবেলায় এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন।

ফলে ঈশ্বরকে ভুলিয়ে তার জায়গায় মানুষকে বসানো, যা প্রত্যেক যুক্তিবাদীর স্বপ্ন, তা প্রতিষ্ঠা করা সারা পৃথিবীতেই এক ভয়ংকর কঠিন কাজ। এ বিষয় অন্যান্য দেশের যুক্তিবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং নিজের দেশে একটা network গড়ে তোলা দরকার, জানি না সে কাজ এর মধ্যেই শুরু হয়েছে কি না।

সাফল্যের সম্ভাবনা যাই হোক, যুক্তিবাদী আর মানবপ্রেমিকদের হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।

ছবি : সুরজিৎ সরকার

পিসিদের কথা

মালিনী ভট্টাচার্য

না, সত্যি বলছি এটা কোনো রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়, কোনো রাজনৈতিক পিসি নয়, ইতিহাসে যাঁদের নাম লেখা থাকবে না, আমার নিজের সেই অখ্যাত পিসিদের কিছু কথাই 'আরেক রকম'-এর পাঠকদের কাছে পেশ করছি। 'পিসিদের' এইজন্য বললাম যে জন্ম থেকেই দেখে আসছি আমার পিসি অনেক। আমার বাবার নিজের বোন, যাঁকে আমরা 'পিসিমা' বলতাম, তাঁকে-সহ আঙুল গুনে ষোলো জন পাচ্ছি। দু-একজন বাদ পড়লেন কি না জানি না। স্বভাবতই তাঁদের প্রায় কেউই এখন আর নেই। একমাত্র যিনি জীবিত আছেন, আমার থেকে সাত-আট বছরের বড়ো, ফ্লরিডার একটি বৃদ্ধাবাসে থাকেন, কালেভদ্রে ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়।

পিসিমাকে বাদ দিলে এঁরা সকলেই আমার বাবার মামাতো বোন। বাবার ছোটোবেলা যেহেতু ঢাকায় মামাবাড়িতে কেটেছে তাই আমাদের কাছে এঁরা সবাই বাড়ির লোক হিসাবেই গণ্য ছিলেন। শুনেছি ঢাকায় যখন সাত মামার পুরো পরিবার একসঙ্গে থাকতেন তখন কাজের লোকদের নিয়ে প্রতিদিন ৫০-৬০টি পাত পড়ত। স্বাধীনতা এবং দেশভাগের আগেকার কথা বলছি, সেসময়ে তাঁদের জমিদারি ছিল সুনামগঞ্জে, আমার ঠাকুরদাদা সেখানে জুবিলি স্কুলে পড়াতেন, কিন্তু বাবার মামাদের পরিবারের অনেকেই ছেলে-মেয়েসহ ঢাকায় থাকতেন, যদিও ছেলেদের অনেকের, যেমন বাবারও, ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত শিক্ষা জুবিলি স্কুলেই। পরিবারের মাথায় ছিলেন বাবার বড়োমামা। বাড়ির মেয়েদের জন্য তাঁর নিয়ম ছিল বিএ পরীক্ষায় বসার আগে কারও বিয়ে দেওয়া যাবে না।

এই নিয়মটির একজন সুফলভোগী ছিলেন আমার পিসিমা। তাঁর চেহারা খুব সুন্দর ছিল, নানা গুণও ছিল, ফলে স্কুলের গণ্ডি ডিঙোনোর আগে থেকেই তাঁর জন্য ভালো ভালো সম্বন্ধ আসতে শুরু করে। আত্মীয়দের মধ্যে কারও কারও ইচ্ছা থাকলেও বড়োমামার এই ফতোয়াকে লঙ্ঘন করতে কেউ সাহস পাননি। ফলে সব সম্বন্ধ ফিরিয়ে দেওয়া হয়, পিসিমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার সুযোগ পান। শুনেছি সেসময়ে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে তাঁর অভিনয়ও প্রশংসিত হয়েছিল। অবশ্য বিএ পরীক্ষার পরে বিয়ে আটকানোর আর কোনো উপায় ছিল না। কুমিল্লায় খুব সম্পন্ন একটি আইনজীবী পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়।

হয়তো বড়ো-ঘরের বউ হয়ে তাঁর জীবনও কেটে যেত। কিন্তু দেশভাগের পরে আচমকা সব ছেড়েছুড়ে কলকাতায় আসতে যখন তাঁরা বাধ্য হলেন, তখন পিসিমা দ্বিধামাত্র না করে তিনটি শিশুকন্যার সংসারকে ধরে রাখার জন্য পিসেমশাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধু স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে একটি চাকরি নিয়ে নিলেন। তার ফাঁকে কখন বিটি-ও পাশ করলেন। বিটি পরীক্ষার জন্য তৈরি তাঁর প্রাত্যহিক পাঠক্রমের খাতায় সুন্দর ছবি আঁকতে সাহায্য করতেন তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার ঠাকুরদাদা আর তার সঙ্গে পিসিমার গোটা গোটা পরিষ্কার হাতের লেখায় সেজে উঠত সেই খাতা এটা এখনও মনে আছে। পরে কল্যাণী টাউনশিপ তৈরি হবার পর সেখানকার পান্নালাল উচ্চ বিদ্যালয়ে দরখাস্ত করে তিনি চাকরি পান ও সপরিবারে সেখানকার কোয়ার্টারে থাকতে গিয়ে পিসিমা-পিসেমশাই কল্যাণীর বাসিন্দা হয়ে যান।

প্রয়োজনের তাগিদেই পিসিমার চাকরি নেওয়া তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে এই সুযোগটি তিনি যদি না পেতেন তাহলে দেশবন্ধু স্কুল বা পান্নালাল ইনস্টিটিউশনও এক দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ বাংলার শিক্ষককে পেত না। শিক্ষকতা তাঁর কাছে ছিল তাঁর বহুমুখী জীবনীশক্তির প্রকাশের এক স্বাভাবিক রাস্তা, পড়ুয়াদের মনেও তা সঞ্চারিত করাই ছিল তাঁর শিক্ষকতা। তাঁর মতো এত সুন্দর সুস্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ আমি বেশি শুনিনি, যখন আমাদের কিছু পাঠ করে শোনাতেন বা গান শেখাতেন, তখন প্রত্যেকটি শব্দকে যাতে তার যোগ্য মান দেওয়া হয়, সেদিকে ছিল তাঁর একাগ্র নজর। শুনেছি, সুচিত্রা মিত্র নাকি কাউকে একবার বলেছিলেন, যখন তিনি রবীন্দ্রসংগীত করেন তখন প্রতিটি শব্দ তাঁর চোখের সামনে এসে হাজির হয়। আমার মনে হত, আমার

পিসিমারও চোখের সামনে যা তিনি পড়ছেন বা গাইছেন তা রূপ ধরে আসত।

একবার, যখন তাঁর সত্তরের কাছাকাছি বয়স, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শিশুকবিতা' বলে আমাদের ছোটোবেলায় পড়া একটি বইতে অনেকগুলি 'ফুলের ছড়া' ছিল, বইটি আর পাওয়া যায় না, তার অনেকগুলি ছড়াও আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি, এর মধ্যে কিছু তাঁর স্মৃতিতে আছে কি না। দেখা গেল, ওই ছড়াগুলি ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথের আরো কিছু 'ফুলের ছড়া' যা হয়তো পিসিমার ছোটোবেলায় পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তার সম্পূর্ণ মনে আছে, তাঁর কাছে শুনে সেগুলি আমি লিখে নিই। তার মধ্যে যেমন একটি হল:

ফর্সা জামা ফর্সা কাপড় ভারি যে সাজিস,
ওরে টগর, তুই বুঝি আজ আতর মেখেছিস?
কথার জবাব দেয় কে কারে? অঙ্গভরা ঝাঁজ
ঘাড় বাঁকিয়ে রইল চেয়ে গর্বী গন্ধরাজ!

লীলা মজুমদারের পারিবারিক স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পেরেছি যে তাঁদের সেকালে শহর বা মফস্‌সলের মধ্যবিত্ত মেয়েদের (বিশেষত পূর্ববঙ্গে) স্কুল-কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করাটাকে জরুরি বলেই গণ্য করা হত, কিন্তু যাঁরা সেই শিক্ষার ওপর নির্ভর করে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করতেন, তাঁদের সম্পর্কে একটু নীচু ধারণাও ছিল। মেয়েরা শিক্ষিত হোক, কিন্তু সে শিক্ষাকে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করবে এই ব্যাপারটি নিয়ে একটু কেমন 'ছি-ছি' ভাব ছিল। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন এটা কিছুটা কমেছে, কিন্তু তার রেশ সম্পূর্ণ যায়নি। আমার মনে হয়, দেশভাগের ধাক্কা এ ধরনের কুসংস্কারকে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শিক্ষিত মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো খানিকটা সাফ করে দিতে সাহায্য করেছিল।

পিসিমা ছাড়াও আমার আরো অন্তত তিন-চার জন বিবাহিত পিসি নানা জায়গায় শিক্ষকতা করে গেছেন। একজন দীর্ঘদিন পড়িয়েছেন দিল্লির রাইসিনা স্কুলে, আরেক জন দিল্লিতেই লেডি শ্রীরাম কলেজে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। অবশ্যই যে-সময়ে মধ্যবিত্ত মেয়েদের বৃত্তিগ্রহণের ক্ষেত্র যথেষ্ট সীমিত তখন শিক্ষকতাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে জনপ্রিয় বৃত্তি ছিল। আমার নিজের ধারণা আমার মা যে পনেরো-ষোলো বছর নিরবচ্ছিন্ন সংসার করার পরে আমার বাবাকেও না জানিয়ে দরখাস্ত করে তাঁর প্রাথমিক আপত্তির মুখেই একটি স্কুলে চাকরি জোগাড় করলেন এবং পরম আনন্দে সেখানে একটানা পঁচিশ বছর ইংরেজি পড়িয়ে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অবসর নিলেন তার পিছনেও এই পিসিদের কারও কারও প্রভাব রয়েছে।

কিন্তু এঁদের মধ্যে কারা বৃত্তিগ্রহণ করেছেন আর কারা করেননি, তার হদিশ করতে গিয়ে দেখছি তার পিছনে হেতু বিভিন্ন রকমের। কলেজে পড়ার সুযোগ পাওয়া ছিল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। আমার পিসিমার সামনে প্রাথমিকভাবে বৃত্তি গ্রহণের দরজাটি খুলে যায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে, কিন্তু অন্যদের সবার ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। নিছক অর্থনৈতিক কারণ না থাকলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কিছু ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল। যেখানে বিয়ে হল সেই পরিবার থেকে সমর্থনের সম্ভাবনাও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ হেতু। কিন্তু আবার সবটা তাও নয়।

আমার যে পিসি ফ্লরিডায় আছেন, তিনি ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের মেধাবী ছাত্রী, এমন একটি সময়ে যখন অধিকাংশ কলেজ-পড়ুয়া মেয়েদের নির্বাচিত বিষয় ছিল সাহিত্য, দর্শন বা ইতিহাস। তাঁর পিতৃপেশা ছিল অধ্যাপনা, বিয়েও হয়েছিল উচ্চশিক্ষিত মানুষের সঙ্গেই। বহুবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও তিনি কেন শিক্ষকতায় যুক্ত হননি তা আমার কাছে বিস্ময়। তবে শুনেছি বৃদ্ধাবাসে সময় কাটাতে এখনও অঙ্কচর্চা তাঁর সঙ্গী। তাঁর দিদিও একটি বৃহৎ সম্পন্ন পরিবারে বিয়ে হবার পরে সংসারেই জড়িয়ে থেকেছেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর একটি আরো দুষ্প্রাপ্য গুণ ছিল, সেতারে তাঁর হাত ছিল পাকা, তেমনই ছিল সংগীতের সূক্ষ্ম বোধ। কিন্তু সেই সেতারে বিয়ের পর ধুলোই জমেছে, লক্ষ্মীবউ হয়েই জীবন কেটেছে তাঁর, যদিও শেষবয়সে আমাদের সঙ্গে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়ে নিখিল ব্যানার্জির ঝিঁঝোঁটি আলাপের রেকর্ড শুনতে শুনতে যখন বলেছেন, আঃ কতদিন পরে শুনলাম রে— তখন তার পিছনে মনের ভিতর জমে থাকা অভাববোধের প্রতিধ্বনি সহসা বেজে উঠেছে। নিভৃতে অঙ্ক করা গেলেও এক ব্যস্ত গৃহিণীর পক্ষে নিভৃতে সেতারচর্চা কি সম্ভব?

এ পর্যন্ত আমার যে-পিসিদের কথা বললাম তাঁরা সবাই বিবাহিত। কিন্তু যাঁদের বিয়ে হয়নি বা যাঁরা বিয়ে করেননি তাঁদের কথাও না বললেই নয়। বস্তুত এঁদের মধ্যে দুজন আমার জীবনের অনেকখানি জায়গাজুড়ে ছায়া ফেলেছেন। আমার বাবা যখন বিগত ষাটের দশকের গোড়ায় শহর ছাড়িয়ে তখনকার অজপাড়া-গাঁ গড়িয়ার দিকে বাড়ি করলেন, সেসময়ে বাবার সোনামামার এই দুই মেয়ে তাঁদের মা-বাবাকে নিয়ে ঠিক আমাদের বাড়ির পাশেই জমি কিনে একটি ছোট্টো দু-কামরার বাড়ি তোলেন। দাদা এবং বোনেদের মধ্যে সম্পর্কটা কীরকম ছিল তা বোঝানোর পক্ষে একটি কথাই যথেষ্ট যে এই দুই বাড়ির মাঝখানের জমিতে কোনো সীমানা-নির্দেশক দেওয়াল বা বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে দু-পক্ষই বরাবর ছিল একান্ত উদাসীন। সেই একচিলতে জায়গার ওপর শুধু বাবার হাতে

লাগানো লেবু গাছ, রঙ্গন গাছ, গোলাপজাম গাছ ও পাঁচমিশালি উদ্ভিদ ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়েছিল। এখনও সে গাছের কিছু আছে দুই বোন আর তাঁদের দাদা-বউদির মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু তাঁরা আর কেউই নেই।

এই দুই বোনের নাম ছিল কল্পনা ও করুণা। তাঁদের ওপরে আরো দুই বোন ছিলেন, বড়োজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই, মেজোজন আমাদের 'কালনপিসি'-কে আমি হয়তো খুব ছোটোবেলায় দেখে থাকব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই তিনি টাইফয়েডে মারা যান। সেসময়ে টাইফয়েডের ওষুধ বেরোয়নি, এটা ছিল কালান্তক অসুখ, যাঁরা বেঁচে যেতেন তাঁরা কেবল শুশ্রূষার জোরেই বাঁচতেন আর বাড়ির লোকেদেরই হয়ে উঠতে হত শুশ্রূষায় দক্ষ। বাবার সোনামামিমা ছিলেন এমনই একজন সেবাপটু মানুষ, আমার বাবাসহ অনেককেই তিনি কঠিন ব্যাধির কবল থেকে সুস্থ করে তুলেছেন, কিন্তু তিনিও মেয়েকে বাঁচাতে পারেননি। ফলে দেশভাগের পর ঢাকার সংসার ভেঙে গিয়ে পরিবারভুক্তরা যখন এপারে এসে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লেন, জমিদারির ভরসা আর রইল না, তখন ছোটো দুই মেয়েই হলেন মা-বাবার নির্ভর। কল্পনা তখন কলেজে, করুণা সম্ভবত সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছেন।

সব ক-টিই কন্যা, একটিও পুত্রসন্তান নেই, এই পরিস্থিতিকে সে আমলে দুর্ভাগ্যজনক বলেই মনে করা হত, এখনকার মেয়েরা তথ্য অনুযায়ী অনেক এগোলেও রকমসকম দেখে মনে হয় এই সংস্কারের শিকড় মানুষের মনের এতটাই গভীরে রয়েছে যে পুত্রেষ্টির পালা কিছুতেই সাঙ্গ হচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে আমার এই দুই পিসির কথা আজকের দিনেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। কল্পনা, করুণার বাবা ছিলেন খুবই শান্ত চুপচাপ মানুষ, তাঁর মনে এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা থাকলেও কখনোই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তাদের মায়ের মনে আফশোস নিশ্চয়ই ছিল, আমার বাবাকে 'ছাওয়াল' বলে হয়তো তিনি তা মেটাতেন, বাবা সত্যিই তাঁর কাছে ছেলের মতোই ছিলেন। কিন্তু পুত্রের দায়িত্ব যদি হয় বার্ধক্যে পিতা-মাতার পালনপোষণ এবং কন্যার দায়িত্ব যদি হয় সেবা, তাহলে সেই প্রথাগত নিরিখেও তাঁদের দুই মেয়ে একাধারে উভয় দায়িত্ব পালনে কোনো খামতি রাখেননি, বরং স্নেহচ্ছায়ায় মা-বাবাকে আগলে রেখেছিলেন।

কল্পনা সম্বন্ধে আমার স্মৃতি যে-পর্যন্ত যায়, আমি দেখতে পাই অনাড়ম্বর কিন্তু ছিমছাম এটি ছোট্টখাট্ট মানুষকে, তখন তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের হস্টেলে থেকে বিটি পড়ছেন, শাড়িটি কাঁধের কাছে পাট করে পিন দিয়ে আটকানো, সামান্য উঁচু-হিলের স্ট্র্যাপ-দেওয়া জুতো, মণিবন্ধে ছোট্ট একটি মেয়েদের হাতঘড়ি। সেইসঙ্গে একটু মৃদু ওডিকোলনের সুবাস। আমার শিশুচোখে এই ছবিটি অক্ষয় হয়ে আছে, যে-মেয়েরা লেখাপড়া করে এবং ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজ করে তাদের একটি আদর্শ হিসাবে। আমিও কোনোদিন কলেজে গিয়ে পড়াশুনো করব, শাড়িতে পিন লাগিয়ে ট্রামে-বাসে একা একা যাতায়াত করব, এরকম একটি আশা সেই ছবিটি আমার মনে গেঁথে দিয়েছিল। শুনেছি তিনি ছোটোবেলায় বেশ দুষ্টু ছিলেন, তখন আর দুষ্টুমির কোনো চিহ্ন না থাকলেও শক্তপোক্ত এবং সক্ষম একজন মহিলা যিনি সর্বত্র স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেন, তাঁর এই আদলটাই মনে আছে। সেই সময়েই তিনি ঠিক করে ফেলেছেন যে তিনি চাকরি করবেন, বিয়ে করার বদলে মা-বাবার দেখাশুনো করবেন। ছোটোবোনের বিয়ে দেবেন।

করুণা ছিলেন অনেক নরম প্রকৃতির, ছোটো বলে সকলের আদরেরও বটে। এই পরিকল্পনায় প্রথমে তিনি তেমন কোনো আপত্তি করেননি। তখন তাঁর বিয়ে হয়ে গেলে নিশ্চয়ই তিনি যেখানেই যেতেন সেই পরিবারের সম্পদ হয়ে উঠতেন। সেসময়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যত বিয়ে হত তার চাইতে লোকে বেশি নির্ভর করত পারিবারিক চেনাশুনোর সূত্রের ওপর। এইভাবে কিছু 'সম্বন্ধ' আসে এবং 'মেয়ে দেখানো'র প্রচলিত রীতি অনুযায়ী করুণাকেও যথারীতি সাজিয়েগুজিয়ে দেখানো হয়, পাত্রপক্ষ বাড়ি বয়ে এসে লুচি-মিষ্টি খেয়ে যান, কিন্তু তার বেশি আর কোনো সম্বন্ধই এগোয় না। আমার ধারণা, এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, তখন পিসিদের কোনো নিজস্ব ঘরবাড়ি ছিল না, দেওয়া-থোয়ার তেমন সামর্থ্য ছিল না, তদুপরি বাবা-মার ভার নেবার মতো নিজের দাদা বা ভাই না-থাকাটাও বিয়ের বাজারে খামতি বলে গণ্য হয়েছিল নিশ্চয়ই। চাকুরে পাত্রীতে আপত্তি না থাকলেও পাত্রপক্ষের মনে এমন সন্দেহ থেকে থাকতেই পারে যে তার মা-বাবার দায়িত্বও শেষপর্যন্ত ঘাড়ে এসে পড়বে।

দু-তিন বার এমন ঘটনা ঘটার পর নিরীহ প্রকৃতির করুণা বেঁকে বসেন অপমানজনক শর্তে বিয়ের চেষ্টার বিরুদ্ধে। এর আগেই তিনি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বাঘাযতীন বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ পেয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্‌বাস্তুরা যেসব জায়গায় ঘর বেঁধেছিলেন, সেখানে তাঁদের নিজেদের উদ্যোগে এমন আরো কিছু বিদ্যালয় গড়ে ওঠার কথা আমরা শুনি। তখনও সরকারি অনুদান ছাড়াই চললেও এইসব বিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই পাশ-করা মধ্যবিত্ত মেয়েদের চাকরির কিছু সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কল্পনা আরো আগে থেকেই সরকারি স্কুলে চাকরি করছিলেন। দীর্ঘদিন পড়িয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে, পরবর্তী সময়ে কলকাতার হেস্টিংস হাউসের মাল্টিপারপাস স্কুলে চলে আসেন। গড়িয়াতে বাড়ি

করার পর থেকে তাঁদের দুজনের আয়ে বাবা-মাকে নিয়ে তাঁদের চার জনের সংসার স্থিতি পায়।

এই গল্প নিশ্চয়ই সে-সময়ের আরো বেশ কিছু লেখাপড়া-জানা মেয়ের গল্প। অবধারিতভাবেই আমাদের মনে পড়বে 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার পরিবারের জন্য নিজেকে ক্ষয় করে দেবার রক্ত-ঝরা কাহিনি। কিন্তু এই কাহিনির যে আরো নানাবিধ বাঁক এবং মোড় থাকতে পারে আমার উদ্দেশ্য তাকেই তুলে ধরা। এই পিসিদের দীর্ঘ বহু বছর ধরে কাছ থেকে দেখলেও তাঁদের মনের সব কথাই আমি জেনে ফেলেছি তা নিশ্চয়ই নয়। তবু বলব মুকুলে শুকিয়ে যাওয়া হতাশ্বাস যে 'বৃদ্ধা কুমারী'-দের নিয়ে অনেক গল্প রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার এই দুই পিসির জীবনের আমি বিশেষ মিল দেখিনি। বরং আমার মনে হয়েছে, নিজের জীবনকে নিজের হাতে তুলে নেবার পর একধরনের নম্র আত্মসম্ভ্রম তাঁদের মধ্যে এসেছিল, যাকে ভিত্তি করে তাঁরা নানাভাবে নিজেদের চারিপাশে অন্যদের জন্য ফুলে-ফলে ভরা এক মরুদ্যান তৈরি করেন, আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সবাই যেখানে কোনো-না-কোনোরকম আশ্রয় পেয়েছে।

যেখানেই তাঁরা থেকেছেন, বোনপো বোনঝি ভাইপো ভাইঝি এবং পরের প্রজন্মে নাতি-নাতনিরা ছাড়াও আশপাশের সমস্ত শিশুর মুক্তাঞ্চল ছিল তাঁদের বাড়ি। তাদের সমস্ত অসংগত আবদার রক্ষা করা এবং তাদের ঘরবাড়ি তছনছ করা সমস্ত অত্যাচারে প্রশ্রয় দেওয়াতেই ছিল তাঁদের আনন্দ। এমনভাবে শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে মিশে যেতেন যে তাঁদের নানা অফুরান আগ্রহের সঙ্গী হয়ে যেত তারা। আমার নিজের বছর সাতেক বয়সের কথা মনে পড়ে, পিসিদের হাত ধরে পদ্মপুকুর থেকে অলিগলি পেরিয়ে পায়ে হেঁটে ভবানীপুরে ইন্দিরা সিনেমায় চলেছি 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' ছবিটি দেখতে; বিটি কলেজের বার্ষিক উৎসবে নাটক দেখার সঙ্গী আমি; কিংবা রমেশ মিত্র রোডে পিসিদের মামাবাড়ির মস্ত হলঘরের একপাশে পর্দা টাঙিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে আমাদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' অভিনয় করানো চলছে। আমাদের কেই-বা তখন এত সময় দিত, কেই-বা এমন সব মজার জায়গায় নিয়ে যেত? পরে বাড়ির আস্ত দোতলাটিই তাঁরা তৈরি করেছিলেন নাতি-নাতনিরা এসে থাকবে বলে। তার নামই দিয়েছিলেন 'খেলাঘর'।

ঢাকা ছেড়ে আসার পর বৃহত্তর পরিবারের মানুষজনেরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল আরো অনেক বছর পরে তারা সকলে থিতু হবার পর গড়িয়ার পাশাপাশি চার-পাঁচটি বাড়ি আবার তাদের অনেককে টেনে এনেছিল পুরোনো আত্মীয়তার বৃত্তে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মা, আর প্রধান সহযোগী ছিলেন তাঁর এই দুই ননদ। ততদিনে সবার জীবন আলাদা আলাদা খাতে বইছে, মধ্যে অনেক দূরত্ব, কিন্তু বিজয়া ভাইফোঁটা বা কারও অন্য জায়গা থেকে এসে কয়েক দিন থাকা এমন যেকোনো অজুহাতেই একটা মস্ত পারিবারিক জমায়েতের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কয়েক বছর আগেও কোনো নাতি হয়তো দূরদেশ থেকে এসে পিসিদের বলত, এবার সেই বড়ো খাওয়াটা হবে না? অমনি তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন আয়োজন করতে। আগে নিজেরাই রান্নাবান্না করে খাওয়াতেন। সেটা যখন শরীরে দিত না, তখন অন্য বন্দোবস্ত ঠিকই করে ফেলতেন। যতই এমনিতে দূরত্ব থাকুক, তাঁদের স্নেহের ডাকে সবাই একত্র হত।

কলেজপড়ুয়া কারও অন্য থাকার জায়গা না থাকলে এই বাড়িই তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান ছিল। তাঁদের নিজেদের চাহিদা ছিল খুবই কম, কিন্তু অন্যের যেকোনো বিপদে-আপদে এই দুজন নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও ছিলেন সবার ভরসাস্থল। তাঁদের এক বোনঝির কাছে গল্প শুনেছি, তার বিটি পড়ার খুব শখ, কিন্তু বাবার কাছ থেকে কিছুতেই ভর্তি হবার অনুমতি পাচ্ছে না। শেষে রেগেমেগে একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে হাতের বালা বিক্রি করে ভর্তি হবার টাকা জোগাড় করবে বলে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখা ছোটোমাসির সঙ্গে; সব শুনে তিনি বললেন, চল, আমি যাই তোর সঙ্গে। বালাটা এখনই বিক্রি করিস না, এখনকার মতো টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। মাসির মৃত্যুর পরে সে বলছিল, সেই টাকা আজও শোধ করা হল না!

শুধু নিকট আত্মীয়েরাই এই স্নেহের ভাগ পেত তা নয়। বাড়ির পিছনে চালাঘরে এক খেটে-খাওয়া পরিবার ছিল, তাদের বাচ্চারাও পিসিদের বারান্দায় বসে খেলা করত। 'ও গোপাল, সকালে কী খেলি?' প্রশ্নের উত্তর প্রায়ই আসত 'কটি (ঝাল কটকটি) আর চা!' গোপালের জন্যও তখন পিসিদের ভাণ্ডার থেকে বেরোতে বিস্কুট বা পাঁউরুটি বা একটা কলা বা যাহোক কিছু। আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেউ ক্ষুধিত থাকবে বা বাড়িতে অনাদৃত থাকবে বা পড়ার টাকা জোগাড় করতে পারবে না এটা তাঁদের সহ্য হত না। এভাবে কত রকমের কত লোক যে তাঁদের আত্মীয়তার বিরাট ছায়ায় স্বস্তি পেয়েছে তার সবটা আমরাও জানি না।

নিজেরা একসময়ে অনিশ্চিত অবস্থায় ছিলেন সেটা তাঁরা ভোলেননি; কিন্তু এটা শুধু সামাজিক ঋণ শোধ করার ব্যাপার নয়। নিজেদের চারদিকে যে সহজ খুশির পরিমণ্ডল তাঁরা তৈরি করতে পেরেছিলেন তার একটা প্রধান উপাদানই ছিল দিতে পারা। দুই বোনের মধ্যে একটা গভীর সমঝোতা ছিল, উচ্চারণ করার আগেই একজনের পরিকল্পনা আরেক জন ধরে ফেলতেন, একজনের যেটা পছন্দ হবে অন্যজন আগে থেকেই তার হদিশ রাখতেন। কখনো কারও নিন্দা আমরা তাঁদের মুখে

শুনিনি, নিজেরা যে নৈতিকতা মানতেন তা কখনো অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেননি, কাউকে কিছু দিলে সেটা এমনভাবেই দিতেন যাতে সে নিজেকে অনুগৃহীত বলে মনে না করে। তাঁদের মুখে ধর্মকথা খুব-একটা শুনিনি, কুলুঙ্গির ঠাকুরকে ফুল-জল দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু ধর্মীয় আচার পালন করতে দেখিনি। যা কিছু পালন করতেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে একত্রে ডেকে এনে আনন্দ করা।

পরশুরামের 'শিবামুখী চিমটে' গল্পে দশ বছরের ঝিন্টুর অভিজ্ঞতায় পিসি দুরকমের হয়: যারা 'সেজেগুজে আপিস যায়' আর যারা মালা জপে, বড়ি দেয়, নারকেলনাড়ু আমসত্ত্ব কুলের আচার বানায়। আমার পিসিদের মালা জপতে বা বড়ি দিতে দেখিনি, সাজগোজ কিছু না থাকলেও খুব ফিটফাট হয়েই তাঁরা বাইরে বেরোতেন, কিন্তু নিজের ধরনে তাঁরা খুব সংসারীও ছিলেন। যেকোনো সুগৃহিণীর মতোই সীমিত আয় এবং সীমিত উপায়ের মধ্যেও সামঞ্জস্য রেখে চলার গুণে বহুবিস্তৃত সংসারবৃত্তে নানা জনের নানা প্রয়োজন এই কারণেই তাঁরা মেটাতে পারতেন, সবার মুখে হাসি ফোটাতে পারতেন। এইসব কাজের পিছনেও থাকত সুচিন্তিত পরিকল্পনা। আমাকে তাঁরা একবার একটি রাজস্থানি লেপ দিয়েছিলেন এই বলে যে, তোকে তো অনেকসময় দিল্লিতে থাকতে হয়, ঘরের মধ্যে শীতকালে এটা গায়ে জড়ালে আরাম হবে। সে লেপ এখনও আমার কাছে আছে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁদের এই গৃহিণীপনার নৈপুণ্য যেভাবে কোনো বিশেষ একটি পরিবারে সীমিত না থেকে অনেক বড়ো পরিসরে ছড়িয়ে গিয়ে অনেককে আপন করে নিয়েছিল সেটার দিকে না তাকিয়ে তাঁরা অন্য মেয়েদের মতো কেন সংসার করতে পারলেন না, এটাকে বড়ো করে তুললে তাঁদের হয়তো ঠিকমতো বোঝা যাবে না।

অনেকে হয়তো বলবেন, বৃহৎ পরিবারভিত্তিক যে পুরোনো দুনিয়াতে আমার পিসিরা জন্মেছিলেন, তার আবহের অবশেষ এবং বৃহৎ পরিবারের পরম্পরাগত গুণগুলি তাঁদের রক্তে ছিল বলেই এই জীবন তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। আজকের দুনিয়াতে মেয়েদের যে স্বয়ম্ভরতার সাধনা করতে হয় তা একেবারেই অন্যরকম। স্বয়ম্ভরতার অন্য পিঠ যে একাকিত্ব তার সঙ্গে তাই আজকের মেয়েদের পরিচয় অনেক বেশি নিবিড়। পিসিদের প্রজন্মের আসল জোর কিন্তু এইখানে নয় যে তাঁদের চারিদিকে অবধারিতভাবেই পারিবারিক বন্ধনের সূত্রগুলি রয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁদের শূন্যতার মোকাবিলা করতে হয়নি। পরিস্থিতি তাঁদের বাধ্য করেছিল সমাজে কন্যার জন্য নির্ধারিত ভূমিকার বাইরে পা দেবার, সেই বাধ্যবাধকতাকে মেনে নিয়েই তাকে তাঁরা সুযোগে পরিণত করেছিলেন, বেছে নিয়েছিলেন আরো বিস্তৃত পরিসরে বাঁচা। যে পরিবারের মধ্যে তাঁদের চলাফেরা তা তাঁদের নির্বাচিত পরিবার, সেখানে রক্তের বন্ধন না থাকলেও। সেখানে গৃহিণীপনার আদলও তাঁদেরই নির্বাচিত আদল, পুরোনোর পুনরাবৃত্তি নয়। মুক্তির দিকে এই নিঃশব্দ কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপকে হয়তো আজও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

'পদক্ষেপ' কথাটা আমি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহার করছি। আমাদের দেশে প্রথম যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরা যদি ঘরে থেকেই তা করতেন তবে তা হয়তো রক্ষণশীলেরা মেনে নিতেন, আসল গোল বেধেছিল শিক্ষার উদ্দেশ্যে মেয়েরা চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ানোর পরে। আমার এই পিসিদের আমার সবসময়েই মনে পড়ে ঘর থেকে বেরোনোর জন্য পা বাড়িয়েই আছেন এই ভঙ্গিতে। তাঁদের সাংসারিক দক্ষতা তাঁদের ঘরে বেঁধে রাখেনি। পিসিমা চলেছেন ঝরঝরে বাসে ছাত্রীদের নিয়ে হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটা দেখাতে। ভোরের ট্রেনে চড়ে একাই আসছেন কলকাতা, মেয়েরা আপত্তি করলে বলছেন, যদি পড়ে যাই মানুষরাই ধরে তুলবে। কল্পনা কৃষ্ণনগরের ট্রেন থেকে নেমে অনেক রাতে গড়িয়ার অন্ধকার গ্রাম্য রাস্তায় বাড়ি ফিরছেন একা। করুণা ও কল্পনা নাতি-নাতনিদের হাত ধরে পুজো দেখতে বেরিয়েছেন। যদিও শেষজীবনে দুজনকেই শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল, এইসব চলিষ্ণুতার ছবিই আমাকে তাঁদের এবং তাঁদের উদার সমাজচেতনাকে বুঝতে সাহায্য করে।

কল্পনা মারা গেছেন দু-বছর আগে, আমার মায়ের মৃত্যুর দু-মাস পরে। করুণা ২০১৯-এর জুলাই মাসে। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে জিজ্ঞাসা করতাম, তোমার মা-র নাম কী? 'ঊষাবালা রায়'। দেশ কোথায়? 'ঢাকা'। তুমি কোন স্কুলে পড়াতে? 'বাঘাযতীন বালিকা বিদ্যালয়'। কী পড়াতে? 'ইতিহাস'। প্রতিটি উত্তর স্পষ্ট এবং স্বচ্ছন্দ, যদিও সেসময়ে দিদির মৃত্যুর কথা, এমনকী সকালে কী খেয়েছেন সেকথাও তাঁর চেতনায় আর ছিল না।

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

ছিলেন, আছেন, থাকবেন ...

অরুণ সোম

মস্কো, ২১ জানুয়ারি, ১৯৯২।। আজকের এই দিনটি রুশ বিপ্লবের মহানায়ক, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ৬৭তম প্রয়াণ দিবস। ১৯২৪ সালের এই দিনটিতে তিনি প্রয়াত হন।

গত বছর ডিসেম্বরের শেষ দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর 'গণতন্ত্রী'দের দিক থেকে দাবি উঠেছিল রেড স্কোয়ারের লেনিন স্মৃতিসৌধ থেকে 'বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের নেতা' লেনিনের মরদেহ তুলে অন্য কোথাও সমাধিস্থ করা হোক। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে পড়ে পিছিয়ে যেতে হয় নতুন রাশিয়ার সরকারকে।

কিন্তু তুলে নিলে কোথায় সমাধি দেওয়া হবে তাঁর শবদেহের। কথা উঠেছিল সাংক্ত্ পেতের্বুর্গের ভলকোম্স্কি সমাধিক্ষেত্রে— তাঁর মা-র সমাধির পাশে। কিন্তু সেখানে একজন নাস্তিকের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার অনুষ্ঠান কী হতে পারে সেই নিয়ে রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চ ভাবিত। অনেকের আবার পেতের্বুর্গের মতো একটা বড়ো শহরে লেনিনের প্রত্যাবর্তনে আপত্তি আছে। লেনিনের সমাধি সেখানে কমিউনিস্টদের কাছে নতুন এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। তাই অনেকের পরিকল্পনা ভোল্গা তীরের সিম্বির্স্ক শহরে তাঁর জন্মস্থানে, পিতার সমাধির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা। শহরটি ছোটো, অনেক দূরের। ওখানে পাঠাতে পারলে আর ঝামেলা থাকে না। অবশ্য দুটি শহরই লেনিনের স্মৃতি বিজড়িত। বিপ্লবের ক্রীড়াভূমি সাংক্ত্ পেতের্বুর্গ— তৎকালীন পেত্রোগ্রাদের নামই পরবর্তীকালে হয়েছিল লেনিনগ্রাদ, লেনিনের পদবি উলিয়ান্ভ থেকে সিম্বির্স্ক-এর নাম হয়েছিল উলিয়ানভ্স্ক। এখন দুটি শহরই ফিরে পেয়েছে তাদের আদি-নাম। একসময় দুটি শহরের কর্তৃপক্ষের কাছেই লেনিন ছিলেন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি— আজও।

কবি মায়াকোভ্স্কি বলেছিলেন, 'লেনিন ছিলেন, লেনিন আছেন, লেনিন থাকবেন।' শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে, সোভিয়েত আমলে লেনিন তাঁর স্মৃতিসৌধের ঠিকানায় অসংখ্য চিঠিপত্র পেতেন। তিনি মৃত কি মৃত নন বড়ো কথা নয়— বহু সোভিয়েত নাগরিকের ধারণা ছিল তাদের দুঃখ-দুর্দশার একটা সদুত্তর লেনিনই দিতে পারেন। অধিকাংশ চিঠিই আসত ট্রান্সককেশাস ও মধ্য এশিয়া থেকে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে চিঠি আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

২১ জানুয়ারি, ২০১২।। নয় নয় করে কিন্তু দু-দশক পার হয়ে গেল— তিনি আছেন, এখনও আছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের দুই দশক পরে, আজও আছেন— তবে কবি যে বলেছিলেন তিনি 'জীবিত সবার চেয়ে এখনও সজীব', আজকের দুনিয়ায়, এমন কি রাশিয়াতেও বোধহয় সেটা আর সত্য নয়।

২২ এপ্রিল, ২০১২।। এটা এমন এক রোগীর মরণোত্তর জীবনেতিহাস, আজ থেকে ১৪০ বছর আগে এই দিনটিতে যাঁর জন্ম হয়েছিল।

... ...

হাসপাতালের সাদা পোশাক পরা একদল মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্য। সার্জিক্যাল দস্তানায় ঢাকা তাদের হাতের আঙুলগুলিও উত্তেজনায় কাঁপছে। রোগীকে একটা চাকাওয়ালা শয্যায় শুইয়ে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে আসা হল তাদের কাছে। এটা তাঁর পাঁচ বছর অন্তর একবার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিন। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। পরীক্ষকদের কাছে প্রবল উৎকণ্ঠার মুহূর্ত, কেননা এই রোগী একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। শেষপর্যন্ত চিকিৎসকমণ্ডলীর ঘোষণা: রোগীর অবস্থা ভালো।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁরা জানালেন রোগীকে আবার তাঁর কাচের আধারের মধ্যে রেখে ডালা সিল করে দেওয়া যেতে পারে। কাচের আধার? সিল করে রাখা? এ কেমন রোগী? না, অবশ্যই সাধারণ রোগী নন, আবার জীবিত রোগীও নন— ইনি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, যিনি ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি

থেকে মৃত। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা এখন মস্কোয় রেড স্কোয়ারে অবস্থিত স্মৃতিসৌধের একটি প্রকোষ্ঠ।

মস্কোর রেড স্কোয়ারে আর্জেন্টিনার কালো লাব্রাদোর পাথর, বল্‌টিক সাগর সন্নিহিত কারেলিয়া অঞ্চলের লাল স্ফটিক পাথর, উক্রাইনার লাব্রাদোর পাথর, গ্র্যানিট, রক্তিমাভ মর্মর পাথর এবং অন্যান্য পাথরে আধুনিক স্থাপত্যের অনবদ্য নির্দশন এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত। স্মৃতিসৌধের মাথায় ৬০ টন ওজনের যে-পাথরের ব্লকের ওপর লেনিন নামটি খোদাই করা হয়েছে সেটা আনা হয়েছিল সুদূর ভলিন্স্ক থেকে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের জনক লেনিন যতদিন থেকে দর্শনার্থীদের জন্য এখানে শায়িত আছেন সেই সময়ের মধ্যে তাঁর দেশ-বিদেশের কোটি কোটি দর্শনার্থী ভক্ত তাঁকে দর্শন করেছেন। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর কুড়ি থেকে তিরিশ লক্ষ দর্শনার্থী তাঁকে দেখতে আসতেন। প্রতিদিন সাত থেকে ন-হাজার মানুষের সমাগম হত। তাও খোলা থাকত দিনে মাত্র তিন ঘন্টা। রবিবার দর্শনার্থীর সংখ্যা পনেরো হাজার ছাড়িয়ে যেত। সবই অতীতের কথা। আজকার তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায় দর্শকের সংখ্যা দিনে হাজার দশেকের বেশি হয় না— অধিকাংশ আবার ভক্তও নয়, যত-না ভক্তিবশত আছে তার চেয়ে বেশি আসে তাদের অসুস্থ কৌতূহল চরিতার্থ করতে।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এক বিশেষ কমিশন তাঁর দেহ পরীক্ষা করে দেখে, প্রতি তিন বছর অন্তর তাঁর দেহের মাইক্রোস্ট্রাকচার পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশেষ স্টেরিওস্কোপিক পদ্ধতিতে তার ছবি তোলা হয়। আরও ত্রিশ জন লোক দৈনন্দিন তাঁর দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত। এছাড়া আছে বিশেষ নির্যাসে দেহ নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত একদল বিশেষজ্ঞ যাঁরা প্রতি দেড় বছর অন্তর একটি বিশেষ সংরক্ষণকর দ্রব্যে ষাট দিন ধরে দেহ নিষিক্ত করে তারপর তুলে আবার ধুয়ে-মুছে যথাযথ জামাকাপড় পরিয়ে পূর্বাবস্থায় কাচের বাক্সে তুলে রাখেন। প্রতি সোমবার ও শুক্রবার বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থার জন্য স্মৃতিসৌধের প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ থাকে। সর্বোপরি পুরো ব্যবস্থাটির তত্ত্বাবধানে আছে মস্কোর জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট।

প্রসঙ্গত, পোশাক বলতে লেনিনের পরনে আছে কালো রঙের স্যুট, সাদা-সার্ট, নীলের উপর সাদা বর্ডার দেওয়া টাই। পায়ে মোজা ও জুতো। এসব তৈরির জন্যও বিশেষ কারিগর আছেন। যাঁদের পরিচয় গোপনীয়। দেহের নিম্নাংশ অবশ্য কালো চাদরে ঢাকা আছে। তাঁর সেই সুপরিচিত দাড়ি। দাড়ির চারিধারে কয়েক দিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা অংশ। মাথার দু-পাশে সামান্য সাদাটে চুলের গোছা— তাঁর সহধর্মিণী মৃত্যুর কয়েক দিন আগে নিজের হাতে যেভাবে ছেঁটে দিয়েছিলেন অবিকল সেইভাবেই আছে। তবে শোনা যায় মৃত্যুর পরে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ত্বকের টিস্যুগুলি সজীব থাকায় দাড়ি-গোঁফ ও চুল গজাত। ফলে মাঝে মাঝে একটু-আধটু ছেঁটে দিতে হত। শায়িত লেনিনের ডান হাতের আঙুলগুলো সামান্য মুঠো করা, বাঁ-হাতটা শিথিল হয়ে পড়ে আছে চাদরের ওপর। এত-রকমের চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাবার পরও দাবি করা হচ্ছে, দেহ মৃত্যুর সময় যে অবস্থায় শায়িত ছিল ঠিক সেইভাবেই রাখা আছে। তবে এমন কথাও শোনা গেছে যে, পোশাকের রূপ অন্তত একবার বদল হয়েছে। ষাটের দশকের আগে নাকি লেনিনকে পুরোপুরি নাগরিক পোশাকের বদলে আধাসামরিক পোশাকে শায়িত থাকতে দেখা গেছে।

১৯২৪ সালে লেনিনের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর দেহ সৎকারের ব্যবস্থা নিয়ে পার্টির মধ্যে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। কেউ কেউ দাহ করার পক্ষে ছিলেন, কেউ-বা পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করার। দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত জরুরি ছিল। যেহেতু সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে যে ধরণের প্রচলিত রাসায়নিক দ্রবের সাহায্যে দেহ সংরক্ষণ করা হয় তাতে দিন ছয়েকের বেশি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তার চেয়েও বেশি নির্ভরযোগ্য উপায় অবশ্য ছিল শূন্য থেকে ২ ডিগ্রি তাপমাত্রাযুক্ত একটি সিল করা বায়ুশূন্য কাচের বাক্সে দেহটি রাখা। সময়টা জানুয়ারি, বাইরের তাপমাত্রাও যথেষ্ট অনুকূল। এই বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেকটা সময় লেগে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত দেহটি বরফের চাঙড়ের ওপর শুইয়ে একটি ফ্রিজারে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে তাঁর সহধর্মিণী নাদেজদা ক্রুপ্স্কায়া প্রাভ্‌দায় একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন: 'ইলিচের মৃত্যুর জন্য আপনাদের যে শোক তা যেন ব্যক্তিমানুষ তাঁর প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে পরিণত না হয়। তাঁর কোনো স্মৃতিমন্দির বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে যাবেন না। তাঁর স্মৃতিতে আড়ম্বরপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন না।'

ক্রুপ্স্কায়ার এই ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে সোভিয়েত সরকারের ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল। জানুয়ারিতে তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত নীচে নেমে যাওয়ার দরুণ সমাধি খননের কাজ দুরূহ হয়ে উঠেছিল; বরফ ভেঙে কোদাল চালানো যাচ্ছিল না— তাই সমাধি দেওয়ার কাজ দু-দিন পিছিয়ে দিতে হল।

ইতিমধ্যে বলশয় থিয়েটার সংলগ্ন কলাম হলে যেখানে লেনিনের মৃতদেহ সংরক্ষিত ছিল, সেখানে দর্শনার্থীদের ভিড় সমানেই বাড়তে শুরু করে দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তখনও তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ দেখা

দেখার জন্য লোকজনের আসার কামাই নেই। প্রবল শৈত্যের মধ্যে তাঁকে দেখার জন্য জনসাধারণকে চার-পাঁচ ঘন্টা রাস্তায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল। স্তালিন এবং নতুন সরকারের প্রথম গোপন পুলিশ অধিকর্তা, তথা কেন্দ্রীয় জরুরি কমিশনের সভাপতি, ফেলিক্স দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি সমেত বলশেভিক নেতারা সকলেই লেনিনের প্রতি জনসাধারণের এই ভালোবাসার উচ্ছ্বাস দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন— তাঁরা লেনিনের মৃতদেহ শবরক্ষণী নির্যাসের প্রলেপ দিয়ে সংরক্ষণ করে আরও কিছুদিন দর্শনার্থীদের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানেই মৃতদেহ পূজার ঐতিহ্যের জন্ম।

লেনিনের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে ২১-২২ তারিখের রাত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উদ্যোগে লেনিনের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের একটি কমিশন (পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী স্মৃতিরক্ষা কমিশনে পরিণত হয়) গঠিত হয়। কমিশনের সভায় সমাধিস্থ করার দিন ২১ তারিখ ধার্য হয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত অধিকৃত অবস্থায় মৃতদেহ রাখার তোড়জোড় সেই রাত থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু প্রায় একইসময়ে এর পাশাপাশি আরও একটি পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে। যার জন্ম নাকি মস্কো এবং অন্য শহরের শ্রমিক মহলে। যেমন রস্তোভ্‌ থেকে একদল শ্রমিক এমন চিঠিও লিখেছিলেন যে, 'মাটির গর্ভে দেহ সমাধিস্থ করা— এর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই। কিন্তু সুদীর্ঘকালব্যাপী সংরক্ষণ এমনই একটা কাজ যা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষেই করা সম্ভব।' শেষপর্যন্ত তা-ই করা হয়েছিল।

স্থায়ীভাবে মৃতদেহ সংরক্ষণের প্রশ্ন ওঠার আগে মাটির নীচে গর্ভস্থিত করে সেখানে দেহ সমাধিস্থ করা এবং স্মৃতিসৌধ বা স্মৃতিমূর্তি নির্মাণের প্রশ্নও উঠেছিল। নীতির প্রশ্নে পার্টির অনেকেই সেদিন আপত্তি তুলেছিলেন। ১৯২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি কমিশনের যে-সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ভরশিল্‌ভ বলেছিলেন: 'আমার মনে হয় ব্যক্তিমাহাত্ম্য প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত হবে না। আমাদের শত্রুরা চতুর্দিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে পারে। কৃষকরা ব্যাপারটাকে তাদের নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করতে পারে, বলতে পারে, দেখেছ, আমাদের দেব-দেবী ধ্বংস করেছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মীদের সেই পরাক্রম ভাঙার কাজে লাগিয়েছিল, এখন সে-জায়গায় গড়ে তুলছে নিজেদের পরাক্রম। এতে রাজনৈতিক ক্ষতি বই লাভ হবে না।'

সদস্যদের কেউ কেউ, বিশেষ করে দজের্‌জিন্‌স্কি এই যুক্তিকে খারিজ করে দিয়ে বলেন: 'পরাক্রম অলৌকিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে অলৌকিকতা বলে কিছু নেই; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পরাক্রমের কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। আর ব্যক্তিপূজার কথা যদি কেউ বলে তো বলব এটা ব্যক্তিপূজা নয়, কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভ্লাদিমির ইলিচ ভক্তি বললেও বলা যেতে পারে। এখানে কেউ কেউ বলেছেন লেনিন থাকলে এর বিরোধিতা করতেন। ঠিক কথা। লেনিনের মতো মানুষদের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ী। কিন্তু দ্বিতীয় কোনো লেনিন তো আমাদের নেই। ব্যক্তিগতভাবে উনি এখানে কিছু বলতে পারেন না, যেহেতু তিনি নিজে তাঁর নিজের বিচারক হতে পারেন না, কিন্তু তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেইও যাঁর ক্ষেত্রে এটা প্রযুক্ত হতে পারত। বিজ্ঞানের যদি তাঁর দেহ সংরক্ষণের ক্ষমতা থাকে তাহলে সেটা না করারই-বা কী কারণ থাকতে পারে? আগেকার দিনে রাজারাজড়ার দেহ নানারকম প্রলেপ দিয়ে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করে রাখা হত স্রেফ তারা রাজারাজড়া বলে। কিন্তু আমরা এটা করব এই কারণে যে, এই মানুষটি ছিলেন এক মহান ব্যক্তি, যার তুল্য আর কেউ নেই। আমার কাছে যেটা মূল প্রশ্ন তা এই যে বাস্তবিকই দেহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায় কি না— আরও কিছুকাল পরে এই প্রশ্নটাই "সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" পরিণত হয়েছিল। কঠিনতর প্রশ্ন।

স্থায়ীভাবে না হলেও দীর্ঘকাল সংরক্ষণের একটা উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যেতে লেনিনের মরদেহ বলশয় থিয়েটার থেকে সরিয়ে এনে রেড স্কোয়ারে তাড়াহুড়ো করে তৈরি একটি কাষ্ঠনির্মিত স্মৃতিসৌধ তুলে আনা হল ১৯২৪ সালের ২ জানুয়ারি। তাঁকে যে কফিনে রাখা হয়েছিল সেটার দু-পাশে দুটো জানলা আর ওপরে কাচের ডালা ছিল— সেখান থেকেই দর্শনার্থীরা তাঁকে দেখতে পত।

তখনও শীতকাল। কিন্তু বসন্তকাল আসার আগেই সরকার সিদ্ধান্ত নিল অতিশীঘ্র সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনো পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা নইলে উষ্ণ আবহাওয়ায় মৃতদেহ দ্রুত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। ১২ মার্চ পর্যন্ত কাচের আধারে শায়িত মৃতদেহ দর্শকদের জন্য ওই কাঠের প্রকোষ্ঠেই রাখা হয়েছিল। মার্চের শেষে বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগে সংরক্ষণের জন্য মৃতদেহ সাময়িকভাবে খারক্‌ভে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কোনো স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত উন্নততর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে দেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হলেও মরদেহ রেড স্কোয়ারে কাঠের প্রকোষ্ঠেই স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু ছত্রাক সংক্রমণের আশঙ্কায় শেষদিকে বেশি সংখ্যক দর্শকদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। প্রকোষ্ঠটিতে ছত্রাক ধরতেও শুরু করেছিল। ১৯২৫ সাল থেকেই স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা চলতে থাকে। ১৯২৯ সালে নতুন স্মৃতিসৌধ

নির্মাণের জন্য জাতীয় স্তরে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। ১৯৩০ সালের ১২ অক্টোবর এই তৃতীয় স্মৃতিসৌধটির দ্বার জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত হয়। এটাই তখন থেকে হয় লেনিনের স্থায়ী ঠিকানা। অবশ্য মাঝখানে একবার ১৯৪১ সালে জুন মাসে নাৎসিবাহিনী যখন মস্কোর দোরগোড়ায় হানা দিয়েছিল সেই সময় থেকে বেশ কয়েক বছরের জন্য তাঁর ঠিকানা-বদল হয়েছিল। লেনিনের সংরক্ষিত দেহ তুলে নিয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল সুদূর তিউমেনের (সাইবেরিয়া অঞ্চলে) একটি কৃষিবিদ্যা কলেজে। কিন্তু সেটা ছিল গোপন ঠিকানা। সেই ঠিকানায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উপায় কারও ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সেখানেই রাখা হয়েছিল। ১৯৪৫-এ মস্কোয় ফিরিয়ে আনা হয়।

১৯৪৬ সালের শরৎকালে লেনিন স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরীণ সংস্কার শুরু হয়, পুরোনো সরঞ্জামগুলি বাতিল করে নতুনের আমদানি করা হয়। পঁচিশ বছর ধরে এই মেরামতের কাজ চলতে থাকে। স্মৃতিসৌধ তার জন্য বন্ধ রাখা হয়নি, খোলাই ছিল। ইতিমধ্যে দেহ সংরক্ষণের উন্নততর পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়।

প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণের জন্য লেনিনের মস্তিষ্ক এবং দেহের অভ্যন্তরীণ অংশ বের করে নিয়ে শরীরে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি বহুপ্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু সেই পদ্ধতিতে দেহ সমাধিস্থ করার আগে কিছুদিন পর্যন্ত রাখা যায়, অনন্তকাল তো নয়ই, এমনকী সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন এবং তার দুই দশক পরে পর্যন্ত নয়।

প্রথম প্রথম দেহে নিয়মিতভাবে বিশেষ ধরনের নির্যাস লেপনও করা হত। কিন্তু মাস দেড়েকের মধ্যে দেহে কিছু কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দেয়। তখন আরও দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য বেশ কয়েক মাস ধরে গবেষণা চলে। দেহের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরনের তরল পদার্থের ইঞ্জেকশন দিয়েও তার ওপর ভরসা না করে, বৈজ্ঞানিকরা একটা বড়ো কাচের বাক্সে, রায়াসনিক দ্রবের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য দেহ ডুবিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে রাসায়নিক দ্রব লোমকূপ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারে। প্রতি দেড় বছর অন্তর এটা করা হয়। রাসায়নিকগুলি কী তা গোপনীয়। দেহ মমিতে পরিণত করে রাখার সম্পূর্ণ ভিন্ন এই পদ্ধতি। সাধারণভাবে মমিতে পরিণত করলে দেহের সত্তর শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়, মুখের চেহারা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ লেনিনের চেহারা ও আয়তনের এতটুকু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটেনি। এখানে কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় তিনটি জিনিস: তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরের আলোর মাত্রা। যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হল সঠিক তাপমাত্রায় দেহ সংরক্ষণ করা, যাতে দেহ বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে না পারে, আবার দেহের অভ্যন্তর ভাগের আর্দ্রতাও বেরিয়ে না যেতে পারে।

সংরক্ষণের কাজটা অত্যন্ত ঝুঁকির— এককালে তা-ই ছিল। ১৯২৪ সালে প্রফেসর বরিস জ্বার্স্কিকে লেনিনের দেহ সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৪ সাল থেকে তাঁর পুত্র প্রফেসর ইলিয়া জ্বার্স্কির উপর সেই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তাঁর কথায়: 'পাছে দেহের কিছু হয়ে যায় এই ভয়ে আমাদের সবসময় তটস্থ থাকতে হত। কোনো ভুলচুক হয়ে গেলে আর রক্ষা নেই।' ইলিয়া জ্বার্স্কি নিজেই স্তালিনের রোষের শিকার হয়েছিলেন— তবে তাঁর কাজের ত্রুটির জন্য নয়। ১৯৫২ সালে তাঁর বাবা গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি কর্মচ্যুত হন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল একটি জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে তিনি কাজ করেছেন কিন্তু তিনি লেনিনের দেহ সংরক্ষণ পদ্ধতির গোপন রহস্য কখনো প্রকাশ করেননি।

একসময় ১৯৫৩ সালে স্তালিনকেও লেনিনের পাশেই রাখা হয়েছিল অনুরূপ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে। কিন্তু স্তালিনের পক্ষে এখানে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। নিঃস্তালিনীকরণের ধাক্কায় ১৯৬১ সালে এক রাতের অন্ধকারে স্তালিনের মৃতদেহ স্মৃতিসৌধের প্রকোষ্ঠ থেকে সুড়ঙ্গপথে ক্রেমলিনের প্রাকারের কাছে সমাধিস্থ করা হয়। রাতারাতি স্মৃতিসৌধের গা ছেকে স্তালিন নামটিও লুপ্ত করে দেওয়া হয়। আট বছরের বেশি তিনি এই ঠিকানায় স্থায়ী হতে পারলেন না। লেনিন কিন্তু সেই তুলনায় যথেষ্ট সৌভাগ্যবান; পেরেস্ত্রৈকার ধাক্কা সামলেও আজ অবধি টিকে আছেন। আট বছর আর আট দশক— সে তো বিশাল ফারাক— দুটি প্রজন্ম।

সেই সময়ের পর থেকে স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে এবং সমাধির নীচেও অনেকটাই আধুনিকীকরণ হয়েছে, যদিও মূল পদ্ধতি মোটামুটি একই আছে। তবে গত সাত দশকে নিরন্তর গবেষণাকর্মের ফলে পদ্ধতির যেরকম উন্নতি ঘটেছে তার ফলে অঘটন না ঘটলে লেনিন হাজার বছরেও অন্য আর এক অর্থে মানবসভ্যতার বিস্ময় হয়ে টিকে থাকতে পারেন।

লেনিন স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরের প্রধান কক্ষটি ১০ বর্গকিলোমিটারের, এটাই সেই গর্ভগৃহ যেখানে লেনিন কাচের শবাধারে শায়িত। মাটি থেকে ৩ মিটার নীচে গর্ভগৃহে দর্শকদের ঢুকতে দেওয়া হয় বেশি কিছু সিঁড়ির ধাপ বেয়ে। শবাধার রাখার জায়গাটা একটি গ্র্যানিটের দেয়াল দিয়ে দর্শকদের থেকে তফাত করা। লেনিন দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হন মাত্র মিনিট খানেকের জন্য। শবাধারের দু-পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিপুল সংখ্যক চলমান মানুষের ঢল। থামার নিয়ম নেই, চলতে চলতে দেখা। কক্ষে ঈষৎ গোলাপি আভার স্মিমিত আলো। ভালোমতো

নিরীক্ষণ করার উপায় নেই। মুহূর্ত খানেক পরেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে পড়তে হয়।

প্রথম যে-দুটি অস্থায়ী প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছিল তাতে স্বাভাবিক আলোর ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয়টিতে ছিল বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা। তৃতীয় অর্থাৎ স্থায়ী স্মৃতিসৌধের প্রকোষ্ঠে উষ্ণ বেগুনি আলোর রশ্মি প্রয়োগ করা হত, কেবল চতুর্থ বারের চেষ্টায় এমন আলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় যাতে ত্বকের স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশেষজ্ঞরা ত্বকের আনুবীক্ষণিক পরীক্ষা করে সদ্যোমৃত মানুষের ত্বকের সঙ্গে তার কোনো তফাত খুঁজে পাননি।

লেনিনের মরদেহ স্মৃতিসৌধ থেকে অপসারিত হবে কি না, এই প্রশ্নে বর্তমান রাশিয়ার জনসমাজে মতভেদ থাকলেও স্থাপত্যকর্ম হিসাবে স্মৃতিসৌধের মূল্য সম্পর্কে মতভেদ খুব কমই আছে। এই অনবদ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন স্থপতি আলেক্সেই শুসেভ্। মরচের মতো রঙের আভাসযুক্ত লাল মর্মর পাথরের এই অপরূপ স্থাপত্যকর্ম তার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ক্রেমলিনের প্রাচীর সম্মুখ ভাগের রেড স্কোয়ার এবং পরিপার্শ্বের প্রাচীন স্থাপত্য সমাহারের সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রক্ষা করে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে, নন্দনতাত্ত্বিকরা পর্যন্ত তার সৌন্দর্য অস্বীকার করতে পারেন না। দেশের সাধারণ মানুষের চোখে একে ছাড়া আজকের রেড স্কোয়ার কল্পনাই করা যায় না। ইতিহাসের দোহাই দিয়ে যদি কেউ এর অপসারণ দাবি করেন, সে-দাবিও ধোপে টেকে না, কেননা এও তো ইতিহাসের একটি পর্ব।

পরবর্তীকালে, ১৯৮৪ সালে স্মৃতিসৌধের মাথার ওপর প্ল্যাটফর্মে ওঠার সুবিধার জন্য পেছনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি যন্ত্রচালিত সিঁড়ির স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশের অধিকাংশ নেতারই বয়স বেশি, সাধারণ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া একজন রাষ্ট্রনেতা ব্রেজ্নেভ্ তো সেই ধকলে মারাই গেলেন। তবে বেশিদিন ব্যবহার করতে হয়নি ওই চলন্ত সিঁড়ি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর থেকে অকেজো হয়েই পড়ে আছে, যেহেতু জাতীয় উৎসব পালনের ওই রীতিটি এখন বাতিল হয়ে গেছে। তাও আবার ইদানীং রেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজ থেকে শুরু করে অন্য যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানের সময় অপকীর্তির নিদর্শন পুরো স্মৃতিসৌধটিকেই ঢেকে দেওয়া হয়। রেড স্কোয়ারের অর্ধেক গৌরব বা সৌন্দর্যের যে হানি হল একথা কে বোঝায়?

লেনিনের স্থান কোথায় হবে?

১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অব্যবহিত পর থেকে না হলেও রাশিয়ার ইতিহাসের নতুন পর্বের চার বছরের মাথায় এই প্রশ্নটি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই প্রশ্নে সেদিন নতুন রাশিয়ার জনসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে এরকম একটা ধ্বনি উঠেছিল যে, লেনিনকে তাঁর বর্তমান স্মৃতিসৌধ থেকে তুলে এনে যথারীতি সমাধিস্থ করা উচিত এবং খ্রিস্টীয় বিধিমতেই যে তা করা উচিত এই মর্মে আবেদনও করেছিল রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চ।

কিন্তু রাশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েল্ৎসিন, যিনি নাকি ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে ব্যর্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের সময় অকুতোভয়ে ট্যাঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে সোচ্চার করেছিলেন, তিনি পর্যন্ত লেনিনের মৃতদেহ তাঁর বর্তমান বাসস্থান থেকে অপসারণের জন্য জনসাধারণকে তেমন পীড়াপীড়ি করতে পারলেন না। যদিও সেটা করাই তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল। নাকি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন একসময়ের কট্টর কমিউনিস্ট এবং পরবর্তীকালে সংস্কারপন্থীদের শীর্ষনেতা বরিস ইয়েল্ৎসিন, যিনি ১৯৮৫ সালে স্ভের্দ্লোভ্স্কে (বর্তমান য়েকাতেরিনবুর্গ) পার্টি সেক্রেটারি থাকাকালে নিজের কমিউনিস্ট ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলে ধরার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেখানকার ইপাতেভ ভবন নামে একটি প্রাচীন ভবনকেই পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, যেহেতু ওই ভবনটিকে কেন্দ্র করে এমন জনশ্রুতি প্রচারিত হয়েছিলেন যে, ১৯১৮ সালে বলশেভিকরা নাকি ওখানেই জারের পরিবারকে হত্যা করে সমাধিস্থ করেছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার কিছুদিন আগেও তিনি প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন: 'আমি স্মৃতিসৌধ থেকে লেনিনের অপসারণের বিরোধী।' কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মত পালটে ফেললেন। ১৯৯৫ সালে একবার এই বিষয়ে গণভোটের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। আবার নিজে যে এমন একটা বিষয়ের ওপর ডিক্রি জারি করবেন সেটাও ভরসা করতে পারলেন না, যেহেতু সামনে ১৯৯৬ সালে জুন মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, এইসময় এরকম একটা স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে উসকানি দেওয়া ঠিক হবে না।

এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। এরপর প্রেসিডেন্ট নিজেই তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে হিমশিম খেতে লাগলেন। সমাজেরও আর তেমন মাথাব্যথা নেই ওই প্রশ্ন নিয়ে, দেশও এখন প্রেসিডেন্টের মতোই নানা সমস্যায় জর্জরিত। দেখতে দেখতে ইয়েল্ৎসিনের জমানাও ফুরিয়ে এল— ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ২০০৫ সালের অক্টোবরেও পুতিন বলেছিলেন: 'লেনিনকে উপযুক্তভাবে সমাধিস্থ করার সময়

ছবি : মনোজ দত্ত

এসেছে।' কিন্তু তারপর? ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থেকে পরে চার বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পর আবারও ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এত বছরের মধ্যে এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না— এখনও করছেন না। সাধারণভাবে রুশিরাও সম্ভবত তাদের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে আপোশ করে নিয়েছে।

জানুয়ারি ২০১৮।। পরন্তু, সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ২০১২ সাল থেকে ভিত মেরামতির জন্য লেনিন স্মৃতিসৌধ বন্ধ থাকার পর আবার খুলে দেওয়া হয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য। এই বার কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান ভ্লাদিমির পুতিন অন্য সুরে কথা বললেন। তিনি এমন কথাও বললেন যে লেনিন থাকবেন কি থাকবেন না তা জনসাধারণই ঠিক করবেন। কিন্তু জনসাধারণ লেনিন স্মৃতিসৌধ ছাড়া রেড স্কোয়ার যেমন ভাবতে পারেন না, তেমনি শতকরা ৪০ জন রুশ মানুষ আজকাল রুশ দেশের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাকে ইতিবাচক হিসেবে গণ্য করেন, মাত্র শতকরা ২০ জনের কাছে তাঁর ভূমিকা নেতিবাচক। তাই লেনিন আছেন। এখনও আছেন।

এদেশের পাখিচর্চার কয়েকটি দিক

সুভাষ ভট্টাচার্য

পাখিচর্চায় আনন্দ যত, বিভ্রান্তিও ততটাই। বিশেষত বাংলা ভাষায় পাখি নিয়ে লেখালিখিতে সমস্যা আর বিভ্রান্তি পদে পদে। পাঠকের মনে হতে পারে, বাংলায় তো এই বিষয়ে লেখালিখি হয়েই আসছে। তাহলে কেন এই কথা? এর উত্তর পরে দেওয়া যাবে। আপাতত আমাদের দেশে পাখিচর্চার শুরুর কথাই বলে নিই। এদেশে পাখিচর্চা যথারীতি ইংরেজদের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল আঠারো-উনিশ শতকে। এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে, ইংরেজ শাসন শুরু হবার আগে মোগল বাদশাহরা পাখি পুষতেন। কারও কারও 'চিড়িয়াখানা'-ও ছিল। একথা সত্যি যে, মোগল শাসকদের অনেকেই পক্ষীপ্রেমী ছিলেন। কিন্তু যাকে Ornithology বা পক্ষীবিজ্ঞান বলে, তার চর্চা শুরু হয় আঠারো শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্জন এডওয়ার্ড বাক্‌লি-র (Edward Bulkley) হাত ধরে। বাক্‌লি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি পাখির প্রজাতিকে চিহ্নিত করেন এবং যৌথভাবে জেমস পেটিভার (James Petiver) নামে একজন প্রকৃতিবিদের সঙ্গে সেই তালিকা প্রকাশ করেন। এঁরা এদেশে পাখিচর্চার সূত্রপাত করেছেন বটে, তবে তার অনেক আগেই উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পাখি নিয়ে, স্কটল্যান্ডের এবং আমেরিকার পাখি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এর শতাধিক বছর পরে ব্রায়ান হজসন (Brian Hodgson) ভারত ও নেপালের বহু পাখিকে শনাক্ত করেন, বর্গীকরণ করেন। ভারতে পাখিচর্চার শুরুটা এভাবেই। এইসময় টমাস জার্ডন (Thomas Jerdon), ব্রায়ান হজসন আর এডওয়ার্ড ব্লাইদ (E. Blyth) দুই খণ্ডে লেখেন Birds of India. ভারতেও অতঃপর শুরু হল বিজ্ঞানসম্মত পাখিচর্চা। জার্ডনদের পাখিচর্চা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো মাইলফলক। ভারতে প্রকৃত orinithology-র চর্চার সেই শুরু। এর কিছু আগে ইউজিন ওটিস ও উইলিয়াম ব্ল্যানফোর্ড খণ্ডে খণ্ডে সম্পাদনা করেন Fauna of British India নামে বিপুলায়তন গ্রন্থ। তাতে বহু বহু পাখির বিবরণ লেখেন। পাখির প্রজননঋতু, আবাসস্থল (habitat) ইত্যাদির বর্ণনাও ছিল। অসম ও পূর্ববঙ্গের কয়েকজন সিভিলিয়ানও এইসময় পাখিচর্চায় যুক্ত হন। জার্ডনদের গ্রন্থে বিপন্ন প্রজাতির সংখ্যা ও সংরক্ষণের বিষয়টিও সম্ভবত সেই প্রথম আলোচিত হয়।

আর একটা তথ্য বলে নেওয়া খুবই দরকার এখানে। যাঁকে জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, সেই অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম-ও ছিলেন একজন সর্বস্বীকৃত পক্ষীবিদ। তাঁর একটা পক্ষীপ্রেমীদের দল ছিল। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পাখির অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল কয়েকবছর ধরে। ১৮৭৩-৮৮ এই পনেরো-ষোলো বছরে ভারত উপমহাদেশের পাখির বিষয়ে হিউমের সম্পাদনায় একাধিক বইও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচনাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— The Game birds of India, Burmah and Ceylon; The Nests and Eggs of Indian Birds ইত্যাদি।

দুই

বিংশ শতকে স্বভাবতই ভারতে পাখিচর্চা এগিয়ে যেতে থাকে। এবারে ভারতীয়দের পাখিচর্চার প্রসঙ্গটা তোলা দরকার। এ বিষয়ে যত লেখালিখি হয়েছে তাতে দেখা যায়, সালিম আলিকে ভারতীয় পক্ষীচর্চার উদ্‌বোধক বলা হয়। সালিম আলি যে প্রথম পক্ষীবিদদের একজন এবং অতিবিশিষ্ট একজন, তাতে সন্দেহ করা চলে না। তবে প্রথম নন তিনি। প্রকৃত তথ্য বলছে বাঙালি প্রকৃতিবিদ সত্যচরণ লাহা সালিম আলির পূর্ববর্তী। সত্যচরণ লাহার জন্ম ১৮৮৮ সালে, তাঁর মৃত্যু হয় পঁচানব্বই বছর বয়সে ১৯৮৪ সালে। সত্যচরণ পাখির চর্চা ও পাখির বিষয়ে লেখা শুরু করেন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। শুধু তাই-ই নয়। ১৯২৮ সালে তিনি আগরপাড়ায় গড়ে তোলেন 'পাখি নিকেতন'। শুধু পাখি দেখা নয়, পাখিদের প্রজাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান, তাদের আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, ডিম ফোটানো ইত্যাদি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চর্চা শুরু করেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করেন।

সত্যচরণের অনেকগুলি গবেষণাপত্র ইংরেজিতে রচিত

হয়েছিল, প্রকাশিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব এভিয়ান সায়েন্স-এ। সত্যচরণ প্রধানত ইংরেজিতেই লিখতেন। তাঁর বহু পাখিবিষয়ক রচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়ে থাকলেও কী-এক অবোধ্য কারণে কপিরাইটের গেরোয় আটকে আছে।

তাঁর ইংরেজি রচনার মধ্যে আছে Note on the Occurrance of some witherto unrecorded Birds of Central and South Bengal, Pet Birds of Bengal. এটি কলকাতার থ্যাকার অ্যান্ড স্পিঙ্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে। সত্যচরণ বাংলারও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন যার মধ্যে বিশেষভাবে মনে রাখার মতো হল 'পাখীর কথা', 'কালিদাসের পাখী' আর 'জলচারী'। পুরুলিয়ার পাখি নিয়ে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন তিনি, আর এ-নিয়ে সমৃদ্ধ প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। তাঁর আর এক কীর্তি হল বাংলা ভাষায় প্রকৃতিচর্চা বা প্রকৃতিপাঠের উন্নতির জন্য 'প্রকৃতি' নামে একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। এসব সত্ত্বেও সত্যচরণ লাহা তত প্রচার পাননি, বিস্মৃতই রয়ে গেছেন। শুধু বাংলার নন, পক্ষীতত্ত্ব চর্চার প্রকৃত ভারতীয় পথিকৃৎ যে তিনিই, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

তিন

সত্যচরণ তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পাখিচর্চার আলোচনায় তাঁর নাম প্রায় উচ্চারিতই হয় না। সালিম মইজুদ্দিন আব্দুল আলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ সালিম আলির ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি। ভারতীয়দের মধ্যে পক্ষীতত্ত্ব চর্চায় পথিকৃৎ তিনি নন বটে, তবে পাখিচর্চাকে এদেশে জনপ্রিয় করার প্রথম কারিগর অবশ্যই তিনি এবং তাঁকে ভারতীয় পক্ষীপ্রেমীরা পাখিচর্চার জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেই দেখেন। তাঁকে Birdman of India বলা হয়। সালিম আলির বইপত্র বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। ডিলন রিপ্‌লির সঙ্গে যৌথভাবে লেখা দশ খণ্ডের Handbook of the Birds of India and Pakistan কখনোই বাজারে অমিল হয়নি। The Book of Indian Birds, Indian Hill Birds, The Fall of a Sparrow, Field Guide to the Birds of the Eastern Himalayas— এসব বই সালিম আলির বিপুল কীর্তির পরিচায়ক। সালিম আলির বড়ো কৃতিত্ব এই যে, পক্ষীতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা দেখা গেছে। এদেশে পাখিচর্চায় তিনি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। আবার বলি তিনি পাখিচর্চার পথিকৃৎ নন বটে, তবে তিনি যে এদেশের সর্বোত্তম পক্ষীবিদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সালিম আলির পরে যাঁর কথা বলতেই হবে তিনি বিক্রম গ্রেওয়াল। একালের বিশিষ্ট প্রকৃতিবিদ তিনি, পাখি নিয়ে প্রচুর চর্চা করেছেন, অজস্র বই লিখেছেন, এককভাবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বিশেষত তাঁর Birds of India, A Naturalist's Guide to the Birds of India, Birds of the Himalaya's পাখিচর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চার

এ পর্যন্ত যা বলেছি, তাতে সত্যচরণ লাহা ছাড়া আর কোনো বাঙালির নাম করিনি। সত্যচরণের পরের প্রজন্মে যাঁরা বাংলায় পাখিচর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে জগদানন্দ রায়, প্রদ্যোত কুমার সেনগুপ্ত, বিশ্বময় বিশ্বাস, অজয় হোম ও নারায়ণ চন্দ-ই প্রধান। কথাটায় বোধহয় একটু ভুল হল। নীরবে-একান্তে হয়তো আরো অনেকেই পাখিচর্চা করেন। কিন্তু বইপত্রে তার প্রকাশ না-থাকায় আমরা সেই নীরব পাখিপ্রেমীদের কথা তেমন জানতে পারি না। বাঙালির পাখিচর্চার বয়স প্রায় একশো বছর হল। বাংলা ভাষার প্রথম দিকে সত্যচরণ লাহা আর জগদানন্দ রায়ের লেখা বইগুলোর কথাই মনে পড়বে। সত্যচরণের বইগুলোর কথা আগেই বলেছি। জগদানন্দ রায়ের 'বাংলার পাখী' আর 'পাখী' একই বছরে প্রকাশিত হয়েছিল, বাংলা ১৩৩১ সনে। জগদানন্দ রায় প্রধানত ছোটোদের জন্যই লিখেছিলেন কাজেই তাঁর লেখায় পাখির সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চর্চার নজির তাঁর লেখায় তত মেলে না। সেদিক থেকে সত্যচরণ লাহার বইয়ে বিজ্ঞানসম্মত পক্ষীতত্ত্ব পুরোপুরি উপস্থিত। পাখির শ্রেণিবিভাগ, প্রজাতিসংখ্যা, গণসংখ্যা ইত্যাদি জগদানন্দ রায়ের লেখায় পাওয়া যায় না, কিন্তু সত্যচরণের লেখায় পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিক কালের বাঙালি পক্ষীবিদদের মধ্যে বিশিষ্টতম নিঃসন্দেহে অজয় হোম। অজয় হোম পাখির অনুসন্ধান ও চর্চার বিষয়ে, বহু বই লিখেছেন তা নয়। যে বইটির জন্য স্মরণীয় তিনি, তা হল 'বাংলার পাখি'। নিঃসন্দেহে বাঙালি পক্ষীবিদদের মধ্যে জনপ্রিয়তম তিনি, জনপ্রিয়তম তাঁর বইটি। পাখিচর্চা বহু বাঙালির প্রিয় ব্যসন হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৪৮-৫৫ সালের মধ্যে বনফুলের কথা, তাঁর তিন খণ্ডে রচিত উপন্যাস 'ডানা'-র কথা যার বিষয় হল পাখি। বনফুলের এই উপন্যাস পাখি সম্বন্ধে বাঙালিকে সচেতন ও কৌতূহলী হতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তার পরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইটিই হল অজয় হোমের 'বাংলার পাখি'। অজয় হোমের পরে যে পক্ষীবিদের কথা বলব তিনি স্বপন সেন। নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে বহুকাল পাখিচর্চা করেছেন, ঘুরেছেন বিস্তর, তাঁর 'পাখির বই'-এ আছে বিজ্ঞানসম্মত পাখিচর্চার চিহ্ন। তিনি যেহেতু একজন পদার্থবিজ্ঞানী, তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে

পাখির ডাকের কম্পাঙ্ক রেকর্ড করা ও বিশ্লেষণ করা। বিশ্বময় বিশ্বাস অজয় হোমেরই সমসাময়িক। তিনি লিখেছেন প্রচুর। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধই গবেষণামূলক। কিন্তু সবই ইংরেজিতে। এই কারণেই বাংলা লেখালিখিতে তিনি থেকে যান অনুল্লিখিত।

পাঁচ

বাঙালির এই পাখিচর্চার সংবাদে আমরা আহ্লাদিত হই। পাখিচর্চা একটা খুবই আনন্দদায়ক ফ্যাশন। কিন্তু বাঙালির এই পাখিচর্চার সুফল কতটা দেখতে পাচ্ছি আমরা? সাধারণ বাঙালি কি পাখি সম্বন্ধে উৎসাহী হচ্ছেন? তেমন তো দেখি না। সাধারণ বাঙালি চেনেন কাক চিল পায়রা চড়াই শালিকের মতো গুটিকতক পাখিকে যারা আমাদের আশেপাশে বিচরণ করে। কতজন বাঙালি চেনেন বসন্তবৌরিকে, ফটিকজলকে, শাবুলবুলকে, হুপোকে? গ্রামের মানুষ অবশ্য শহরের মানুষের চেয়ে একটু বেশি ওয়াকিবহাল। তাঁদের সুযোগও অবশ্য বেশি। যাঁরা পাখিচর্চা করেন, তাঁরা নিশ্চয় এর জন্যে ব্যথিত বোধ করেন। কিন্তু তাঁদের দোষ দেব না। কেননা সাধারণভাবে বাঙালিরই কৌতুহল উৎসাহ ক্ষীণ হতে ক্রমশ ক্ষীণতর হচ্ছে।

একটা সমস্যার কথা এখানে বলতেই হবে। সেই সমস্যাটা পাখিচর্চাকে কিছুটা ব্যাহত করছে নিশ্চয়। ইংরেজিতে পাখিকে নিয়ে লেখালিখি করায় এই সমস্যা নেই, সমস্যা বাংলায় লেখালিখি করায়। আমরা লক্ষ করছি, বেশ কিছুকাল থেকে লক্ষ করছি, পাখির নামে বাংলায় বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। একই পাখিকে বাংলাদেশে যে-নামে বর্ণনা করা হচ্ছে, তা পশ্চিমবঙ্গের চালু নামের থেকে ভিন্ন। শুধু বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পার্থক্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষীবিদেরাও করেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। স্পষ্ট হবে বিষয়টা।

অনেককাল ধরে White-eye-কে বাংলায় 'চশমাপাখি' বলা হয়ে আসছে। অজয় হোম, প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, নারায়ণ চন্দ একে চশমাপাখি-ই বলেছেন। অন্যদিকে দেখছি শরীফ খানের 'বাংলাদেশের পাখি' বইয়ে একে বলা হয়েছে 'বাবুনাই'। Nightjar-কে আমরা বহুকাল যাবৎ 'রাতচরা' বলে আসছি। শরীফ খান বলেছেন 'দিনেকানা'। মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার পাখি সংখ্যায় জনৈক মাহবুব আলীও White eye-কে বাবুনাই বলেছেন। অনুমান করতে পারি, বাবুনাই বাংলাদেশে চালু নাম। নাম হিসেবে বাবুনাই নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু White eye-কে চশমা পাখি বললে পাখির বৈশিষ্ট্য ফোটে, যা বাবুনাই বললে ফোটে না। বাংলাদেশে বাবুনাই যদি চালুই হয়, তবে তাকে বদলানো যাবে না হয়তো। কিন্তু একই পাখির দুই নাম একই ভাষায়, এ তো রীতিমতো বিভ্রান্তিকর। সমস্যা নানা জায়গায়। Pied crested Cuckoo হল চাতক সালিম আলি বলেছেন, এই 'চাতক' নামটি হিন্দিতে বহুলব্যবহৃত। অজয় হোম, জামাল আরা-ও একে চাতকই বলেছেন। অথচ বাংলাদেশে একে পাপিয়া বলা হয়েছে। পাপিয়া বলতে প্রকৃতপক্ষে কোন পাখিকে বোঝায় তা নিয়ে প্রচুর ধোঁয়াশা আছে। আসলে পাপিয়া হল hawk cuckoo-র নাম।

অজয় হোম নিঃসন্দেহে একালের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি পক্ষীবিদ। তবু বলব অনেক পাখির নামকরণ করতে গিয়ে একটু বেশিই কাব্য করেছেন তিনি। একাজ বনফুলও করেছেন। Small minivet সাধারণভাবে সহেলি বা সহেলী নামে পরিচিত। বনফুল তার নামকরণ করেছেন 'আলতাপরি' (আলতাপরী?)। প্রদ্যোত সেনগুপ্ত আর অজয় হোম অনুসরণ করেছেন এই নাম। অথচ অন্য কেউই গ্রহণ করছেন না এই নামকরণ। এই-যে একই পাখির নানা নাম, এতে আমাদের ভাষায় পাখিচর্চায় যথেষ্ট অসুবিধে দেখা দেয়। হুপো (Hoopoe, যার বৈজ্ঞানিক নাম Upupa epops) সমগ্র উত্তর ভারতে হুদহুদ নামে পরিচিত। বাংলায় সেই উনিশ শতক থেকেই এর নাম 'হুপো'। বনফুল, সম্ভবত তাঁর 'ডানা' উপন্যাসেই প্রথম নামকরণ করলেন 'মোহনচূড়া'। চমৎকার নাম, সন্দেহ নেই। কিন্তু নামটা বাংলাদেশ নিল, আমরা এপারের বাঙালিরা নিলাম না।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বেলায়, কিম্বা যেকোনো বিদ্যার পরিভাষার বেলায় যেমন, নানা জনে নানা পরিভাষা ব্যবহার করলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে বাধ্য। আর এর ফলে ভুলভ্রান্তিও অনিবার্য। চাতক, পাপিয়া, টিটিভ বা টিট্টিভ শামা, কালিশামা-র মতো পাখির নামে বিভ্রান্তি বা ভ্রান্তি অব্যাহত। কালিশামাকে কালিশ্যামা, শামাকে শ্যামা, টিট্টিভকে হাট্টিটি, চাতককে পাপিয়া— এমন ভ্রান্তি নিঃসন্দেহে পাখিচর্চার ক্ষতি করে।

এই লেখা শুরু করেছি এদেশে ইংরেজি ভাষায় পাখিচর্চার সূত্রপাত এবং অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়ে। তবে বাংলা ভাষায় পাখিচর্চার সমস্যা ও সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে। একথা ভেবে ভালো লাগে যে, বাংলা ভাষায় পাখিচর্চা করেছেন এবং করছেন অনেকেই। পাখির নামে বিভ্রান্তি যদি এড়ানো যেত, তাহলে এই চর্চার সার্থকতা নিয়ে কোনো সংশয়ই থাকত না। কোনো কোনো পাখির চালু হিন্দি নাম বাংলায়ও চালু হয়েছে। যেমন ফুটকি, গুলাবচসম (yellow-eyed babbler)। এতে কোনো ক্ষতি নেই। এর বদলে বাংলা নামকরণ করতে গেলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। যেহেতু কেউ তা মানবেন, কেউ মানবেন না। যাঁরা মানবেন না তাঁরা হয়তো তাঁদের মতো করে নামকরণ করবেন। পরিভাষা না থাকলে— এক্ষেত্রে বাংলা নাম না থাকলে— ইংরেজিতে বা হিন্দিতে যে নাম আছে তা-ই কেন ব্যবহার করব না? তাতে অন্তত বিভ্রান্তি তো এড়ানো যায়।

ছয়

শেষে আর-একটা জরুরি প্রসঙ্গ। তা হল পাখির সংরক্ষণ। গত কয়েকশো বছরে শত-শত প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পক্ষীবিশারদেরা আশঙ্কা করছেন যে, আগামী একশো বছরে আরো অন্তত এক হাজার প্রজাতি লোপ পেয়ে যাবে। এই কথাটা ভাবলেই বিমর্ষ বোধ করি। পাখিকে বাঁচাতে হলে আগে বুঝে নেওয়া চাই বহু প্রজাতি লোপ পেল কেন। একটা বড়ো কারণ অবশ্যই জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন। অনেক পাখি তাদের অভ্যস্ত বাসস্থান (habitat) হারাচ্ছে। বনভূমি কমে আসছে, নগরায়ণ বাড়ছে। জলাভূমি শুকোচ্ছে। যাকে rainforest বা বৃষ্টিপ্রবণ বনভূমি বলে, তা-ও কমছে একটু একটু করে।

প্রাকৃতিক কারণে যে পাখিমৃত্যু ঘটে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। একটার উল্লেখ করি। হাওয়াই দ্বীপে একধরনের জ্বর পাখির মৃত্যু ঘটিয়েছে অনেককাল ধরে। একে এভিয়ান ম্যালেরিয়া (avian malaria) বলে। বলছি বটে প্রাকৃতিক কারণ। আসলে এতে মানুষেরও একটা ভূমিকা আছে। পক্ষীবিজ্ঞানীরা বলেন যে, নানা দেশ থেকে মানুষই ওই রোগের জীবাণু বয়ে নিয়ে গেছে হাওয়াই দ্বীপে। আর তার ফলে রেন (wren) গোত্রের পাখিই সবচাইতে বেশি মারা পড়েছে। বিভিন্ন কারণে কীটনাশকের ব্যবহার করা হয়। পাখির নিদারুণ ক্ষতি করে কীটনাশক। এছাড়া আছে পাখিশিকারের প্রবণতা।

পক্ষীবিদেরা যে এ নিয়ে একেবারেই ভাবছেন না, তা নয়। তবে এখনও তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানি না। বাংলাদেশে পাখিকে বাঁচাতে এবং সামগ্রিকভাবে বন্যপ্রাণ বাঁচাতে আইন হয়েছে। কিছু কাজও হয়েছে তাতে। আমাদের দেশে মহারাষ্ট্রে 'মহারাষ্ট্র পক্ষীমিত্র' তৈরি হয়েছে ১৯৮১ সালে। ইউরোপেও আছে এমন বহু সংস্থা। আমাদের রাজ্যে তেমন কোনো সংস্থা আছে কি না জানি না। তবে পক্ষীপ্রেমিকদের উদ্‌বেগ মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় চোখে পড়ে। ইউরোপে কিছুকাল যাবৎ captive breeding, habitat protection, translocation জাতীয় ব্যবস্থা হয়ে চলেছে। পাখিদের নিজস্ব অভ্যস্ত বাসভূমি বা habitat নষ্ট হয়ে গেলে তাদের জন্য বিকল্প বাসস্থান নির্মাণই হল translocation. নিউজিল্যান্ডে আর স্টুয়ার্ট আইল্যান্ডে এসব করে ফলও পাওয়া গেছে। আমাদের এখানকার চিত্রটা কিন্তু ভালো নয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কেবল শিকার-নিয়ন্ত্রণ করতে আইন রচনাই যথেষ্ট নয়। পাখির জন্য অভয়ারণ্য বা পাখিরালয় তো রয়েইছে— কুলিকে, পূর্বস্থলীতে। কিন্তু সর্বত্রই পাখি কমে যাচ্ছে। সাঁতরাগাছির ঝিলে পরিযায়ী পাখির আনাগোনা ক্রমশই কমছে। কেন কমছে তা ভাবা দরকার। কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না ভাবতে হবে তাও। আর একাজ জনগণের ততটা নয়, যতটা সরকারের। সরকারের কাজ হবে পক্ষীবিশারদদের পরামর্শ নেওয়া এবং তাঁদের প্রস্তাব কার্যকর করা।

ছবি : সুরজিৎ সরকার

নবযুগ আনবে না?

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

বব ডিলান গান বেঁধেছিলেন, 'দ্য টাইমস দে আর আ-চেঞ্জিং'। ছবিও তৈরি হয়েছিল তাঁকে নিয়ে, ওই নামেই। সেটা ছিল ১৯৬৪ সাল। এখন ২০১৯। পঞ্চান্ন বছরের পৃথিবী বিস্তর বদলেছে। এবং বদলে চলেছে। দ্য টাইমস দে আর আ-চেঞ্জিং। চার দিকে অহরহ সেই পরিবর্তনের অগণিত লক্ষণ।

একটি লক্ষণ মিলল আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮১টি কর্পোরেট সংস্থার কর্ণধাররা বিজনেস রাউন্ড টেবল (বি আর টি) নামক একটি মঞ্চ থেকে এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করলেন। বিআরটি নতুন নয়, ১৯৭৮ সাল থেকে এই সংগঠন মাঝে মাঝে কর্পোরেট পরিচালনার নীতি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মতামত জানায়। বলা যেতে পারে, মার্কিন পুঁজিবাদের ইস্তাহার। কালক্রমে সেই ইস্তাহারের বয়ানে বিবর্তন ঘটে, কিন্তু অন্তত নব্বইয়ের দশক থেকে একটি বিষয়ে কর্পোরেট বড়কর্তারা, দেখা গেছে, নট নড়নচড়ন। সেটা এই যে, তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ দেখা। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে, ১৯৭০ সালে অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান লিখেছিলেন, 'ব্যাবসায়িক সংস্থার এক এবং একমাত্র সামাজিক দায়িত্ব হল এমন কাজ করা যাতে তার মুনাফা বাড়ে', অর্থাৎ সংস্থার শেয়ারহোল্ডার তথা মালিকদের আয় বাড়ানো ছাড়া আর কোনো দায় তাদের নেই। মার্কিন দুনিয়ার, এবং বৃহত্তর পৃথিবীর কর্পোরেট সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা একমনে এই আদর্শ মেনে এসেছেন।

কিন্তু এবার চিত্রনাট্যে পরিবর্তন ঘটেছে। বি আর টি-র মঞ্চ থেকে প্রকাশিত শ-তিনেক শব্দের যৌথ ঘোষণায় কর্পোরেট অধিপতিরা জানিয়েছেন, শুধু কোম্পানির মালিক নয়, অন্য বিভিন্ন বর্গের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হওয়াও ব্যাবসায়িক সংস্থার দায়িত্ব। যেমন, কোম্পানিকে যারা বিভিন্ন উপকরণ, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করে সেই সাপ্লায়ার বা জোগানদাররা, কোম্পানির কাস্টমার বা খরিদ্দাররা, শ্রমিক ও কর্মীরা এবং কোম্পানির সঙ্গে জড়িত স্থানীয় কমিউনিটি বা গোষ্ঠী। বস্তুত, ওই বিবৃতিতে শেয়ারহোল্ডারের উল্লেখ এসেছে একেবারে শেষের দিকে, তার আগে 'খরিদ্দারদের জন্য মূল্য সৃষ্টি (ভ্যালু ফর কাস্টমার্স)', 'কর্মীদের জন্য বিনিয়োগ (ইনভেস্টিং ইন এমপ্লয়িজ)', 'জোগানদারদের সঙ্গে সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং ন্যায্য আচরণ', 'যে কমিউনিটির মধ্যে আমরা কাজ করি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা', 'পরিবেশ রক্ষা' ইত্যাদি অঙ্গীকারের ছড়াছড়ি। হুতোম এ-কালের লোক হলে বলতেন— এও অ্যাক পরিবর্তন।

পরিবর্তনের পিছনে কী আছে? কর্পোরেট পুঁজির দৌরাত্ম্যে দুনিয়াজুড়ে সাধারণ কর্মীদের ত্রাহি রব উঠেছে, সেই সত্তরের দশক থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসাম্য বেড়ে চলেছে অস্বাভাবিক হারে, ওপরতলার সংখ্যালঘু সমস্ত ক্ষীর-ননি খেয়ে নিচ্ছে আর নীচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য পড়ে থাকছে রুটির টুকরো, সেই টুকরোটাও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো, মুনাফা বাড়ানোর অনন্ত ক্ষুধায় পুঁজি কেবল শ্রমজীবীকেই চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় হিসেবে উত্তরোত্তর শোষণ করছে না, প্রকৃতি এবং পরিবেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে দিচ্ছে সমস্ত ধরনের কমিউনিটিকে— এ-সবই তো এখন অতি পরিচিত এবং অতি পুরোনো কথা। আজ হঠাৎ আমাজন, ওয়ালমার্ট, জেপিমর্গান চেজ-এর মতো সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা নড়েচড়ে বসলেন কেন? কী মনে করে? তাঁদের প্রাণ হঠাৎ কেঁদে উঠল? তাঁদের মন হঠাৎ জেগে উঠল? এমন প্রশ্ন শুনেও কুট্টির ঘুড়া আজ আর হাসবে না, কারণ এতটা ছেঁদো কথা সে শুনতেই রাজি হবে না।

স্পষ্টতই, কর্পোরেট মহাগুরুরা চিন্তায় পড়েছেন। মুনাফার তাড়নায় বিশ্বায়িত পুঁজির কীর্তিকলাপ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশেবিদেশে* গল্পের সেই কাবুলের রাস্তার কথা মনে পড়ে। প্রাণ-হাতে-করা যাত্রাশেষে গাড়ির চালককে তাঁর অসামান্য দক্ষতার জন্য প্রশংসা করে আলীসাহেব বলেছিলেন, তিনি তো সারা রাস্তা চোখ বুজে এসেছেন। চালকের সংক্ষিপ্ত জবাব ছিল: 'আম্মো'। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ওই

ধনকুবের বড়োকর্তার দল এবং তাঁদের বশংবদ পরামর্শদাতারা কেউ জানেন না, লগ্নিপুঁজির কবজাগত এই অর্থনীতি কোথায় চলেছে, কোন খাদের কিনারা থেকে কতটা দূরে, কীই-বা তার পরিণতি। কিন্তু একটা জিনিস তাঁদের মস্তিষ্কেও সম্ভবত ঢুকেছে। সেটা হল, যেভাবে চলছে সেভাবে আর চালিয়ে যাওয়া দুষ্কর। যেকোনো সময় পুষ্পক রথ ভেঙে পড়তে পারে। ফলে তাঁরা ভয় পেয়েছেন। সেই ভয়ের তাড়নাতেই এই নতুন মন্ত্র জপ। শুধু নিজের মুনাফা বাড়ালে চলবে না, সকলের স্বার্থ দেখতে হবে, সকলের যাতে ভালো হয় সেইরকম কাজ করতে হবে। মানে, সর্বমঙ্গলার পুজো দেওয়া আর কী।

ভয়ের কতকগুলো বিশেষ কারণও আছে, যে কারণগুলো অধুনা বেশ জোরদার। দুটো কারণের কথা বলা যেতে পারে। এক, রাষ্ট্রের ওপর ভরসা কমেছে। বড়ো পুঁজি বিপাকে পড়লে রাষ্ট্র তাকে বাঁচাবে, এটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে চলে এসেছে। তার রাজনৈতিক কার্যকারণসূত্র বহুচর্চিত। কেইনসিয় অর্থনীতি এই আদর্শকে একটা সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিল। সত্তরের দশকে সেই তত্ত্ব প্রতিপত্তি হারায়, তার বদলে মস্তানি শুরু হয় তথাকথিত উদারনীতির, যে নীতি রাষ্ট্রকে দূরে থাকতে বলে, বলে— বাজার নাকি নিজেই নিজের অসুখ সারাবে। কাণ্ডজ্ঞানীরা তখনই হেসেছিলেন। কিন্তু বিপদে না পড়লে কাণ্ডজ্ঞানের কদর হয় না, সুতরাং অনেক দিন ধরে মুক্তির দশক চলল। অতঃপর প্রথমে ১৯৯৭ সালের এশীয় লগ্নি-বাজারের সংকট, তারপর ২০০৮-এ মার্কিন দুনিয়াসহ বিশ্ব অর্থনীতির বিপর্যয় নিতান্ত কট্টর বাজার-বিশ্বাসীদেরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আতান্তরে পড়লেই কর্পোরেট প্রভুরা কীভাবে রাষ্ট্রের পদতলে আশ্রয় নেয়, আর রাষ্ট্রও 'না না, এত বড়ো যারা তাদের তো আর মরতে দেওয়া যায় না' বলে জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকার থলি নিয়ে রাঘববোয়ালদের সামনে উপুড় করে দেয়, অর্থাৎ— বেলআউট।

এখনও মধুসূদন দাদা হাজির আছেন, দরকার হলে তিনি এগিয়ে আসবেন। কিন্তু তাঁর সামর্থ্য কমেছে— দেশে দেশে রাষ্ট্রের কোষাগারে ভাটার টান। এবং তার প্রধান কারণ, রাষ্ট্র বড়ো পুঁজির কাছে রাজস্ব আদায় ক্রমশই কমিয়ে এনেছে, উলটে স্বাভাবিক অবস্থাতেও তাকে বিস্তর ভরতুকি দিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তার সামর্থ্য কমে যাওয়াটা আজ আর সাময়িক কোনো কারণে নয়, ওটা তার চরিত্রের দোষ। অন্যভাবে বললে, কর্পোরেট পুঁজি এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক আর আগের জায়গায় নেই, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ধরনটা আগের চেয়ে অনেক বেশি অস্থির, অনিশ্চিত। দুনিয়ার দিকে দিকে যে পপুলিস্ট নায়কদের উত্থান এবং অভিযান, তাঁরা সেই অস্থিরতাকে ভাঙিয়েই ক্ষমতায় আসছেন এবং ক্ষমতা ধরে রাখছেন। কিন্তু তাঁরাও জানেন, সেই ক্ষমতার ভিত নড়বড়ে, কারণ লোক খেপিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার প্রযুক্তি যেকোনো সময় হঠাৎ জবাব দিতে পারে। তাঁদের এই অস্থিরতা রাষ্ট্রের ওপর পুঁজির ভরসা বাড়াতে সাহায্য করে না, সেটা বলা বাহুল্যমাত্র।

কিন্তু কর্পোরেট কর্তাদের ভয়ের একটা গভীরতর কারণ আছে। তার নাম রাজনীতি। যে রাজনীতি শেষ-বিচারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বই আর কিছু নয়। ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁরা সেই দ্বন্দ্বের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের সহস্র প্রকরণ ব্যবহার করেন, কিন্তু সেই প্রকরণগুলি যে সবসময় তাঁদের পরিকল্পনা মাফিক কাজ করবে, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, সেটা তাঁরা জানেন। জানেন যে, ক্ষমতার লাগাম অতিরিক্ত জোরে টেনে রাখতে গেলে সে লাগাম ছিঁড়ে যেতে পারে। শোষণ এমন একটা জায়গায় পৌঁছোতে পারে যেখানে শোষণযন্ত্রের কলকবজাগুলোই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্ব অর্থনীতির, বিশেষত তথাকথিত উন্নত দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ একটা চরম পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে। ফলে এই ব্যবস্থাটির স্থায়িত্ব বিপন্ন। একেবারে দৈনন্দিন রাজনীতির পরিসরেও সেই বিপন্নতার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশে বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের একটি অংশের রাজনৈতিক অবস্থান রিপাবলিকান তো বটেই, ডেমোক্র্যাটদের মূলধারার নায়ক-নায়িকাদেরও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার্নি স্যান্ডার্স বা আলেকসান্দ্রিয়া ওকাসিয়ো-কর্তেস কোনো কমিউনিস্ট মতাদর্শের কথা বলছেন না, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য তাঁদের দলও হজম করে উঠতে পারছে না। এমনকী তাঁদের চেয়ে বেশ কিছুটা দক্ষিণে, মধ্য অবস্থানে থাকা এলিজাবেথ ওয়ারেন পর্যন্ত এখন কর্পোরেট আমেরিকার উদ্‌বেগের কারণ হয়ে উঠেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রতিযোগিতায় সামনের সারিতে দৌড়োনো এই ডেমোক্র্যাট নেত্রী বলেছেন, তিনি চান যে, মার্কিন কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে দেশের সরকার একটি চার্টার বা সনদ মানতে বাধ্য করুক যাতে সংস্থার কর্মী, খরিদ্দার এবং সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার নথিভুক্ত থাকে, কোনো সংস্থা সেই চার্টার লঙ্ঘন করলে তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে।

এই অবস্থানের পিছনে বাস্তববুদ্ধির দীর্ঘ ছায়া। সেই বুদ্ধি বলে দেয় যে, শেয়ারহোল্ডারের ক্ষুদ্রস্বার্থ তথা মুনাফাকে পাখির চোখ করে ব্যাবসাবাণিজ্য চালিয়ে যেতে চাইলে পাখিটাই থাকবে না, বস্তুত থাকবে না গাছটাই। এটাও বলে দেয় সেই বাস্তববোধ যে, পুঁজির মালিক এবং তাঁদের ভাড়া করা ম্যানেজারদের পক্ষে ওই ক্ষুদ্রস্বার্থের ঠুলি চোখ থেকে খোলা কঠিন, কারণ ওই স্বার্থ রক্ষাই তাঁদের ধর্ম। এবং, বাস্তববোধ এই

সত্যও জানায় যে, ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা নীতি নির্ধারণ এবং রূপায়ণের প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে বসে বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কর্পোরেট পুঁজির লীলাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলবেন, এমন ভরসা নেই। সেই কারণেই কিছু শর্ত আইন বা সংবিধান মারফত তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে তাঁরা শর্তগুলো মানতে বাধ্য হন, এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরাও সেগুলো শিথিল করতে না পারেন। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, শর্তাবলি তৈরি করে বিধিবদ্ধ করার দায়িত্বটা তো রাজনীতিকদেরই পালন করতে হবে, তাঁরা যে সেটা করবেন তার ভরসা কোথায়। কিন্তু সেখানেই রাজনীতির ভূমিকা, যে রাজনীতি বাস্তবিকই সম্ভাব্যতার শিল্প। রাজনৈতিক সংগঠন এবং আন্দোলনের পথে সেই সম্ভাব্যতাকে বাস্তব করে তুলে সংবিধান, আইন বা সনদের বলে একবার রাজনীতিকদের হাত-পা বেঁধে দিতে পারলে সরকারের চালকদের পক্ষে শর্ত ভাঙা তুলনায় কঠিন হয়। এলিজাবেথ ওয়ারেন দৃশ্যত তেমন একটি সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই তাঁরা প্রস্তাবটি ভেবেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে ডেমোক্র্যাট রাজনীতিকের এই অবস্থান কর্পোরেট কর্তাদের বিপরীত মেরুতে। তিনি চাইছেন পুঁজির কার্যকলাপের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে, কর্পোরেট কর্তারা যা কখনোই মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু আসলে দুই অবস্থানের পিছনে কাজ করছে একই আশঙ্কা। কর্পোরেট পুঁজি শাসিত যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহাল রয়েছে সেটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা। ডেমোক্র্যাট নেত্রী চাইছেন বাইরে থেকে শাসন করে তাকে সহবত শেখাতে, পুঁজিপতিরা বলছেন তাঁরা নিজেরাই সহবত শিখতে এবং পালন করতে চান। দুই তরফেরই স্বার্থের তাড়না অত্যন্ত স্পষ্ট। কর্পোরেট মালিকদের ভয়, আর্থিক সংকটের চাপে ব্যবস্থা ভেঙে না পড়ে, সোনার ডিম পাড়া হাঁসটা মরে না যায়। প্রেসিডেন্ট-পদ-অভিলাষী নেত্রীর আশা, ধনতন্ত্রকে কিছুটা মানবিক করে তোলার পক্ষে সওয়াল করলে বিপন্ন মানুষ হাত খুলে ভোট দেবেন।

এই দুই তরফের কে কতটা আন্তরিক, কার কথায় আত্মবিপণনের কৌশল কত শতাংশ, সেই তর্ক অসার। রাজনীতির ময়দানে আন্তরিকতার সন্ধান করাটা বাস্তববোধের পরিচয় দেয় না। প্রশ্ন হল, সেই ময়দানের খেলাটাকে কীভাবে ঘোরানো যায়। যে সম্ভাব্যতার কথা একটু আগেই উঠল, সেটা কোনো পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার ব্যাপার নয়, সেই সম্ভাবনা তৈরি করে নিতে হয়, এবং ক্রমাগত তাকে এগিয়ে নিতে যেতে হয়। সম্ভাবনার নির্মাণ এবং প্রসার ঘটিয়ে চলাটাই যথার্থ রাজনীতির কাজ, রাজনৈতিক প্রকল্পের ধর্ম।

আর্থিক সংকট সেই প্রকল্পের সামনে সুযোগ আনে, স্থিতাবস্থাকে ভেঙে নতুন পথে এগোনোর সুযোগ। দেড়শো বছরেরও বেশি আগে, উনিশ শতকের মধ্যপর্বে পশ্চিম দুনিয়ার অর্থনীতিতে সংকটের পদধ্বনি শুনে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস আক্ষরিক অর্থে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন, ১৮৫৭ সালের মাঝামাঝি বিশেষত আমেরিকা এবং ফ্রান্সে লগ্নির বাজারে ধস নামলে এঙ্গেলস বন্ধুকে লিখেছিলেন, '... আগামী তিন-চার বছর ব্যাবসাবাণিজ্যের হাল আবার খারাপ হবে। এখন আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন।' মার্কস তার আগেই ঘোষণা করেছিলেন, 'The American crisis... is BEAUTIFUL'। যেন ভুলে না যাই, এই সংকটের ধাক্কায় দুই বন্ধুরই ব্যক্তিগত সমস্যা বেড়েছিল, বিশেষ করে আমেরিকার আর্থিক সংকটের ফলে মার্কসের নিরবচ্ছিন্ন অর্থাভাব দ্বিগুণ হয়ে ওঠে, কারণ *দি নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন* পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে টাকা পেতেন, সেই রোজগার এক ধাক্কায় অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তাঁদের রাজনৈতিক আবেগে কিছুমাত্র টোল পড়েনি, তাঁরা এই প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত ছিলেন যে, ধনতন্ত্রের বিপর্যয় থেকেই জন্ম নেবে নতুন ব্যবস্থা। সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজেকে সামলে নেয়, যে সামলে নেওয়ার দৃষ্টান্ত পরবর্তী দেড়-শো বছরে ক্রমাগত মিলবে। এই অভিজ্ঞতা মার্কসকেও গভীরভাবে ভাবিয়েছিল, নিজের চিন্তাকে নতুন করে বিচার করার প্রেরণা দিয়েছিল। আমাদের চেনা মার্কসবাদীদের তুলনায় তাঁর আত্মসমালোচনার আকাঙ্ক্ষা এবং সামর্থ্য দুই-ই ছিল অনেক বেশি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সংকটের সম্ভাবনাময় দিকটাকে ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ আছে। এই সম্ভাবনাকে চিনতে পারাটা মার্কসীয় চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

কিন্তু, আবারও খেয়াল করা দরকার, সম্ভাবনার সুযোগ না নিলে, তাকে কাজে লাগানোর জন্য যথেষ্ট সক্রিয় না হলে তার কোনো দাম নেই। এবং এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, কার্ল মার্কস ও তাঁর সহকর্মীরা উনিশ শতকের সেই সংকটপর্বে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখেছিলেন, কারণ তার প্রস্তুতি ছিল, শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় সংগঠন ছিল, আন্দোলন ছিল। ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সাক্ষী, সেই প্রস্তুতি নিষ্ফল হয়নি। ধনতন্ত্রের পতন ঘটল না, চূড়ান্ত বিপ্লব হল না, চূড়ান্ত বিপ্লবের ধারণাটির সীমাবদ্ধতাও উন্মোচিত হল, কিন্তু তার পাশাপাশি বিপ্লবের ইতিহাসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হল, পারী কমিউনের পরবর্তী দেড়-শো বছরে যে ইতিহাসে আরো অনেক অধ্যায় সংযোজিত হবে।

আজ, বিশ্বায়িত ধনতন্ত্রের এই বিপন্ন এবং উদ্‌বিগ্ন পরিস্থিতিতে মার্কস উৎফুল্ল বোধ করতেন বলে মনে হয় না। তার কারণ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি একেবারেই দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন। আন্দোলন, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ হচ্ছে না, এমনটা বললে ভুল হবে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিস্পর্ধী উদ্যোগ চলছে, কখনো

কখনো তা বড়ো আকারও ধারণ করছে। আমাদের দেশেও গত কয়েক বছরে কৃষক, শ্রমিক, এককথায় শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত আন্দোলন দেখা গেছে। কিন্তু, দৃশ্যত, সেইসব আন্দোলন নিজের নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডিতেই সীমিত থেকেছে, পরস্পর হাত মেলাতে পারেনি, অথচ হাত মেলানোর সুযোগ ছিল, বিশেষ করে যেখানে বড়ো পুঁজি রাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে জনজীবনকে তছনছ করেছে সেখানে কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা— সমস্ত ক্ষেত্রের বিপর্যস্ত মানুষের একযোগে সেই আক্রমণের বিরোধিতা না করার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তেমনটা ঘটেনি।

এই ব্যর্থতার দায় অবশ্যই বামপন্থী দল এবং সংগঠনগুলির ওপরেই বর্তায়। কিন্তু সেটা নিছক দোষারোপের প্রশ্ন নয়। তার চেয়েও অনেক বড়ো প্রশ্ন নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার, নতুন করে আন্দোলনে নামার এবং, অবশ্যই, নতুন করে ভাবার। বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ-বিক্ষোভ নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক বিরোধিতার আন্দোলন নিয়ে নতুন ভাবনা এখন অত্যন্ত জরুরি। তার প্রথম শর্ত ওই বিরোধিতার আদর্শকে একটা বিকল্প ধারণার কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলা। সেই ধারণাকে বাদ দিয়ে সমাজবিপ্লবের রূপরেখা সন্ধানের কোনো অর্থই থাকতে পারে না। বিকল্প খোঁজার শর্ত পূরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই প্রত্যয় যে, যা আছে, যেভাবে আছে সেটাই একমাত্র সত্য নয়, অন্য সত্যও সম্ভব। মার্গারেট থ্যাচার বলেছিলেন কোনো বিকল্প নেই। সেটা ভুল— বিকল্প আছে। এবং তা কোনো অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে নেই, চোখের সামনেই আছে তার সম্ভাবনা। মার্কিন দুনিয়ার বামপন্থী তাত্ত্বিক জোডি ডিন বলেছেন 'কমিউনিস্ট হরাইজন'-এর কথা। হরাইজন বা দিগন্ত মানে যা চোখের সামনে আছে, যা স্পর্শগ্রাহ্য নয় কিন্তু সম্ভাবনাময়। সেই সম্ভাবনার বাস্তবায়িত একটি রূপ হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু তার অভিমুখে যেতে হবে, সেটাই বিপ্লবের কাজ। দিগন্তরেখাটাকে দেখতে না পেলে বা না চাইলে সেই কাজের প্রস্তুতি অসম্ভব।

কর্পোরেট কর্তাদের উদ্‌বিগ্ন বৈঠক এবং বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার জানিয়ে দিচ্ছে যে, দিগন্তরেখাটি সামনে আছে। ক্রমশ সামনে আসছে। সময় বদলাচ্ছে। দ্য টাইমস দে আর আ-চেঞ্জিং।

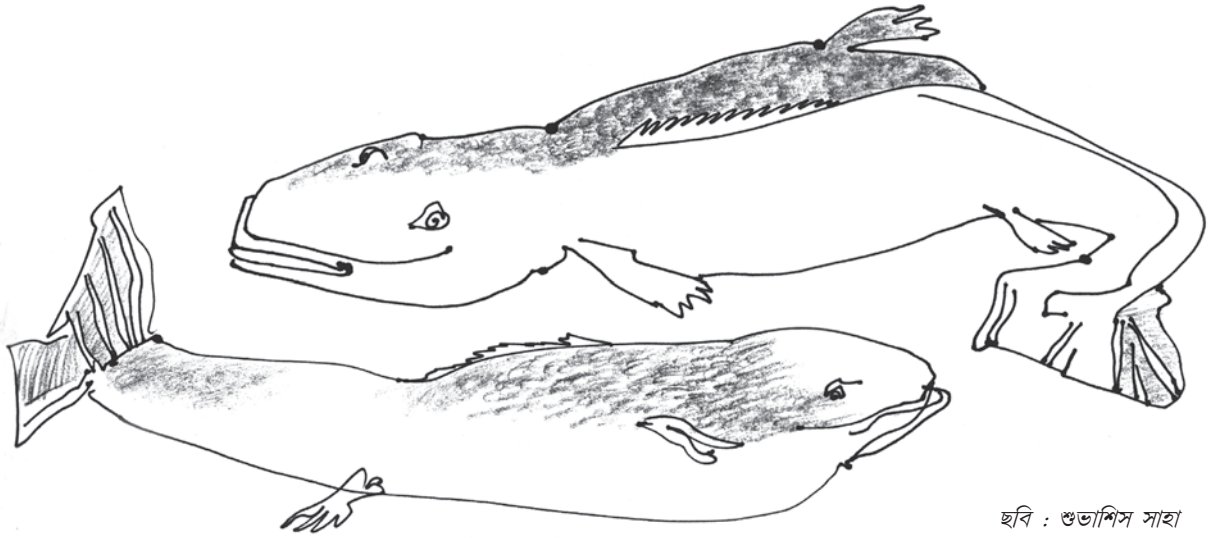

ছবি : শুভাশিস সাহা

দ্বিশতবর্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত

আশীষ লাহিড়ী

অক্ষয় দত্তের তেরো বছর বয়সে (১৮৩৩) রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। একেবারে শেষ বয়সে (১৮৮৩) রামমোহন রায়কে তিনি আধুনিক ভারতের প্রথম বিজ্ঞান-অনুরাগী মানুষ বলে বন্দনা করেছেন: 'ধন্য রামমোহন রায়!... তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে।'

রামমোহন রায়-অনুরাগী প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮১৭ সালে। রামমোহন রায়ের 'হিন্দু স্কুল'-এর কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি, 'একাধিক বার পারিতোষিক লাভ' করেছিলেন। ডিরোজিয়োর পদত্যাগের অল্পকাল পরে, ১৮৩১ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই ছিল, যেটা তখনকার হিন্দু কালেজী কালচারে সুলভ ছিল না। ওই জায়গাতেই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর আগ্রহের মিল ছিল। বাকি যেটুকু, তাতে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। প্রথম দুজন ছিলেন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন-প্রয়াসী, দেবেন্দ্র মূলত রক্ষণশীল।

দেবেন্দ্রনাথ দস্তুরমতো পরীক্ষা নিয়ে অক্ষয়কুমারকে ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচন করেন। সম্পাদক নিযুক্ত হবার পরেও অক্ষয়কুমার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগে বহিরাগত ছাত্র হিসেবে ক্লাস করতেন। বেকন আর কোঁত-এর দর্শন যে তিনি খুব ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, তার অসংখ্য নজির তো তাঁর লেখাতেই ছড়িয়ে আছে।

তত্ত্ববোধিনী সভায় এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার-কমিটিতে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এই দুজনের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ হতে থাকে। মতামতের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের প্রধান সমর্থক ছিলেন বিদ্যাসাগর। দেবেন্দ্রগোষ্ঠী ও অক্ষয়গোষ্ঠীর মতামতের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর যুগে শিক্ষিত বাঙালির মননক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে। ১৮৪৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বেদ-উপনিষদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট ব্যাখ্যা বর্জন করেন। ব্রাহ্ম ধর্মের এই ঐতিহাসিক রূপান্তরে অক্ষয়কুমারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিবনাথ শাস্ত্রী পরিষ্কার করে সে-কথা লিখেছেন: 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানত তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ...১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।' মহেন্দ্রনাথ রায় নির্জলা ভাষায় লেখেন, 'অক্ষয়কুমারের বুদ্ধি-শক্তি ও তর্ক-শক্তি অতিশয় প্রখর; সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রাজনারায়ণ বসু অথবা অন্য কেহই ইঁহার কথা খণ্ডন করিতে পারিতেন না। ' অক্ষয়কুমারের অকৃত্রিম ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে, 'প্রথমে মতদ্বৈধ হলেও অক্ষয়কুমার দত্তই দেবেন্দ্রনাথের মনে বেদবিচার ও বেদ-অন্বেষণের প্রেরণা দিয়েছিলেন।'

জীবনের প্রথম অধ্যায়ে অক্ষয় দত্ত যাঁদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, জর্জ কুম (১৭৮৮-১৮৫৮) তাঁদের অন্যতম। কুম-এর চিন্তাধারার সদর্থক ও নঞর্থক দুই দিকই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। জর্জ কুম আজকের দিনে এক বিস্মৃত নাম, কিন্তু ১৮২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর Constitution of Man in Relation to External Objects ছিল উনিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী বইগুলির অন্যতম। জর্জ কুম-এর এডিনবরা ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি ছিল একটি পৃথিবী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। অক্ষয় দত্তও এই ফ্রেনোলজিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন— খুলির ওপরে যেসব খাঁজ বা টোল থাকে, শুধু সেগুলো টিপে টিপেই নাকি একজন মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলো বলে দেওয়া যায়। কতকগুলি বাহ্য আপাত-

সাদৃশ্যের ভিত্তিতে, এবং কিছু পরিমাণ জাতি-বৈষম্যের ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে এই ধারণা উনিশ শতকে ইউরোপে, বিশেষ করে ব্রিটেনে এবং সেইসূত্রে ভারতেও— খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যুগের হাওয়ায় ভেসে অন্য অনেকের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতো বিচক্ষণ মানুষও ফ্রেনোলজি-র মতো ভুয়ো 'বিজ্ঞানের' চর্চায় প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন।

ফিরে-দেখার সুযোগ নিয়ে আজ আমরা বুঝতে পারি, কুম আসলে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্ট ধর্ম আশ্রিত নৈতিকতার পালটা একটা সেকিউলার বিজ্ঞানভিত্তিক মতাদর্শের আশ্রয় খুঁজছিলেন। চাইছিলেন, সেই বনেদের ওপর দাঁড়িয়ে এমন এক উদারনৈতিক সামাজিক কাঠামো গড়তে যেখানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধগুলির কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না। খ্রিস্ট ধর্ম-আশ্রিত মূল্যবোধগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বন্দ্ব যে অসমাধেয়, সেটা তিনি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে, প্রাক্-ডারউইন যুগে কুম-এর ঈপ্সিত ওইরকম একটি সর্ব-সমন্বিত বৈজ্ঞানিক আশ্রয় পাওয়া ব্রিটেনে বেশ কষ্টকর ছিল। এখানে আসল দ্বন্দ্বটা ছিল ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের।

প্রায় এর সমান্তরাল একটি প্রক্রিয়া অক্ষয় দত্তের মধ্যেও কাজ করছিল। তিনি ব্রাহ্মমত বলতে এমন একটা কিছু বুঝতেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশধারার সঙ্গে ওতপ্রোত এবং যা প্রকৃত জ্ঞান আহরণের পথে বাধা সৃষ্টিকারী যেকোনো বিশ্বাসের বিরোধী। অথচ তখনও তিনি ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাসী। সে ঈশ্বর প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয়, পরস্পর-নির্ভরশীল নিয়মাবলীরই অপর নাম।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের এক বক্তৃতায় এ ব্যাপারটি তিনি স্পষ্ট করে বলেন: 'আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না এবং ইয়ুরোপীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ন্যায় কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়াও কম্পিত হই না। আমরা অবনিমণ্ডল সচল শুনিয়াও শঙ্কিত হই না এবং তদর্থে ক্রুদ্ধ হইয়া পিসা-নগরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে [গ্যালিলিওকে] নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি [অর্থাৎ চার্লস লায়েল-এর তত্ত্ব] শুনিয়াও সচকিত হই নাই, এবং অধুনা জর্জ কুম-প্রণীত অদ্ভুত পুস্তক-প্রচার বিষয়েও প্রতিকূল হই নাই। অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য।' (১৮৫৩)

এই একই সুরে, কিন্তু আরো বিজ্ঞাননিষ্ঠ ভাষায় তিনি বলেন: 'আমাদিগের আপন প্রকৃতিই আমাদিগের এক পরম শাস্ত্র স্বরূপ। যে নক্ষত্রের মনোবৎ দ্রুতগামী কিরণপুঞ্জ পৃথিবীমণ্ডলে উপনীত হইতে দশ লক্ষ বৎসর অতীত হয়, তাহাও আমাদের শাস্ত্র, আবার যে অতিসূক্ষ্ম শোণিতবিন্দু আমাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরেই সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।'

অক্ষয়কুমারের নিক্ষিপ্ত তির যে ঠিক লক্ষ্যেই বিঁধত, তার অভ্রান্ততম প্রমাণ পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বহুপঠিত চিঠিতে: 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে। ইহাদিগকে এই পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'

বিদ্যাসাগর আর অক্ষয়কুমার একই বছরে জন্মেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে, অক্ষয়কুমার অল্পশিক্ষিত কায়স্থ ঘরে। যে অপরিসীম দারিদ্র্য ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করে বিদ্যাসাগরকে বড়ো হতে হয়েছে, অক্ষয়কুমারকে তা সহ্য করতে হয়নি, যদিও তাঁকেও প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। আরেকটা বড়ো অমিল এই যে অভিভাবকের অতি-সজাগ অভিনিবেশ একেবারে শিশুকাল থেকে বিদ্যাসাগরের কেরিয়ার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। অপরদিকে অভিভাবকদের উদাসীনতায় অক্ষয়কুমারকে জীবনের অনেকগুলি বছর নষ্ট করতে হয়েছিল। তবে এরও একটা সুফল ফলেছিল। খানাকুল-কৃষ্ণনগর পণ্ডিত সমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়াটা অবধারিত ছিল। একেবারে শৈশব থেকেই তিনি একমুখী সংস্কৃত শিক্ষার পরিমণ্ডলে বড়ো হতে থাকেন। ইংরেজি, পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি শেখেন নিজের তাগিদে, পরে। অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষায় চর্চিত তৈরি-জমিতে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বীজ ছড়িয়েছিলেন পরিণত বিদ্যাসাগর। অপরদিকে, অল্পশিক্ষিত কায়স্থ ঘরের সন্তান অক্ষয়কুমারের ওইরকম কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। খানিকটা এলোমেলোভাবে হলেও তিনি ষোলো বছর বয়স থেকেই ইংরেজি সাহিত্য, অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা, আধুনিক গণিত, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন শিখতে থাকেন। ফলে বেশ অল্প বয়সেই নানা বিষয় নিয়ে বিদ্যাচর্চায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ছোটোবেলায় কিছু সংস্কৃত ও ফারসি শিখলেও, ভালো করে সংস্কৃত শেখেন বেশ বড়ো বয়সে। ততদিনে তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনে ভালোই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। অর্থাৎ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষায় ও আধুনিক বিজ্ঞানে চর্চিত মন নিয়ে সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছিলেন পরিণত অক্ষয়কুমার। যেন দুই পাহাড়চূড়া থেকে যাত্রা শুরু করে একই উপত্যকায় এসে মেলেন দুজনে।

এই ভিন্নধর্মী কিন্তু একমুখী প্রক্রিয়াদুটির কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ আমরা উভয়ের কর্মকাণ্ডে দেখতে পাই। আধুনিক বিজ্ঞান ও বেকনীয় এম্পিরিসিস্ট দর্শনের প্রগাঢ় অনুরাগী ও প্রবক্তা হলেও বিদ্যাসাগর এসব নিয়ে সরাসরি বিশেষ আলোচনা করেননি (কয়েক জন বিজ্ঞানীর জীবনী রচনা করা ছাড়া)। তাঁর বেকনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমরা পরোক্ষে যেটুকু জানতে পারি, তা ব্যালান্টাইনের সঙ্গে ও শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে

তাঁর বিতর্কের মাধ্যমে। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* বইতে অক্ষয়কুমার কিন্তু বার বার বেকনের, বেকনীয় দর্শনের, উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন চিঠিপত্রে ও বিতর্কে বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের, বিশেষত সাংখ্য ও বেদান্তের, বাস্তববিমুখ অবৈজ্ঞানিকতা নিয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলেও, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। আর অক্ষয়কুমার ঠিক ওই কাজটার জন্যেই বিখ্যাত/কুখ্যাত হয়ে আছেন। তৃতীয়ত, আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে অবহিত ও আগ্রহী হলেও হাতে-কলমে বিজ্ঞান চর্চার অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের ছিল না; অক্ষয়কুমারের ছিল। চতুর্থত, বিদ্যাসাগর যেখানে কৌশলগত কারণে বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন, অক্ষয়কুমার সেখানে বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন, অক্ষয়কুমার সেখানে বিধবাবিবাহকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানবতা-সম্মত বলে প্রমাণ করাটাই যথেষ্ট মনে করেন। ১৮৫২ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধর্ম্মনীতি' প্রবন্ধে তিনি এই যুক্তি দেন যে, স্ত্রী ও পুরুষকে একই নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করতে হবে, মনুষ্যচরিত্র স্ত্রী-পুরুষ ভেদে আলাদা নয়। একই আবেগ, একই কামনা-বাসনা, একই প্রলোভনের বশবর্তী উভয়েই। কাজেই বিপত্নীক যদি বিবাহ করতে পারে, তবে বিধবার বিবাহে আপত্তি কোথায়? তাঁর এই যুক্তি যে শাস্ত্রীয় অজ্ঞানতাবশত নয়, তার প্রমাণ হল মনুসংহিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য: 'সে সময়ের হিন্দু-সমাজ সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ ছিল না বটে, কিন্তু কোন কোন অংশে এক্ষণকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। উহার কি অধোগতিই হইয়া আসিয়াছে! এখন বিধবা-বিধবা রহিত, অসবর্ণ-বিবাহ রহিত, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ রহিত, বাল্য-বিবাহের প্রাদুর্ভাব, ও কৌলীন্য প্রথার পৈশাচী কাণ্ড! ফলতঃ ওই পুরাতন সমাজটি ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া এমন পচিয়া উঠিয়াছে যে, চতুর্দ্দিকে তাহার দুর্গন্ধে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না।'

নিজেকে ক্রমাগত শিক্ষিত করে তোলার সুনিয়মিত ধারা কোনোদিনই বন্ধ হয়নি অক্ষয়কুমারের জীবনে। ১৮৫৯ সালে ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* বেরোবার পর অনেকেরই মতো তাঁরও চিন্তাভাবনা একটা সুনির্দিষ্ট বাঁক নেয়। অল্পকালের মধ্যেই প্রাকৃতিক নির্বাচন-তত্ত্বে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন অক্ষয়কুমার। অনেকেরই মতো, এ ব্যাপারে 'ডারউইনের বুলডগ'টি এইচ হাক্সলি ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরু। সম্ভবত হাক্সলির দেখানো পথেই তিনি অবশেষে হয়ে ওঠেন অজ্ঞেয়বাদী, যাঁরা বলেন, ঈশ্বর থাকার যেমন কোনো প্রমাণ নেই, তেমনি না থাকারও কোনো প্রমাণ নেই, সুতরাং যুক্তিশাস্ত্রের দিক থেকে ও প্রশ্নটা মীমাংসার অযোগ্য।

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে এ ভাবনার সঙ্গে নাস্তিকতার প্রভেদ সামান্যই। অক্ষয়কুমার ঘোষণা করুন আর না করুন, তাঁর মধ্যবয়সে তিনি নাস্তিকই হয়ে গিয়েছিলেন। পাঁজি উল্লিখিত শুভদিনে সবাই যখন পুণ্যস্নান করবার জন্য গঙ্গার দিকে ছুটছে, তখন, বালির মতো রক্ষণশীল জায়গায়, সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি উলটো দিকে, পাড়ার কোনো পুকুরে চান করতে যেতেন! আবার, 'বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি অশুভ দিন ও অশুভক্ষণ' দেখে যাত্রা শুরু করতেন।

জাতের বিচারও তিনি বহুদিন উঠিয়ে দিয়েছিলেন। 'একবার দমদমা অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইবার সময়ে পোদ নামক এক নীচ জাতির হুঁকায় তামাক লইয়া বেড়াইতে যান। প্রত্যাগমন সময়ে অন্য একটি দোকানে গিয়া, তামাক খাইতে চাহিলে মুদী বলিল— তোমাকে হুঁকা দিব না। তুমি পোদের হুঁকায় তামাক খেয়েছ, তোমার জাত নষ্ট হয়েছে। উহাতে অক্ষয়বাবু তাহাকে বলিলেন— আমি জাত মানি না।' দ্বিতীয় ঘটনাটি নানা দিক থেকে শিক্ষাপ্রদ। অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, '১২৯০ সালের [১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ] ৭ই বৈশাখে অক্ষয়বাবুর সহিত ইঁহার গাড়িতে বেড়াইতে যাই। পথের মধ্যে একজন ধাঙ্গড়কে দেখিতে পাইয়া অক্ষয়বাবু গাড়ি দাঁড় করাইতে বলিলেন; এবং তাহাকে সন্নিকটে ডাকিয়া তাহাদের যাবতীয় আচার ব্যবহার ও তাহাদের দেবদেবীর পূজার্চ্চনার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আর দু-একজন ধাঙ্গড় আসিয়া জুটিল। তাহারা নিজ জাতীয় ব্যবহারাদি বর্ণন করিতে লাগিল।' 'পরে অক্ষয়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,— ইনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন, ইনি আমাদের ভেদ মারিয়াছেন।'

অক্ষয়কুমার সত্যিই জাতের 'ভেদ মারিয়াছিলেন।' 'নীচজাতীয়' ধাঙ্গড়দের তিনি নিছক গবেষণার উপাদান বা উপাত্ত বলে মনে করেননি, তাদের মানুষের মর্যাদা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) অক্ষয়কুমার দত্তর জীবনব্যাপী সাধনার মহত্তম ফসল। দ্বিতীয় খণ্ডটি যখন বেরোয়, তখন তিনি কার্যত পঙ্গু। অদম্য জেদে মুখে মুখে ডিকটেশন দিয়ে লেখাতেন। তাও কিছুক্ষণ পর পর অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় শুয়ে পড়তেন। এর তিন বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়।

ওই বইতে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে, উনিশ শতকী মানবতাবাদের উদারনৈতিক ধারণার সঙ্গে, যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মৌলিক বিরোধিতার কথাটা অকুণ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল। এদেশে ধর্ম-বিযুক্ত, বিজ্ঞান-নির্ভর মানবিকতার নির্ভীক প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর শেষ জীবনের নিঃসীম নিঃসঙ্গতার পিছনে এটি একটি বড়ো কারণ।

প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকাতে সাধারণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মানববিরোধী ভূমিকার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন। পৃথিবীতে ধর্মের কারণে 'যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত শোণিত-নিঃসারণ হইয়াছে, এত আর কিছুতেই হইয়াছে কি না সন্দেহ।' নতুন, পুরোনো, বিলুপ্ত, বিলীয়মান, 'সকল ধর্মই বিদ্বেষকলুষে কলুষিত হইয়া অধর্ম্মের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত ও পরিপালিত হইয়াছে।' প্রমাণ? উদাহরণ? 'হিন্দু ও ইরাণীদের বদ্ধমূল বিরোধ প্রসঙ্গ বেদ ও অবস্তাকে চির কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। খ্রিস্টানদের ক্রুসেড ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সংগ্রাম স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পমান হইতে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের চিরবদ্ধ বিসংবাদে বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।' এমনকী 'অনতিপ্রাচীন শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যেরূপ ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকালীন বৈদিক সম্প্রদায়ীদিগেরও তদনুরূপ বিরোধ ও বিদ্বেষ রচনা হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।'

আস্তিক ব্রাহ্মণরা নাস্তিক বৌদ্ধদের কীভাবে সংহার করেছিল, ইতিহাস থেকে তার উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি। 'কাশীর সমীপস্থ সর্নাথ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান। বুদ্ধ বর্তমান থাকিতেই সর্নাথের বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয়, বুদ্ধ প্রতিমূর্তি এবং অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। ওই সর্নাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন চারিদিকে এরূপ প্রভূত ভস্মরাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধদ্বেষী হিন্দুপন্থীয়েরা সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে। দক্ষিণাপথে কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদিগকে অত্যন্ত পীড়ন ও সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া স্বদেশ হইতে বহির্ভূত করিয়া দেন।' কুমারিলের সহায়ক 'সুধন্বা রাজা' বৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে সংহার করবার জন্য এই আদেশ দেন যে, 'একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপর দিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা পূজা করে না, তাহাদিগকে বধ কর।'

এর বিপরীতে সম্রাট অশোক সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'অশোক রাজার একখানি অনুশাসনপত্রে এরূপ লিখিত আছে যে, যাহাদের বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস নাই, তাহারাও আমার রাজ্য মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করুক।' ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবক্তাদের তীব্র ধিক্কার দিয়ে তিনি লেখেন: 'বৌদ্ধগণ-সংহারক আস্তিকপ্রবর ব্রাহ্মণকুল! এই নাস্তিক নরপতির সুপবিত্র গুণগ্রাম স্মরণ শ্রবণ কর, আর লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ধরণীগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাক!' ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিকরা এই সদুপদেশ কতটুকু শুনেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অশোক-প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগের কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে তাঁর সামাজিক ও মতাদর্শগত ঝোঁকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, তাঁর মতে ওই বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে 'মনুষ্য-কুলের স্বভাব-সিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম'র সংগতি আছে, ওটি 'মনঃকল্পিত নয়।' এখানে মনে হয় আউগুস্ত কোঁত-এর দর্শনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কোঁত জল্পনাভিত্তিক সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করেছিলেন, আর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' অক্ষয়কুমার বার বার বেকন ও কোঁত-এর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, 'কি হিন্দু, কি খ্রিস্টান, কি মোসলমান্ কেহই এ ধর্ম্মের বিরোধী নয়।... ঋষি, মুনি, পীর, পয়্গম্বর, সেন্ট, সেবিয়র ইঁহারা... এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও মহিমা প্রচার করিয়াছেন।' এমনকী একেবারে আধুনিককালে 'কোন্ত ও হিউম, ডারুইন ও হক্স্লি, মিল ও স্পেন্সর ইঁহারাও এই ধর্ম্মকে' খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি বৌদ্ধ ধর্মর 'অতিমাত্রা অহিংসাটি পরিবর্জ্জনে'র পরামর্শ দেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম তার প্রাক্তন মহিমা খুইয়ে কার্যত আর পাঁচটা ধর্মেরই মতন রূপ ধারণ করেছিল, সেটাও বলতে ছাড়েননি: 'বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারই করুন, আর অন্য অন্য নানা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধি-প্রাখর্য্যই প্রকাশ করুন, কিন্তু অনেকানেক নিকৃষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় পৌত্তলিক হইয়া রহিয়াছেন বলিতে হইবে। প্রতিমা-পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি-দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে।'

তবে দুই খণ্ডের দুই উপক্রমণিকার সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর অংশ হল বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক ধারার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। সামাজিক সংস্কারের পিছনে বিপুল সময় ব্যয় করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কাজ করে উঠতে পারেননি, সেই কাজটিই করেছিলেন তাঁর বন্ধু ও কমরেড অক্ষয়কুমার দত্ত। বিশেষ করে বেদান্ত ও সাংখ্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে কঠিন মন্তব্য করেছিলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা দেবার অবকাশ তিনি নিজে পাননি। সেই বিস্তারিত ব্যাখ্যাই আমরা পেয়ে যাই অক্ষয়কুমারের কাছে। এ যেন অনেকটা মার্কস-এঙ্গেল্সের মনন-বন্ধুত্বর কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

উপনিষদকে অক্ষয়কুমার মূলত সংশয়বাদের আধার হিসেবে দেখেছেন, অজ্ঞেয়বাদের সমর্থন পেয়েছেন তারই মধ্যে। ঔপনিষদিক অজ্ঞেয়বাদের সমর্থনে তিনি তলবকারোপনিষদের সেই বিখ্যাত সূত্রটি উদ্ধৃত করেন: 'তাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না, এবং মন চিন্তা করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না।... তিনি বিদিত অবিদিত সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন।' এর অজ্ঞেয়বাদ বিরোধী ব্যাখ্যা আমরা দেবেন্দ্রনাথ, এবং তৎসূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাই। অক্ষয়কুমারের মতে এঁরা পূর্ব নির্ধারিত মত বা ধারণাকেই প্রশ্রয়

দিয়েছিলেন, যুক্তিকে নয়। বস্তুত ওইরকম যুক্তিবিহীন পূর্বনির্ধারিত মত বা ধারণাকেই তিনি 'কুসংস্কার' আখ্যা দিয়েছিলেন।

ষড়্দর্শন সম্বন্ধে তাঁর বৈপ্লবিক মন্তব্যর উল্লেখ করে আপাতত এ প্রসঙ্গ শেষ করি— 'ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রায় কোনো দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন নাই। কপিলকৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ; পতঞ্জলি ঈশ্বরের অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা না বলিয়া বিশ্বনির্মাতা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসা পণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা কি?'

অক্ষয় দত্ত ছিলেন তখনকার 'প্রগতিবাদী' ইউরোপীয় বুর্জোয়া উদারনীতিবাদেরই মনন সহযাত্রী। শুধু বেকন নয়, নিউটন, লক, ফরাসি অঁসিক্লোপেদি গোষ্ঠী, হিউম, কোঁত, হুম্বোল্ট, জন স্টুয়ার্ট মিল, ডারউইন, হাক্সলি, (কিন্তু, লক্ষণীয়, হার্বার্ট স্পেন্সার নয়), এঁরাই তাঁর মননকে গড়ে তুলেছিলেন। ইউরোপের প্রতি, এবং সেই সুবাদে ইংলন্ডের বিজ্ঞানমনস্ক উদারনীতিবাদী মনীষীদের প্রতি, তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তার ওপর অধঃপতিত মুঘল রাজত্বের কুশাসনের হাত থেকে 'মুক্ত' করার জন্য আর পাঁচ জন ভারতীয়ের মতো তিনিও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু একইসঙ্গে ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালি কৃষক ও শ্রমজীবীদের কী ভয়ানক দুর্দশা হয়েছিল, তা নিয়ে তিনি বরাবর তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ও সরব ছিলেন। জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে, জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ প্রশাসনের মাখামাখি নিয়ে, ইংরেজ শাসনে বাঙালিদের ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি, অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে অকুতোভয়ে লিখেছেন। তিনি মনে করতেন, ভারতের সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ সে শাসনে অন্ধকার। ফলে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে দেশের শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধির দরুন যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা বঙ্গভূমিকে 'কতিপয় বাহ্যশোভায় শোভিত' করলেও 'আর দিকে সহস্রপ্রকার দুর্গতির চিহ্ন' প্রকট হয়ে উঠেছে। 'বাণিজ্যবৃদ্ধির দ্বারা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেরূপ বেতনভুক পরিশ্রমী লোকের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই।' দেশের উন্নতি বলতে তিনি বুঝতেন গরিব চাষিদের ও 'বেতনভুক পরিশ্রমী লোকের' উন্নতি। 'কতিপয় ব্যক্তি... উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া, উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এবং সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখী' হয়েছে দেখে তিনি সেটাকে দেশের উন্নতি বলে ভুল করেননি। দেশের সম্পদ বণ্টনের এই ভয়াবহ অসাম্য যে ইংরেজ রাজত্বের প্রত্যক্ষ অবদান, সে বিষয়ে তিনি মুক্তকণ্ঠ ছিলেন।

তাই বলে প্রযুক্তিকে বর্জন করার কথা বলেননি তিনি। আধুনিক বিজ্ঞানের মতো, আধুনিক প্রযুক্তিও তাঁর মতে অপরিহার্য। তাই 'যাঁহারা কলের গাড়ি আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাঁহাদের তৎসংক্রান্ত বিঘ্ন-নিবারণের উপায় প্রদর্শন' করার জন্য পুস্তিকা লিখেছিলেন: *বাষ্পীয় রথারোহীদের প্রতি উপদেশ* (১৮৫৫)। কিন্তু প্রযুক্তির প্রয়োগ আর দেশের মানুষের উন্নতিকে এক করে দেখেননি তিনি। বরং তিনি তাঁর মতো করে এটাই বুঝেছিলেন যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি যারা প্রবর্তন করছে, যারা তার সহযোগী হিসেবে সুবিধা লুটছে, তাদের শ্রেণিস্বার্থের সঙ্গে দেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ একেবারেই বেমিল। একদিকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, নতুন প্রযুক্তি ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব; অপর দিকে সমান স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, ওই প্রযুক্তির ফল নিয়ে যাচ্ছে বিদেশিরা ও তাদের নেটিভ সহযোগীরা— সাধারণ মানুষ কিছুই পাচ্ছে না, বরং নিপীড়িত হচ্ছে। ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধাহীন বক্তব্য: 'ইংরেজরা অধর্ম্ম-সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম্ম-সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন।'

১৮৫১ সালে তিনি এমন মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি যে 'রাজপুরুষেরা যেরূপ অসঙ্গত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। অন্য দেশে এ-প্রকার ঘটনা ঘটিলে একটা খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেমন দুর্দান্ত, ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে তেমন মৃদুস্বভাব পাইয়াছেন।'

এর বছর ছয়েক পরে সত্যিই তো খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার কি তার কিছু পূর্বাভাস পেয়েছিলেন? ১৮৫৭-র বিদ্রোহ নিয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য সুলভ নয়। ধরে নিতে পারি, অন্যান্য বাঙালি শিক্ষিত মানুষের মতো তিনিও ওই বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি; কিন্তু অন্যদের মতো তার সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন কি? ওইসময়ে অবশ্য তিনি খুবই অসুস্থ, তবু কোনো লেখকের লেখাতেই ওই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর কোনো মন্তব্য না থাকাটা একটু আশ্চর্যের।

একথা অবশ্য সত্যি যে সব কিছু সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের কোনো আশু বিকল্প দেখতে পাননি অক্ষয় দত্ত, কাজেই প্রবল রাজনৈতিক হতাশা গ্রাস করেছিল তাঁকে। রাজনারায়ণ বসুকে এক মর্মস্পর্শী পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ যাত্রা এইরূপ করিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।'

অক্ষয়কুমার কোনোদিনই খুব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। আন্দাজ বছর তিরিশ বয়সে তিনি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বেশ কাবু হয়ে পড়েন। মানসিক বিষাদের নানা পরিচয় তাঁর অনেক লেখাতেই পাওয়া যায়। তাঁর বিবাহিত জীবন একেবারেই সুখের ছিল না। পুত্রদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক মধুর ছিল না। সম্পত্তি নিয়ে বংশধরদের মধ্যে যে গণ্ডগোল লাগবার সমূহ সম্ভাবনা, অক্ষয় দত্ত তা বিলক্ষণ জানতেন। তাই তাঁর উইল শুরুই করেছেন এই কথা বলে যে 'কখন্ আমার মৃত্যু ঘটে তাহার স্থিরতা নাই। এ নিমিত্ত আমার পুত্রাদির পরস্পর ভাবি বৈষয়িক বিবাদ নিবারণার্থে... এই শেষ উইল করিলাম। ' উইলের নির্দেশ অনুযায়ী 'Indian Association for the Cultivation of Science নামক সভায়' কিছু টাকা দান করা হয়।

তাঁর অসুখকে 'জাতীয় দুর্যোগ' বলে অভিহিত করেছিল হিন্দু পেট্রিয়ট। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে এত লোকের এত চিঠি আসত যে সেগুলোর উত্তর দিতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তিনি। ঈশ্বর গুপ্ত 'সম্বাদ প্রভাকর'-এ একটি হৃদয়ভেদী রচনায় 'আমি যাঁহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এই ক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি' তাঁর আরোগ্য কামনা করেন। স্বয়ং ম্যাক্স মূলর তাঁর আরোগ্য কামনা করে চিঠি লেখেন। রাজনারায়ণ বসু চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এককালের সহকর্মী রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন, 'What a loss this country has sustained by your protracted ill health! No one mourns it more than I do.'

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের আশীষধন্য 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রস্তাব করা হয় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে অক্ষয় দত্তের একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন করা হোক, আজ পর্যন্ত সে মূর্তি স্থাপিত হয়নি। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লেখে: 'তিনি এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ এই তত্ত্ববোধিনীর পরিচারণায় একপ্রকার নষ্ট হয়। কি ভাষা, কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী।'

দেখা যাচ্ছে, ঋণ স্বীকারে সকলেই উন্মুখ; ঋণ শোধ করার ব্যাপারেই যা কিছু অনীহা।

ছবি : সুরজিৎ সরকার

বিড়ালের দশামুক্তি

অর্ধেন্দু সেন

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলোতে পদার্থবিদ্যার জগৎটা ওলটপালট হয়ে গেল। ক্ল্যাসিকাল ফিজিক্স বা সনাতন পদার্থবিদ্যা শুরু হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও-নিউটনের হাতে। দু-শো আড়াই-শো বছর ঘর্ঘরিয়ে চলেছে তার রথ। একটার পর একটা সমস্যার সমাধান হয়েছে। নিউটন দেখালেন পৃথিবীর যে টানে আপেল গাছ থেকে পড়ে সেই একই টান কাজ করে চাঁদের উপরও। চাঁদও সেই কারণে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। একই কারণে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে। শুধু ধরে নিতে হল যে দুই বস্তুর মধ্যে টানের মাত্রা হবে তাদের ভরের সমানুপাতে এবং তাদের দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে— দূরত্ব দু-গুণ হলে টান কমে চার ভাগের এক ভাগ হবে।

গ্রহের আবর্তন সংক্রান্ত তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন কেপলার কিন্তু তিনি তাঁর সূত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। নিউটনের মহাকর্ষণ তত্ত্বে সূত্রেরই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। গ্রহগুলি ঘুরছে সূর্যের টানে কিন্তু তাদের পারস্পরিক টানেরও প্রভাব আছে তাদের গতিবিধির উপরে। অঙ্কটা কষে দেখা গেল হিসেব মিলছে না। ভুলটা কার? নিউটনের না সৃষ্টিকর্তার? কারও ভুল নয়। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন সৌরমণ্ডলে এমন একটি গ্রহ আছে যাকে তখনও দেখা যায়নি। ঠিক অ্যাঙ্গেলে টেলিস্কোপ লাগাতেই ধরা পড়ে গেল সৌরমণ্ডলের অষ্টম গ্রহ— নেপচুন।

এরপর আর সন্দেহ থাকে? নিউটনের জয়জয়কার। কিন্তু আমি যখন লাট্টু ঘোরাই লেত্তির দরকার হয়। কোনো যোগাযোগ ছাড়াই পৃথিবী চাঁদকে, সূর্য পৃথিবীকে ঘোরাচ্ছে? কী করে হয়? নিউটন এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন আইনস্টাইন। তিনি তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে এই ধাঁধার নিরসন করেন। দুর্ভাগ্য যে এই তত্ত্ব বোঝা বড়োই কঠিন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যর এডিংটনকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরি নাকি এতই দুর্বোধ্য যে গোটা বিশ্বে মাত্র তিন জন সেটা বোঝেন? এডিংটন পালটা প্রশ্ন করেছিলেন তৃতীয় জন কে? এঁরা হয়তো জানতেন না যে আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় এই তত্ত্ব প্রকাশ করার এক বছরের মধ্যেই তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন বোস।

শুধু মহাকাশের ঘটনাবলি নয়, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অনেকটাই নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করল নিউটনের গতিবিদ্যা। ডেভিড বেকহ্যামের ফ্রি কিক ঠিক কোন পথে নেটে পৌঁছোবে তা গোলকিপার জানতে পারবে না। পদার্থবিদ পারবে। তাকে শুধু বলে দিতে হবে ফুটবলের ওজন কত সাইজ কত, কত জোরে মারা হয়েছে ইত্যাদি। বিজ্ঞানীদের ধারণা হল যা জানার তা সবটাই জানা হয়ে গেছে। ফরাসি বিজ্ঞানী লাপ্লাস বললেন এই মুহূর্তে বিশ্বের কোন বস্তু কোথায় আছে তার উপর কী বল কাজ করছে এ তথ্য জানা থাকলেই গুনে বলে দেওয়া যাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ। এই নির্ধারণ বাদে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো স্থান রইল না তবে সেটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াল না।

অতি বৃহৎ গ্রহ-নক্ষত্রের পরে বিজ্ঞানীর নজর পড়ল অতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর জগতে। তাঁরা বুঝলেন যে সব বস্তুই হল অণু-পরমাণুর সমষ্টি। এরা বিপুলবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক কিন্তু নিজেদের মধ্যে টান আছে বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না। ক্রমাগতই ধাক্কা খাচ্ছে একে অন্যের সঙ্গে। এই টান মহাকর্ষণের মতো নয়। এর নিয়মকানুন আলাদা। টান বেশি থাকলে পদার্থ হবে সলিড। কম থাকলে তরল। আরো কম হলে গ্যাস। তাপমাত্রা বাড়লে অণুর গতিবেগ বাড়বে। তাই তাপ বাড়ালে সলিড থেকে তরল। তরল থেকে গ্যাস। আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি। আনব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি। বয়েলের সূত্র চার্লসের সূত্র তাপগতিবিদ্যার বহু সূত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল আণবিক তত্ত্বে। ফাইনম্যানের মতে বিজ্ঞানের সব সূত্র হারিয়ে গেলেও সেগুলি পুনরুদ্ধার করা যাবে যদি শুধু এইটুকু জানা থাকে যে সব বস্তুই অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি।

নিউটনের পরে ব্রিটেনের বিস্ময়কর অবদান মাইকেল ফ্যারাডে। আঠারো শতকের শেষে ইটালির বিজ্ঞানী ভোল্টা

বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বানালেন। তার আগে ছিল শুধু গোল্ড-লিফ ইলেকট্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষানিরীক্ষা। এবার সম্ভব হল একটি তারের মধ্যে বিদ্যুৎ চালানো। একটা নতুন জগৎ খুলে গেল বিজ্ঞানীদের জন্য। দেখা গেল বিদ্যুৎপ্রবাহ আর ম্যাগনেটিজমের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলেন ফ্যারাডে।

ফ্যারাডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ইন্ডাকশন। কোনো তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়লে বা কমলে আশেপাশের তারে বিদ্যুৎ চলাচল শুরু হয়। কোলাঘাটে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে কোলকাতায় লাইট জ্বালানো যায় পাখা ঘোরানো যায় এই ইন্ডাকশনের সৌজন্যেই। বছর তিরিশ পরে ম্যাক্সওয়েল সাহেব ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিজমের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হাজির করলেন। তাঁর ইকুয়েশন থেকে বেরিয়ে এল ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের অস্তিত্ব। ১৮৮৬ সালে হার্তস দেখালেন কীভাবে এই তরঙ্গ উৎপন্ন করা যায় এবং অন্য জায়গায় তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। রেডিয়ো-টেলিভিশনের পথ খুলে গেল। উপরি পাওনা— দেখা গেল আলো এক ধরনের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ।

এই দিগ্‌বিজয়ের মধ্যেও কিছু কালো মেঘ দেখা যাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই। কয়েকটা সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না কিছুতেই। একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল আলট্রা-ভায়োলেট কেলেঙ্কারি। কীরকম? একটা লোহার খণ্ডের তাপমাত্রা বাড়লে তাপের বিকিরণ বাড়ে দ্রুত। তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি থেকে ২০০ ডিগ্রি হলে বিকিরণ বেড়ে যায় ১৬ গুণ। একইসঙ্গে বিকিরণে একটা গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের অনুপাত বাড়তে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যেকোনো গ্যাস অসংখ্য অণুর সমষ্টি। বিপুল বেগে ছুটছে অণুগুলি। তাদের সবার স্পিড কি এক? না। এক নয়। একটা বড়ো অংশের স্পিড গড় স্পিডের কাছাকাছি কিন্তু কিছু অণুর স্পিড খুবই কম। কিছু অণুর স্পিড প্রচণ্ড বেশি।

বিকিরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের পরিমাণ এক নয়। কিছুটা বিকিরণ হয় বেশ দীর্ঘ তরঙ্গের আকারে যাকে বলা হয় রেডিয়ো তরঙ্গ। বেশিটা হয় গড় দৈর্ঘ্যের কাছে আর অল্প কিছু থাকে খুব ছোটো দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। ভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ঠিক কতটা বিকিরণ হওয়া উচিত? হিসেব করে দেখেন র‍্যালে এবং জিনস। দেখে চমকে ওঠেন। দেখা যায় বড়ো দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ থাকবেই না। সব বিকিরণ হবে বিধ্বংসী আলট্রা ভায়োলেটের মতো ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। শস্যশ্যামলা পৃথিবীর মনুষ্য সভ্যতার কিছুই বাকি থাকবে না! এই সেই কেলেঙ্কারি।

কোথাও একটা ভুল হচ্ছে হিসেবে, কিন্তু কোথায়? ১৯০০ সালে জার্মান পদার্থবিদদের বার্ষিক সভায় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক একটা সমাধানের সূত্র দিলেন। আমাদের মেনে নিতে হবে বিকিরণ অ্যাটম থেকে নিঃসৃত হয় ছোটো ছোটো প্যাকেটে বা কোয়ান্টামে। তাই এই তত্ত্বের নাম হয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব। প্রতিটি প্যাকেটের এনার্জি হবে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিপরীত অনুপাতে। গ্যাসের বেলায় আমরা গুণে দেখতে পারি কত অণু কোনো একটা স্পিডে ছুটছে। বিকিরণের বেলাতেও আমাদের গুণে দেখতে হবে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কতগুলো কোয়ান্টাম আছে। সেই সংখ্যা থেকে পাওয়া যাবে এনার্জির পরিমাণ। সব ক্ষেত্রেই এনার্জির আদান-প্রদান হবে কোয়ান্টামের নিরিখে। কিন্তু কেলেঙ্কারি এড়ানো যাবে কী করে? ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোয়ান্টামে এনার্জি থাকবে বেশি তাই প্যাকেটের সংখ্যা কম থাকবে। খিচুড়ির লাইনে দাঁড়িয়ে কেউই যে বেশি পায় না তা নয় তবে সীমিত সংখ্যক লোকই পারে বেশি করে হাতিয়ে নিতে।

প্ল্যাঙ্কের কথা এতই অদ্ভুত যে কিছু লোক বুঝল না কিছু লোক বিশ্বাস করল না। পেট্রোল পুড়িয়ে যে এনার্জি পাওয়া যায় তা দিয়ে আমার গাড়ি ছোটে। কিন্তু গাড়ি তো হোঁচট খেতে খেতে ছোটে না। তার স্পিড তো ধাপে ধাপে বাড়ে না। আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্ব মেলে না তার কারণ একটাই। কোয়ান্টামের পরিমাণ এত ছোটো যে আমরা তার প্রভাব বুঝতে পারি না। কিন্তু যদি ইলেকট্রনের মতো একটা ছোটো কণার কথা ভাবি?

স্যার জে জে টমসন ছিলেন ইলেকট্রনের আবিষ্কর্তা। অ্যাটমের কোনো ইলেকট্রিক চার্জ নেই কিন্তু দেখা গেল অ্যাটম থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ বহন করে। তাহলে অ্যাটমের মধ্যে পজিটিভ চার্জও নিশ্চয়ই আছে। রাদারফোর্ড বললেন অ্যাটমের কেন্দ্রে আছে পজিটিভ নিউক্লিয়াস আর নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলো তার চারিদিকে ঘুরছে ঠিক যেন সূর্য আর তার গ্রহমণ্ডলী। ইলেকট্রনটা সত্যিই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরছে কিনা দেখার জন্য আমি তার উপর আলো ফেললাম। আলোর কোয়ান্টাম— যার নাম ফোটন— ইলেকট্রনে লেগে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে আমার চোখে। কিন্তু ইলেকট্রনকে ছিটকে দিতে একটা ফোটনের ধাক্কাই যথেষ্ট। ধাক্কা খাবার আগে যদি সে বৃত্তাকার কক্ষপথে থেকেও থাকে তারপর সে কোথায় তা নিজেও জানবে না— কেরোসিনের লাইনে দাঁড়ানো সেই বৃদ্ধের মতো।

কিন্তু ইলেকট্রন কোন পথে ঘুরছে আদৌ ঘুরছে কিনা যদি না দেখা যায় তাহলে কি বলা উচিত যে তারা ঘুরছে? একেবারেই না। কোয়ান্টাম জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিজ্ঞানীরা বুঝলেন ব্যাপারস্যাপার এতই অদ্ভুত যে

এক্সপেরিমেন্ট করে যা দেখা যায় না তা নিয়ে কিছু বলার উপায় নেই।

ইলেকট্রনের অবস্থান বুঝতে গেলে তার গতিবেগ এমনভাবে বদলে যাবে যে আগে কী ছিল তা আর বোঝা যাবে না। এই হল হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যায় কক্ষপথ জিনিসটা একটা বড়ো জিনিস। পৃথিবীর এবং মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা আছে বলেই মঙ্গলযান সেই গ্রহে পৌঁছোয়। নাহলে এক কোটি মাইল দূর দিয়ে বেরিয়ে যেত। কোথা থেকে কখন বোমা ফেললে সেটা লক্ষ্যে পৌঁছোবে সেকথা বলা যায় বলেই পদার্থবিদ্যার কদর বেড়েছে। বালাকোটের বোমা যদি পাঠানকোটে পড়ত? কক্ষপথ বা ট্রাজেকটরি কথাটা এতই জনপ্রিয় যে আমরা অর্থনীতির ট্রাজেকটরির কথা বলি রাজনীতির ট্রাজেকটরির কথা বলি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেরিয়ারের ট্রাজেকটরির কথা বলি। কোয়ান্টাম তত্ত্ব এসে সেই ট্রাজেকটরির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

একথা ভালোভাবে বোঝাবার জন্য রিচার্ড ফাইনম্যান বারে বারেই বলেছেন একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা যার নাম 'টু-স্লিট এক্সপেরিমেন্ট'— দুই ছিদ্র এক্সপেরিমেন্ট। পুকুরে পাথর ফেললাম। দেখলাম বৃত্তাকার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। একটা কাঠের পাটাতন ফেলে সেটাকে আটকালাম কিন্তু পাটাতনে দুটো ছিদ্র রেখে দিলাম। কী দেখব?

পাটাতনের ওদিকে দেখব দুই ছিদ্র থেকে বেরোচ্ছে দুটি তরঙ্গ। বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে 'ইন্টারফিয়ার' করছে। ইন্টারফিয়ার করার বাংলা হয়েছে ব্যতিচার। শুনতে ব্যভিচারের মতো। তার চেয়ে ইন্টারফিয়ারেন্স ভালো। ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যায় কণা আর তরঙ্গ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি ছিল না। আমরা স্থির জানতাম তরঙ্গ ইন্টারফিয়ার করতে পারে কণা পারে না। এই সূত্রেই মেটানো হয়েছিল একটা দেড়-শো বছরের বিবাদ। নিউটন মনে করতেন আলো হল কণার সমষ্টি। কেন? মূল কারণ— আলো সরলরেখায় চলে। হাইগেন্সের মতো কয়েক জন বলেছিলেন আলো হল তরঙ্গ কিন্তু নিউটনের কথাই মান্যতা পায়। ১৮০০ সালে টমাস ইয়ং একটা অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি দুটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেওয়ালে আলো ফেলেন। দেখা যায় ঠিক পুকুরের জলের মতো ইন্টারফিয়ারেন্স।

বিবাদ প্রায় মিটেই গিয়েছিল কিন্তু একশো বছর পরে আইনস্টাইন বললেন 'না। অত সোজা নয়। আলো তো প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম মানে ফোটনের সমষ্টি আর ফোটনগুলো কণার মতো। সঠিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো কোনো ধাতুর পাতে ফেললে সেই ধাতু থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। একে বলা হয় আলোক-বৈদ্যুতিক ক্রিয়া— ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট। আলো বুলেটের মতো বলেই পারে ইলেকট্রনগুলোকে বার করতে। ঢেউয়ের মতো হলে কি পারত? বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে বাধ্য হল ফোটন তরঙ্গও বটে আবার কণাও বটে।'

ফরাসি বিজ্ঞানী দ্য ব্রয় বললেন, 'ফোটনকে আমরা তরঙ্গ বলে জানতাম। এখন দেখছি সেটা কণার মতনও। ইলেকট্রন প্রোটনকে আমরা বলি কণা। তারাও কি তরঙ্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে?' কিছুদিনের মধ্যেই এক্সপেরিমেন্ট হল। পরিষ্কার দেখা গেল তরঙ্গের লক্ষণ। কোয়ান্টাম তত্ত্ব তাই কণাও মানে না তরঙ্গও না। মানে তরঙ্গ-কণা। একটা এক্সপেরিমেন্টে যেটা কণা হয়ে দেখা দেয় অন্য এক্সপেরিমেন্টে সেটাকে মনে হয় তরঙ্গ। কিন্তু কোনো এক্সপেরিমেন্টেই কণা আর তরঙ্গ একসঙ্গে দেখা যায় না।

ইন্টারফিয়ার করার আগে একটা তরঙ্গ দুটো ছিদ্রের মধ্য দিয়েই যায়। একথা মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না। কিন্তু একটা ইলেকট্রন? সে তো হয় এটা দিয়ে যাবে নয় ওটা দিয়ে? তাই যদি হত তাহলে ইন্টারফিয়ারেন্স হত না। তাই আমাদের মানতে হয় যে একটা ইলেকট্রনও দুটো ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যায়। ফাইনম্যানের মতে এ ব্যাপারে বোঝার কিছু নেই। শুধু মেনে নিতে হয়। 'বোঝা' মানে হল অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। ইলেকট্রনের আচরণ আমাদের কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। আমার এক্সপেরিমেন্ট আমি যদি দেখার ব্যবস্থা করি ইলেকট্রন কোন ছিদ্র দিয়ে গেল? করতেই পারি। কিন্তু তখন আর ইন্টারফিয়ারেন্স দেখা যাবে না। ইলেকট্রন তখন কণা। তখন আর সে তরঙ্গ নয়! ইলেকট্রন কি জানতে পারে আমি দেখছি? এছাড়া আর কীই-বা বলা যায়?

ইলেকট্রন আমরা চোখে দেখি না তাই তার বেলায় হয়তো এসব ভুতুড়ে কথা মেনে নিতেও পারি। কিন্তু একটা বিড়ালের ভাগ্য যদি এমনই একটা ইলেকট্রনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়? কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দুই জন্মদাতার একজন ছিলেন শ্রোয়ডিঙ্গার। তিনি একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবলেন। একটা বিড়ালকে একটা বাক্সে ঢোকানো হল। বাক্সে রইল একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এই পদার্থ থেকে লাগাতার বেরোবে আলফা পার্টিকল আর ইলেকট্রন। একটা রেকর্ডার রইল যেটা অল্প সময় চালু থাকবে। এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রন বেরোতেও পারে নাও পারে। বিড়ালের ভাগ্যের ব্যাপার। যদি বেরোয় রেকর্ডার সে ঘটনা রেকর্ড করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ি মেরে ভেঙে ফেলবে একটা ছোট্ট শিশি। শিশি-র ভিতরে রাখা বিষাক্ত গ্যাস বিড়ালটাকে মেরে ফেলবে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ইলেকট্রন ঠিক কখন বেরোবে সেটা একেবারেই অনিশ্চিত। রেকর্ডার চালু থাকার সময়ে বেরোতেও পারে নাও পারে। তাই বেড়ালটার মরার চান্স যেমন ভালো

বাঁচার চান্সও খারাপ না। বাক্সের ডালাটা খুলে দেখলেই বোঝা যাবে সে জীবিত না মৃত। কিন্তু প্রশ্ন হল যতক্ষণ না কেউ দেখছে সে কোন অবস্থায় থাকবে? আমরা কি না দেখেও বলতে পারি সে হয় জীবিত নয় মৃত? টু-স্লিট এক্সপেরিমেন্টের বেলায় জানি বলা যায় না যে ইলেকট্রন হয় এই ছিদ্র দিয়ে গেছে নাহয় ওইটা দিয়ে। যদি জানতে হয় ইলেকট্রন দুই ছিদ্রের কোনো একটা দিয়ে গেছে কিনা তাহলে ইলেকট্রনের উপর নজর রাখতে হবে। একইভাবে আমরা যদি জানতে চাই বিড়ালটা জীবিত না মৃত তাহলে বাক্স খুলে দেখতে হবে।

আমরা যতক্ষণ না একটি কণাকে দেখছি তাকে তার সব সম্ভাব্য অবস্থায় (স্টেটে) থাকতে হবে একইসঙ্গে। একে বলা হয় 'সুপারপোজিশন অফ স্টেটস'। তাকিয়ে দেখামাত্র কোনো একটা সম্ভাবনা সত্যি হয়ে যাবে। বাকিগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর ভাষায় বলা হবে কণার 'ওয়েভ ফাংশন কোল্যাপ্স করে গেল'। আমাদের বুঝতে যতই অসুবিধা হোক, এই হল কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর বিধান। একই লজিকে বিড়ালকেও থাকতে হবে জীবন্মৃত অবস্থায়। শ্রীরামচন্দ্র তাকে আশীর্বাদ করা পর্যন্ত অহল্যাকে এই অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল সহস্র বৎসর। তিনি কী অপরাধ করেছিলেন আমরা জানি। বিড়াল কী করেছিল শ্রোয়ডিঙ্গার সাহেব বলেননি। নিশ্চয়ই মাছের টুকরো নিয়ে পালাচ্ছিল। কোনো লঘু পাপে এত গুরু শাস্তি হত না।

ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা ঘটে চলেছে তাতে আমাদের করার কিছু ছিল না। আমাদের কাজ ছিল দেখা আর বোঝা। কোয়ান্টাম তত্ত্বে আমরা তাকিয়ে দেখি বলেই অনেক ঘটনা ঘটে। বা একভাবে না ঘটে অন্যভাবে ঘটে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের হাতে একটা রেডিমেড বিশ্ব তুলে দেননি। অনেকটাই করে দিয়েছেন। বাকিটা আমাদের করে নিতে হচ্ছে। বুঝতে হবে এইভাবে যে তেজস্ক্রিয় ইলেকট্রনের বেরোনো— শিশি-ভাঙা-গ্যাস বেরোনো— বিড়ালের মৃত্যু সবই হবে আমরা তাকিয়ে দেখায়। এমন নয় যে সব ঘটে বসে থাকবে আমরা শুধু দেখে নেব।

পছন্দ হল না? জানতাম হবে না। আমার মতো পেনশনাররা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন না যে তাঁরা সারা বছর জীবন্মৃত থেকে নভেম্বর মাসে লাইফ সার্টিফিকেট পেয়ে বেঁচে ওঠেন! আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে জন্মাইনি। আমরা হচ্ছি ইলেকট্রন আর নক্ষত্রের মাঝামাঝি সাইজের। তাই আমাদের নিয়মকানুন আলাদা। আমরা না দেখেই বলে দিতে পারি একটা বিড়াল হয় জীবিত নয় মৃত। বলতে হয় না জীবিতও আবার মৃতও— আমরা দেখলে হয় বেঁচে উঠবে নাহয় মরে যাবে। কিন্তু ছোটোদের এক নিয়ম বড়োদের অন্য নিয়ম এও তো ঠিক নয়। এই ফারাক মিটবে কী করে? একটা বিড়াল হল অযুত নিযুত ইলেকট্রন প্রোটনের সমষ্টি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমরা সমান সংখ্যক শ্রোয়ডিঙ্গার ইকুয়েশন লিখে ফলাফল বার করতে পারব এবং দেখব তার থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসছে নিউটনের গতিবিদ্যার তিন সূত্র। তখন আর ছোটোয় বড়োয় তফাত থাকবে না।

খবরে প্রকাশ একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে বিড়ালটাকে বাঁচানোর। ভূমিকম্প কখন হবে আগাম বলার বিদ্যা আমরা এখনও রপ্ত করিনি কিন্তু চেষ্টা চলছে। অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণের আগাম আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তেমনই অনেকে মনে করেন যে আমরা তাকিয়ে দেখলেই বিভিন্ন সম্ভাবনার সহাবস্থান থেকে একটা সম্ভাবনা সত্যি হবার ব্যাপারটা— ওয়েভ ফাংশনের কোল্যাপ্স করাটা— নিমেষে ঘটে না। সতর্ক থাকলে তার আগাম আভাস পাওয়া যায়। তাহলে তাতে হস্তক্ষেপ করতেই-বা বাধা কোথায়? যদি দেখি বিড়ালটা মরতে বসেছে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া কেন সম্ভব হবে না?

দেবীপ্রসাদের জার্মানযোগ

মানসপ্রতিম দাস

গল্পের কোনো বিকল্প নেই। চেনা গল্পও শুনতে ভালো লাগে অনেকসময়। তেমনই একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। চরিত্র মাত্র দুটো— উদ্দালক আর তাঁর ছেলে শ্বেতকেতু। বহু জায়গায় উল্লেখ হয়েছে এই আখ্যানের কিন্তু এখানে উদ্ধৃত করব দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' বই থেকে।

'...ছেলেকে তিনি বললেন, পনেরো দিন অন্নভক্ষণ বন্ধ রাখো, কিন্তু জল পান কোরো, কেননা জল থেকেই প্রাণের উৎপত্তি বলে এই পনেরো দিন জল পান করলে প্রাণসংশয় হবে না। ছেলে পনেরো দিন অন্নভক্ষণ বন্ধ রাখলেন, কিন্তু জল পান করে প্রাণরক্ষা করলেন। তারপর উদ্দালক বললেন, বারো বছর ধরে গুরুর কাছে যে-বেদ মুখস্থ করেছ তা আবৃত্তি করে শোনাও। শ্বেতকেতু চেষ্টা করেও বিফল হলেন; বললেন, কিছুই মনে পড়ছে না। পিতা বললেন, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি; পনেরো দিন কিছু খাওনি বলে তোমার মনের এই অবস্থা— উপনিষদের ভাষায় "মন" অন্নাভাবে (সাময়িকভাবে) লুপ্ত হয়েছে। এবার ফিরে গিয়ে পনেরো দিন ধরে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে আবার এসো। শ্বেতকেতু তা-ই করলেন। উদ্দালক বললেন, এবার বেদ আবৃত্তি করে শোনাও। এবার দেখা গেল, ছেলের বেদ মনে পড়েছে; আবৃত্তি করতে কোনো অসুবিধে হল না। উদ্দালক বললেন, তাহলে তো দেখতেই পাচ্ছ, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি।

একেবারে যাকে বলে হাতে-নাতে প্রমাণের আয়োজন। অন্ন-র বর্তমানতায় মনও বর্তমান; অন্নর অবর্তমানতায় মন বিলুপ্ত হয়। তাহলে "মন" বলে যা উল্লেখ করা হয় তা অন্ন থেকেই উৎপন্ন।' (অনুষ্টুপ, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ১৩৪)

গভীর মনোনিবেশ ছাড়াই বোঝা সম্ভব যে প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরোনো দুটো চরিত্রের সংলাপ ব্যবহার করে একটা মত স্থাপনের চেষ্টা রয়েছে এখানে। সে মতের নাম বস্তুবাদ আর ভারতের দর্শনচর্চার ইতিহাসে যে কয়েক জন পণ্ডিত এটা নিয়ে বিস্তারিত লেখাপড়া করেছেন তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অগ্রগণ্য। এর অর্থ এই নয় যে তাঁর মত বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে। এই প্রবন্ধের মধ্যে তেমন কোনো আবেদনও নেই। বরং সরাসরি জার্মান যোগে যাওয়ার আগে জার্মানির কাছেই থাকা আর এক রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার একজন দার্শনিককে এনে ফেলা যাক আলোচনায়।

আন্দাজ করার স্বাভাবিক ঝোঁক আছে যাঁর তিনি তো ধরেই ফেলেছেন যে ইনি দার্শনিক কার্ল পপার না হয়ে যান না। এই সেই পপার যিনি বিজ্ঞানে বহু দিন ধরে চলে আসা দর্শনকে বাতিল করে নতুন ভাবনার প্রচলন করেন। সপ্তদশ শতকের শুরুতে ফ্রান্সিস বেকন দাঁড় করিয়েছিলেন বিজ্ঞানের নিয়মনীতির একটা কাঠামো। প্রকৃতিকে দেখবে মানুষ, যা দেখেছে সেটাকে এক সুতোয় বাঁধতে উপস্থিত করবে একটা আলগা সূত্র, আরো অনেক বার প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ করে সে সূত্রকে শক্তপোক্ত করবে, সূত্রটা আরো বড়োসড়ো আকার নেবে আর যেসব সূত্রের পক্ষে প্রমাণ নেই সেগুলো বাতিল হবে। বেকনের এই ধারণা তখনকার সময়ের নিরিখে যথেষ্ট বৈপ্লবিক ছিল। কিন্তু বিপ্লব কি আর থেমে থাকে! বছর কুড়ি পরে ডেভিড হিউম বলেন, মানুষ যা দেখে তার ভিত্তিতে কার্যকারণ বোঝা যায় না। দেখলাম আর সূত্রে গেঁথে ফেললাম— এর মারাত্মক বিপদ আছে। যাই হোক, সময়ের সঙ্গে এমন আলোচনায় অন্য একরকম মোচড় দিলেন ইমানুয়েল কান্ট। তিনি মানুষের মনটাকে বড়ো করে তুললেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখাশোনার মান গেল নেমে। জন স্টুয়ার্ট মিল কার্যকারণ বোঝার খান পাঁচেক নিয়ম সাজিয়ে দিলেন, পরে অগাস্ট কোঁৎ আনলেন পজিটিভিজ্‌ম যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করে সেটাকে প্রমাণ করার দায় এসে পড়ল বিজ্ঞানীর উপর। এমনভাবে চলতে চলতেই পপারের সময়ে পৌঁছোল আমাদের সভ্যতা। তিনি বিজ্ঞানের সূত্রকে গ্রহণ করার জন্য কয়েকটা সূত্র দিলেন। এর মধ্যে একটা বেশ বেয়াড়া রকমের। ইংরেজিতে একে বলে falsification. বিজ্ঞানের কোনো একটা সূত্র যদি কেউ প্রকাশ করে তবে সেটাকে ভুল প্রমাণ করার সুযোগ রাখতে হবে। পছন্দমতো প্রমাণ সাজিয়ে যে সূত্রকে টিঁকিয়ে

রাখা হয় তার জন্য কোনো মায়াদয়া নেই পপারের। এই নীতিতেই আমাদের সভ্যতার অন্যতম দর্শন মার্কসবাদের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছেন পপার। মার্কসবাদীরা নিজেদের সুবিধেমতো প্রমাণ তুলে এনে তত্ত্বটাকে সবসময় 'ঠিক' বলে বিবৃতি দেন। এখন দার্শনিক দেবীপ্রসাদ নিজেও মার্কসবাদী। কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৪) মোটামুটিভাবে দেবীপ্রসাদের সমসাময়িক। সামনাসামনি উপস্থিত হলে তিনি হয়তো-বা দেবীপ্রসাদের সাজানো প্রমাণের প্রতি সন্দেহ বর্ষণ করতেন, বলতেন উলটো ব্যাখ্যার দৃষ্টান্তগুলো একবার দেখি তো!

এখানে উল্লেখ করা বইতে দেবীপ্রসাদ উলটো ব্যাখ্যা বা ভাবনার কথাও বলেছেন। বিরোধিতা করার লক্ষ্যেই নিয়ে এসেছেন কয়েক জনের কথা যাঁরা উদ্দালককে 'বস্তুবাদী' শিবির থেকে টেনেটুনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন 'ভাববাদী' শিবিরে। ভাব যেখানে বড়ো সেখানে কী দেখলাম, কী শুনলাম তার খুব একটা গুরুত্ব নেই। আত্মাই হল বিবেচ্য এবং মন হল সব কিছুর জন্মভূমি। এমনই একজন ভাববাদী হলেন জয়ন্তভট্ট। তিনি তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' বইতে চার্বাকদের মতকে এনেছেন। চৈতন্যের মত একটা বিষয় যা ধরা যায় না তার সঙ্গে ধরা-ছোঁয়া যায় এমন জিনিস যেমন খাবার বা পথ্য মানে ভূতবস্তু, তার যোগ ঘটিয়েছিলেন চার্বাকরা। ভূতচৈতন্যবাদী বলা হয়েছে চার্বাকদের। সেই ভূতচৈতন্যবাদী মতটাকে জয়ন্তভট্ট হেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন দেবীপ্রসাদ। কিন্তু জয়ন্তভট্ট ঠিক যে কী বলেছেন তার বিস্তার ঘটাননি নিজের বইয়ের পাতায়। কাদের জন্য বইটা লিখছেন সেটা মাথায় রেখেই বোধহয় এমনটা করা হয়েছে। আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে প্রাচীন সময়ের জয়ন্তভট্ট এক্ষেত্রে একজন বিপক্ষ, তাঁর মত খতিয়ে দেখলে হয়তো falsification-এর গূঢ় কাজটা খানিকটা করা যেত। একইসঙ্গে দেবীপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন শঙ্করাচার্য আর রামানুজের কথা। কী বলেছেন এই যুগল? সেটা জানার আগে বোঝা দরকার উদ্দালকের একখানা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সেটাও তিনি বলেছিলেন নিজের ছেলেকে। দেবীপ্রসাদের বই থেকে আবার কিছুটা তুলে দিই,

'..."ছান্দোগ্য উপনিষদ"-এ উদ্দালকের বক্তব্যটি একটা আখ্যানের রূপে প্রকাশিত। ছেলে শ্বেতকেতুকে উপদেশ দেবার আখ্যান। উপদেশের মূল কথা হলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে 'নিছক সৎ' বলেই উল্লেখ করতে হবে। এই 'সৎ' থেকে পর্যায়ক্রমে আগুন, জল এবং অন্নর উৎপত্তি। আগুনের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে 'বাক', জলের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে প্রাণ এবং অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে মন উৎপন্ন হয়।...' (ওই)

যুগ যুগ ধরে অনুসন্ধিৎসু মানুষ চেষ্টা করেছে সেই আদি বস্তু বা কণা আবিষ্কার করার যা দিয়ে বাকি সব পদার্থ তৈরি হয়েছে। আজ কণা পদার্থবিজ্ঞান আমাদের একটা জায়গা অবধি নিয়ে এসেছে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম গঠনগত একক পরমাণু, এটা জেনে নিশ্চিন্ত ছিলাম আমরা। এর পর পরমাণুর থেকেও ছোটো কণা আবিষ্কারের একটা প্রবাহ শুরু হল। নিউট্রন-প্রোটন-ইলেকট্রন তুচ্ছ বলে মনে হল। সেগুলোর গঠনে আরো ছোটো কণা আছে জানলাম। পরস্পর পাশাপাশি থাকার জন্যেও যে এগুলো কণা বিনিময় করে তাও বলা হল আমাদের। এখানেও শেষ হল না ব্যাপারটা। এবার জানছি যে অতি সূক্ষ্ম সুতোর মতো একটা কিছু সব কণার গঠন করে। কিন্তু এসব তো হাল আমলের ব্যাপার যেখানে বিশাল আকারের বহু যন্ত্র সাহায্য করছে প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে। আড়াই হাজার বছর আগে কিছু প্রত্যক্ষ এবং কিছু অনুমান ছাড়া তো কিছু ছিল না মানুষের হাতে। এই অনুমান কীভাবে হবে তা অবশ্য নির্ভর করে কে ভাবছে বা তার মনের ওপর কী কী প্রভাব মেলে বসে আছে। প্রাচীন গ্রিসে ডিমোক্রিটাস সব কিছুর মূলে পরমাণু নামে অচেতন কিছুর একটা কল্পনা করেছিলেন। ক্ষমতাশালী দার্শনিক প্লেটো একদম পছন্দ করতেন না এসব ভাবনা। তাঁর চেষ্টায় ডিমোক্রিটাসের রচনা সম্ভার নাকি পোড়ানো হয়েছিল। এমনটা অনেকের মত, দেবীপ্রসাদেরও তাই বিশ্বাস। এদিকে এদেশে ষড়দর্শন বলে খ্যাত ছ-টা ভাববাদী দর্শনের অন্যতম যে বৈশেষিক দর্শন তার প্রণেতারা পরমাণুর ভাবনায় আস্থা রাখেন। অর্থাৎ ভাববাদী হয়েও, পরম ব্রহ্মের মতো একটা অলৌকিক চিন্তায় আস্থা রাখা পণ্ডিতদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে অচেতন ক্ষুদ্র কণা থেকে দেহ-মন-চৈতন্য এসবের উৎপত্তি। গোটা পার্থিব জগতের উৎপত্তি। উদ্দালকের 'সৎ' এই একই গোত্রের। বারো বছর ধরে গুরুগৃহে শিক্ষা শেষ করে যখন পুত্র শ্বেতকেতু ফিরল বাবার কাছে তখন তার ঔদ্ধত্য তাক লাগানোর মতো। এই অভিমান ভাঙতে উদ্দালক জিজ্ঞাসা করলেন যে শ্বেতকেতু সেই একটা বিষয় সম্পর্কে জেনেছে কিনা যা থেকে বাকি সব জিনিসের উৎপত্তি। শুনে তো শ্বেতকেতু দিশেহারা। এমন কিছু তো শোনেনি সে। তখন উদ্দালক বললেন 'সৎ' এর কথা। শেষে ছোট্ট করে এমন একটা সূত্র ধরালেন যা হয়ে রইল আজকের ভাষায় 'কোড' হয়ে। আবার দেবীপ্রসাদের বই থেকে উদ্ধৃতি,

'...কথাটা ছেলের মাথায় ভালো করে ঢোকাবার জন্য উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন: তুমি আসলে ঐ সৎ-ই "তৎ ত্বম্ অসি"। চলতি কথায় আজকাল যাকে বলি একটা ফর্মূলার মতোই।...' (ওই, পৃ. ১৩৬)

এই যে সৎ নিয়ে উদ্দালকের অভিমত এটাকে বেদবিশারদরা জুড়ে দিয়েছেন ব্রহ্মের সঙ্গে। কিন্তু দেবীপ্রসাদ আবার প্রমাণ সামনে এনে বলছেন, লিখিত প্রমাণ যা পাওয়া যায় তাতে

উদ্দালক কখনোই ব্রহ্ম বা আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের উদাহরণ এনেছেন দেবীপ্রসাদ। সেখানে উদ্দালককে যখন প্রশ্ন করা হল যে আত্মা বলতে তিনি কী বোঝেন তখন তাঁর সোজাসাপটা জবাব হল যে তাঁর কাছে এই পৃথিবী হল আত্মা। দেবীপ্রসাদ শঙ্কর-রামানুজকে এই বলে দুষেছেন যে নানা উপায়ে অযথাই উদ্দালককে ভাববাদী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। এখন একথা তো অনস্বীকার্য যে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির ভাষ্য পড়ে নানা জনের পক্ষে নানা মতে পৌঁছোনো সম্ভব। নিজের ব্যাখ্যাকে পুষ্ট করার জন্য প্রত্যেকেই অন্যান্য সূত্র থেকে সমর্থন আদায় করে থাকেন, সেটাও চালু ব্যবস্থা। এমন অবস্থায় কার ব্যাখ্যা নিখুঁত আর কার বিশ্লেষণে যুক্তিহীনতা রয়েছে তা প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু পপার সাহেবের চাহিদা অনুযায়ী falsification-এর সুযোগ কোথায় রয়েছে তা বোঝাতেই পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তির সামান্য অবতারণা করা হল।

অবশ্য পাঠক হয়তো এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন জার্মান যোগ খুঁজে না পেয়ে। বস্তুতপক্ষে এই উদ্দালককে ঘিরেই এসেছে জার্মান যোগের উল্লেখ। উদ্দালকের কাহিনি বলতে গিয়েই দেবীপ্রসাদ এনেছেন দুজন জার্মান পণ্ডিতের কথা,

'... ইতিপূর্বে জ্যাকবি (H. Jacobi) এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ওয়ালটার রুবেন (Walter Ruben) বিচারমূলকভাবেও বিষয়টি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমাদের আধুনিক বিদ্বানেরা উপনিষদ-এর প্রথাগত ব্যাখ্যায় এমনই অভ্যস্ত যে জ্যাকবি ও রুবেন-এর মতো দিকপাল ভারততত্ত্ববিদদের বিচারকে একান্ত অনাদরের কুক্ষিতে গোপন রাখা ছাড়া তাঁদের যেন গত্যন্তর নেই। মোটের উপর তাই জ্যাকবি ও রুবেন-এর বিচার বিশেষ সুবিদিত নয়।...' (ওই, পৃ. ১৩২)

ওয়ালটার রুবেন

১৮৯৯ সালে হামবুর্গে জন্মান ওয়াল্টার রুবেন। বাবা পেশায় বণিক, ধর্মে ইহুদি, মা ছিলেন খ্রিস্টান। প্রাচীন গ্রিসের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি টান ছিল বাবার, সেটা দেখে ওয়াল্টার রুবেন (এর পরে শুধুই রুবেন) ঠিক করলেন যে অন্য কোনো একটা প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন। ষোলো বছর বয়সে সংস্কৃত পড়া শুরু করলেন তিনি। এর বছর দুয়েক পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে দেখা গেল রুবেনকে। জোর করে সেই কিশোর ছেলেকে তুলে নিয়ে যায়নি কেউ, স্বেচ্ছায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধে। কিন্তু একদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা আর অন্যদিকে সোভিয়েত বিপ্লবের দৃষ্টান্ত কিশোর রুবেনের মনকে এমনভাবে পালটে দিল যে সে আরো বহু চিন্তাশীল জার্মানের মতো যুদ্ধের কঠোর বিরোধী হয়ে উঠল। একইসঙ্গে সে আকৃষ্ট হল বামপন্থী শিবিরের ভাবনাচিন্তার দিকে।

১৯১৯ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডোলজি বা ভারততত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন রুবেন। শিক্ষক হিসেবে পেলেন হার্মান জ্যাকবিকে যাঁর কথা উল্লেখ করেছেন দেবীপ্রসাদ। রামায়ণ রচনার ইতিহাস নিয়ে প্রথম দিকে চর্চা করলেও পরের দিকে রুবেন সরে যেতে থাকেন ভারতীয় দর্শনের দিকে। ১৯৩১ সালে ফ্র্যাঙ্কফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করলেন তিনি। একইসঙ্গে শুরু করলেন মার্কসবাদের গভীর পঠনপাঠন। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ফ্যাসিস্ত সরকার আসার পর থেকে রুবেন বেশ বুঝতে পারছিলেন যে পরিস্থিতিটা এগোচ্ছে যুদ্ধের দিকে। হিটলারের শাসনের বিরোধিতা করলেন তিনি কিন্তু এর পরে জার্মানিতে থাকা তাঁর পক্ষে সুবিধেজনক রইল না। তাঁর আর এক ভূতপূর্ব শিক্ষক হার্মান লেডার্সের সহযোগিতায় তুরস্কের আঙ্কারায় চাকরি পেলেন রুবেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সবে খোলা হয়েছে ইন্ডোলজি বিভাগ। স্ত্রী আর দুই পুত্রকে নিয়ে তিনি একরকম পালিয়ে গেলেন জার্মানি থেকে। ভারতে আসার প্রথম সুযোগ রুবেন পেলেন ১৯৩৬/১৯৩৭ সালে। জনজাতির জীবনচর্যার পথ ধরে ভারতের সংস্কৃতি বুঝতে তিনি এলেন ছোটোনাগপুরে। একইসঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতন গেলেন, দেখা করলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। আশ্রমের আশেপাশে থাকা সাঁওতালদের সংস্কৃতি বোঝার চেষ্টা করলেন এই ভারততত্ত্ববিদ। আঙ্কারায় ফিরে নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলেন রুবেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালে আরো অনেক জার্মান শরণার্থীদের সঙ্গে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে বন্দি করে রাখা হল বিশেষ শিবিরে। সেখানে আর যাই হোক বিদ্যাচর্চার সুযোগসুবিধে ছিল না।

১৯৪৯ সালে সদ্য তৈরি হওয়া জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের (পূর্ব জার্মানি) আমন্ত্রণে সপরিবারে বার্লিনে ফিরলেন রুবেন। পরের বছর হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডোলজির পূর্ণ অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন তিনি। ১৯৫৯ সালে দেশের অন্যতম সেরা সম্মান Natioalpreis-তে ভূষিত হন রুবেন। ১৯৬২ সালে ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অফ দ্য অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের অধিকর্তা হন তিনি। এই পর্বে দু-বার তিনি অ্যাকাডেমিক ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে ভারতে যান। প্রথামাফিক অবসরের পর নিজের প্রকাশনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন রুবেন। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে মৃত্যু হয় তাঁর।

রুবেনের কাজ

বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় আর কৌশিতকী— এই পাঁচটা উপনিষদ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেন রুবেন। পাঁচ প্রজন্মের একশো ন-জন দার্শনিককে আলাদা করে শনাক্ত করেন

তিনি যাঁদের সময়কাল হল সাত-শো থেকে সাড়ে পাঁচ-শো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। বৈদিক শাস্ত্র রচনার শুরুতে মানুষের প্রবল আস্থা ছিল মন্ত্র পড়ে আর আহুতি দিয়ে অলৌকিক কিছু ঘটানোর, জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান, ভোগবিলাসের সামগ্রী পাওয়ার প্রক্রিয়ার উপর (magico mythological manner of thinking). এরপর পণ্ডিত মানুষদের একটা অংশ ভাবতে লাগলেন অন্যভাবে। মানুষ বা সার্বিকভাবে এই জগতের উৎপত্তির সূত্র খুঁজতে শুরু করলেন তাঁরা, এল পরম ব্রহ্মের ধারণা ইত্যাদি। এটাকেই দর্শনের যুগে উন্নতি বলে মানেন গবেষকরা। এই যুগটা শুরু হল কোথায় তার নির্দেশ দিয়েছেন রুবেন। একইসঙ্গে ভাববাদ এবং বস্তুবাদের মধ্যে যে পরিষ্কার দ্বন্দ্ব দেখা দিল সমাজে তা বোঝাতে তিনি নিয়ে এলেন উদ্দালক আর যাজ্ঞবল্ক্যকে। রুবেনের এক ইংরেজি রচনা থেকে দুটো মাত্র পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাক—

'... The progressive modern scientist agrees with Uddalaka that matter is eternal, without beginning and always changing its form. But he cannot understand Yajnavalkya who teaches religion rather than scientific philosophy.' (Uddalaka and Yajnavalkya: Materialism and Idealism, carvak4india.com)

রুবেনের শিক্ষক জ্যাকবি বৃহদারণ্যক উপনিষদের সূত্র থেকে এর আগেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বয়সে উদ্দালক বড়ো কিন্তু তাঁর ভাষ্য সংকলিত হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য সংকলনের পরে। সেই তথ্য নিয়ে এগিয়েছেন রুবেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে উদ্দালক ভারতবর্ষের প্রথম 'দার্শনিক' এবং তিনি হলেন একজন প্রাচীন বস্তুবাদী, ইংরেজিতে hylozoist. এই শব্দটা আমাদের রোজনামচায় নেই, তাই অর্থটা বোঝা দরকার। Hylozoist মানে সেই ব্যক্তি যিনি বিশ্বাস করেন যে সব পদার্থের মধ্যেই রয়েছে প্রাণ। উদ্দালকের উচ্চারিত 'সৎ' তাহলে প্রাণময় এবং তার থেকে তৈরি হওয়া বাকি সব পদার্থের মধ্যেই রয়েছে প্রাণ। গ্রিক দার্শনিক থ্যালেসের সঙ্গে উদ্দালকের তুলনা করেছেন রুবেন। থ্যালেস অবশ্য এসেছেন উদ্দালকের পরে কিন্তু তিনিও বিশ্বাস করতেন সব বস্তুর প্রাণময়তার এই ধারণায়। রুবেনের অভিমত হল, চিনেও মোটামুটি একই সময়ে এমন বস্তুবাদী ধারণার বিকাশ হয়েছিল। এভাবেই যাজ্ঞবল্ক্যকে তিনি তুলনা করেছেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রিক দার্শনিক পারমেনিদেসের সঙ্গে। প্রাচীন শহর Elea-তে তিনি নিজের দর্শনের যে ধারা শুরু করেছিলেন যেখান থেকে উঠে এসেছেন জেনো বা মেলিসাস, তার সঙ্গে তুলনীয় যাজ্ঞবল্ক্যের ধারা। চিনের সর্বপ্রাচীন ভাববাদী ধারার বিকাশও সমসাময়িক। এভাবেই একজন প্রকৃত ভারততাত্ত্বিকের মতো রুবেন ভারতকে সূচনাবিন্দু ধরে নিয়ে বাকি পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাস বুঝতে চেয়েছেন। তবে রুবেন বিশ্বাস করতেন যে ভারতে বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব। এর প্রধান কারণ বস্তুবাদী দর্শনের পুঁথি বা প্রমাণ হয় কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে আর নয়তো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ বা হরিভদ্রের ষড়দর্শনসমুচ্চয় সূত্র হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হয়নি তাঁর কাছে। এমন বইতে সরাসরি বস্তুবাদী ধারণার নথি নেই, যা আছে তা বিরোধিতার কিছু উল্লেখ। তেমন বিরোধিতা খুঁজে নিয়ে একটা গোটা কাহিনি লিখে ফেলা অনুচিত বলে মনে করতেন রুবেন। দেবীপ্রসাদের ধারণাও প্রবাহিত হয়েছে এই খাতে।

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রথম বার দুজনের সাক্ষাৎ হয় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ পালনের সময়। সেসময় ভারতে আমন্ত্রিত হন রুবেন। তাঁরই ছাত্র হিলট্রুড রুস্তাউ Walter Ruben on Ancient Indian Materialism and the Beginning of Philosophy in India নামে এক প্রবন্ধ লিখেছেন (www.academia.edu) যার থেকে রুবেনের জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। এই প্রবন্ধে সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা অন্যত্রও দেখতে পাই রুস্তাউকে। ১৯৮০ সালে রুবেনের আশিতম জন্মবর্ষ পালন উপলক্ষে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে Marxism and Indology বিষয়ক এক সভা হয়। এই উপলক্ষে যে সংকলন প্রকাশিত হয় তার সম্পাদনা করেন দেবীপ্রসাদ। সেখানে মাস্টারমশাই রুবেনের প্রতি রুস্তাউয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেখতে পাই আমরা। রুস্তাউ নিজে সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা তা অবশ্য জানা যাচ্ছে না এই সংকলন থেকে। যাই হোক, রুস্তাউ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন দেবীপ্রসাদ ও রুবেনের অভিন্ন লক্ষ্যের কথা। উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন,

'Walter Ruben and Debiprasad Chattopadhyaya have a lot in common: The declared aim of both scholars was to give materialism its proper place in the history of Indian philosophy....'

দুজনেই চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বাইরে গিয়ে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ খোঁজার চেষ্টা করেছেন, অলৌকিক কোনো এক সত্তার উপস্থিতিকে বাতিল করে বস্তুকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এমন ভাবধারা শনাক্ত করার জন্য পরিশ্রম করেছেন। এটা উল্লেখ করেছেন রুস্তাউ। তবে তাঁর লেখায় সবথেকে যেটা

আকর্ষণীয় তা হল লোকায়ত ঘিরে দেবীপ্রসাদ আর রুবেনের মতামতের আলোচনা।

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৫৬ সালে প্রকাশ করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন'। ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় পরে, ১৯৫৯ সালে। People's Publishing House প্রকাশ করে 'Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism'. ১৯৬৩ সালে এই বই সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন রুবেন। দেবীপ্রসাদের কাজকে মর্যাদা দিয়ে তিনি বলেন, এই বইকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। নিজের গবেষণায় যা খুঁজে পেয়েছেন তিনি তার প্রতিফলন দেবীপ্রসাদের লেখায় দেখতে পান। তিনি একমত হন বইয়ের বহু বিষয়ের সঙ্গে। ঋক বেদের স্তোত্রগুলোর মধ্যে যে অলৌকিক কিছু ঘটানোর আগ্রহই প্রধান, তাতে ভক্তি খোঁজা বৃথা তা স্বীকার করেন দুজনেই। আবার মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যে ঋক বেদের সময় বা তারও আগে উপস্থিত ছিল এ নিয়ে দেবীপ্রসাদের মতোই নিঃসন্দেহ রুবেন। এই অভিন্ন ভাবনার মধ্যে আরো রয়েছে প্রাক্-বৈদিক সভ্যতায় উপজাতি সমাজের টোটেম বিশ্বাস। এই উপজাতির মানুষরাই কীভাবে নতুন সভ্যতায় অত্যাচারিত শ্রেণি হিসেবে টিঁকে রইল সে ব্যাপারেও রুবেন একমত হন লেখকের সঙ্গে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন সমালোচক রুবেন। আগের মাতৃতান্ত্রিক, কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে সরাসরি পশুচারণে অভ্যস্ত বৈদিক সভ্যতার মানুষদের সংঘাত দেবীপ্রসাদ যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন তাতে সমস্যা আছে বলে মনে করছেন তিনি। আরো সূক্ষ্মতার দিকে নজর দেওয়ার আবেদন জানান তিনি, বলেন যে বৈদিক সভ্যতার সব মানুষ পশুচারণে অভ্যস্ত ছিল তা বলা ঠিক নয়। তারা কিছু পরিমাণে চাষবাসও করত। আরো একটা জায়গায় ভিন্নমত রুবেন। দেবীপ্রসাদ যেভাবে আলোচনায় এনেছেন সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষকে তাতে সন্তুষ্ট নন এই জার্মান ভারততত্ত্ববিদ। দেবীপ্রসাদ যেভাবে সাংখ্যের উত্থানকে অতি সরল করে দেখাতে চেয়েছেন, যেভাবে বলেছেন যে আদিম বস্তুবাদের জাদুবিশ্বাসের মধ্যে থেকেই এর উৎপত্তি তাতে আপত্তি জানিয়েছেন রুবেন। এনেছেন উদ্দালক সম্পর্কে নিজের গবেষণার কথা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে থেকে এসেছে সাংখ্যর 'প্রকৃতি'র ধারণা, পুরুষের ধারণা প্রভাবিত করেছে উপনিষদের মায়াবাদ (mysticism) এটা মেনে নিয়েও রুবেন বলছেন যে আরো গভীরে যাওয়া প্রয়োজন এক্ষেত্রে। উদ্দালকের 'সৎ' কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে উঠে আসেনি, এসেছে মাতৃতান্ত্রিক কাঠামো থেকেই। উদ্দালকের সঙ্গে ভোজবাজিতে অভ্যস্ত জাদুকরদের (breath-wind magician) যোগকে দেখতে অনুরোধ করেছেন তিনি। এই জাদুকররা কৃষিজীবী আদিম সমাজ থেকেই উঠে এসেছিলেন। উদ্দালক এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বিরোধিতাকে আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ভারতে দর্শনের প্রকৃত উদ্ভবের সময়টা দেবীপ্রসাদকে দেখতে আহ্বান করেন রুবেন।

এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও লোকায়ত নিয়ে প্রশংসায় সরব থেকেছেন রুবেন। ১৯৬৩ সালে রুস্তাউ যখন কলকাতায় আসার পরিকল্পনা করছেন তখন দেবীপ্রসাদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করার জন্য নির্দেশ দেন রুবেন। গুরুর কথা মেনে কলকাতায় এসে রুস্তাউ সাক্ষাৎ করেছিলেন লোকায়ত-র লেখকের সঙ্গে। এর পরেও দু-একবার রুবেন-দেবীপ্রসাদের আলোচনার সাক্ষী থেকেছেন রুস্তাউ। তাঁর নিজের অভিমত হল, লোকায়ত রচনার সময় রুবেনের ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না দেবীপ্রসাদ যেহেতু লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল জার্মান ভাষায়। কিন্তু এর পরের সব প্রকাশনাতে উদ্দালক সম্পর্কে রুবেনের ভাবনা অনুসরণ করেন দেবীপ্রসাদ। ১৯৬৯ সালে নিজের বই Indian Atheism উৎসর্গ করেন রুবেনকে। সে ধারাবাহিকতায় যে ছেদ পড়েনি তার প্রমাণ জীবনের একেবারে শেষ দিকে (১৯৮৭) রচিত 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' বইতে রুবেন ও তাঁর শিক্ষক জ্যাকবির মতের উল্লেখ। অন্যদিকে দেবীপ্রসাদের বইয়ের ভূমিকা রচনাতেও আমরা পাচ্ছি রুবেনকে। এভাবেই বস্তুবাদের অন্বেষণ ঘিরে রূপ পেয়েছে এক ভারতীয় আর এক জার্মান ভারততত্ত্ববিদের আদানপ্রদানের আখ্যান।

কোষ-কাহিনির ট্যুইস্ট— একটি ভূমিকা

স্থবির দাশগুপ্ত

আধুনিক জীববিদ্যা আর ডাক্তারি বিদ্যায় দুটো তত্ত্ব একসময় নতুন যুগের সূচনা করে দিয়েছিল— কোষতত্ত্ব আর জীবাণুতত্ত্ব। প্রথমটির উদগাতা ছিলেন রুডলফ ভির্কো আর দ্বিতীয়টির, লুই পাস্তুর। আমাদের শরীরটা যে কোষ দিয়েই তৈরি তা জানা ছিল; তাই ভির্কো সাহেব জানালেন, কোষকে গভীরভাবে না বুঝলে জীবের প্রকৃতি বোঝা যাবে না। কারণ, কোষ থেকেই রোগ-বিরোগের রহস্য তৈরি হয়, ঘনীভূত হয়, কোষেই ঘটে তার পরিণতি। আমরা বুঝলাম, শরীরটা কোষ দিয়েই তৈরি, তাই কোষই জীবের বনিয়াদ। আর পাস্তুর সাহেব জানালেন, জীবাণুই আমাদের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির মূল কারণ। অবশ্য এসব ঊনবিংশ শতকের কথা। ডাক্তারি শাস্ত্র তার পর আরো এগিয়েছে, এগোতে এগোতে বুঝেছে যে জীবাণু একটা উপাদান ঠিকই, তবে রোগ-ব্যাধির সঙ্গে আরো বহুতর রহস্য জড়িয়ে আছে।

কোষ শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক, ১৬৬৫ সালে। তিনি প্রখ্যাত ছিলেন বিজ্ঞানের নানান শাখায় তাঁর অনাবিল কৌতূহলের জন্য, প্রথিতযশাও ছিলেন; কিন্তু তৎকালীন বিজ্ঞানী মহলে তাঁকে নিয়ে অস্বস্তিও ছিল। মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব নিয়ে আর এক স্মরণীয় বিজ্ঞানী, স্যার আইজাক নিউটন-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ একসময় এমন তিক্ততায় পৌঁছে যায় যে নিউটন-এর নির্দেশে ইংল্যান্ডের 'রয়াল সোসাইটি' থেকে তাঁর ছবিটাও সরিয়ে দেওয়া হয়। অথচ বিজ্ঞান গবেষণায় হুক সাহেবের অবদান সত্যিই মনে রাখবার মতো। তবে আজ মনে হয়, কোষ শব্দটা জীববিজ্ঞানে ঢুকে পড়ার সুদূরপ্রসারী ফল কী হতে পারে তা হুক সাহেব বা নিউটন, কেউই ঠাহর করতে পারেননি। ফল এমনই যে কোষের পূর্ণ পরিচয় আজও অজ্ঞাত। কোষ আজও এক প্রহেলিকা।

হুক সাহেব পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন উদ্ভিদের উপর। তিনি যাকে কোষ ('সেল') বলে ভাবলেন তা ছিল চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মতো। তাঁর নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষের ভিতরকার উপাদানগুলো যে খুব স্পষ্ট হয়েছিল তা মোটেই না; তাই তার পরের দু-শো বছর ধরে উদ্ভিদ-কোষ আর প্রাণী-কোষ নিয়ে পর্যবেক্ষণ চলতেই থাকল। ১৮৩৮/৩৯ সালে আর এক জার্মান বিজ্ঞানী থিয়োডোর শোয়ান জানালেন, কোষের মধ্যে থাকে এক অসাধারণ উপাদান, যার নাম 'নিউক্লিয়াস'। তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধু ম্যাথিয়া স্লাইডেন বললেন, ওই নিউক্লিয়াস থেকেই নতুন কোষের জন্ম হয়। এরপর তৈরি হল কোষতত্ত্ব। সেই তত্ত্ব পরে আরো পরিমার্জিত হয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রও ক্রমশ আরো উন্নত হয়েছে। একইসঙ্গে কোষের চরিত্র নিয়ে উঠেছে নানান প্রশ্ন।

কোষ শব্দের উদগাতা হুক সাহেব কোষের চারধারে একটা সুস্পষ্ট দেয়াল দেখতে পেয়েছিলেন; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রাণী-কোষ নিয়ে আরো পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন, কোষের চার ধারে যে অমন স্পষ্ট দেয়াল থাকতেই হবে এমন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, দেয়াল না থাকলে এক-একটা কোষকে আলাদা করে চেনা যাবে কী করে? শুধু তাই না, কোষের আকার নিয়ে জনপ্রিয় ধারণা হল, সে গোলাকার; কিন্তু উচ্চতর জীববিজ্ঞান প্রশ্ন তুলল, কোষ কি সত্যিই গোলাকার? মৃত কোষ তো স্থাণু, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে তাকে গোলাকারই দেখায়, কিন্তু জীবন্ত কোষ? সে যে সতত সঞ্চরণশীল, তার আকার ঠিক কেমন?

অনেকে জানালেন, জীবন্ত কোষের আকার ঠিক কেমন হবে তা নির্ভর করে তার আশপাশের পরিবেশ আর নির্দিষ্ট কোষের নির্দিষ্ট কাজের উপর।

কোনো বস্তুর আকার, মাপ, এসব কীভাবে নিরূপণ করা হবে এসব নিয়ে পদার্থবিদ্যার নির্দেশ আছে। কিন্তু সেই শাস্ত্র নিজেই গতিময়, পরিবর্তনশীল। আধুনিক জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যার শিক্ষাগুলো কাজে লাগায়। তাই নতুন জীববিজ্ঞানীরা বললেন, কোষকে গোলাকার বলা যাবে না, সে শুধু গোলাকার হতে চায় মাত্র। কারণ, গোলাকার হলেই সে বেশি জায়গা দখল করে রাখতে পারে। একটু যেন ফেলে-ছড়িয়ে থাকাই তার পছন্দ! তাহলে কি কোষের কোনো মনন আছে, বুদ্ধি? সঞ্চরণশীল

কোষ যেন এক-একটা মুহূর্তে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, আবার ছেড়েও যাচ্ছে, এই এক আকার, আবার পরমুহূর্তেই সেই আকার ভেঙে যাচ্ছে। সে গতিময়, জীবন্ত সত্তা। তাই অনেকে বলেন, কোষকে ঠিক নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে ধরা যায় না। কোষ এক তরঙ্গায়িত বিন্যাস, এক হিল্লোলিত বিভঙ্গ।

তাহলে কি এই বিভঙ্গই আমাদের শরীরের বনিয়াদ, সেই কি একক ('ইউনিট')? তাহলে তাকে ভেঙে দেখতে হয়, কেননা বস্তুকে ভেঙে না-দেখলে তার গভীরে যাওয়া যায় না। এভাবেই তো বুঝেছিলাম, বস্তুর একক হল, অ্যাটম। কোষ যদি একটা বস্তু হয় তাহলে তাকেও ভেঙে দেখা যায়। ভাঙতে গিয়ে দেখলাম, লক্ষ লক্ষ পরমাণু ('অ্যাটম') মিলে হয় একটা অণু ('মলিকিউল'), লক্ষ লক্ষ অণু দিয়ে তৈরি হয় একটা 'পলিমার', আর লক্ষ লক্ষ পলিমার দিয়ে তৈরি হয় একটা কোষ। তাহলে 'একক' বুঝতে হলে এত কিছু বুঝতে হবে। তার মানে, কোষ খুব সহজ সরল বস্তু না। এরকম একশো লক্ষ কোটি কোষ দিয়ে তৈরি হয়েছে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহ। তাহলে আমাদের দেহটাকে জটিলতার প্রতিমূর্তি ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়?

এই কোষকে ধারণ করে রাখে প্রকৃতি বা সহজ ভাষায় আমরা যাকে বলি, পরিবেশ। কিন্তু পরিবেশ বা প্রকৃতিই-বা কী? অতগুলো কোষ দিয়ে যে আমাদের দেহ তৈরি তাহলে সেই দেহ নিজেই একটা পরিবেশ। তার মধ্যে শুধু কোষই নেই, যেকোনো দুটো কোষের মাঝখানে একটা অন্য পরিবেশ আছে, সেও জটিল। তাহলে এসব হল, দেহপ্রকৃতি। আর এই দেহপ্রকৃতিকে ঘিরে থাকে একটা বিশাল বাহ্যপ্রকৃতি। তাতে আছে অসংখ্য উদ্ভিদ, অন্যান্য প্রাণী আর জীবাণু; আর আছে জড় জগৎ। যদি বলি, ব্যাধি আর নির্ব্যাধি দুইই প্রকৃতির সন্তান তাহলে তারা দেহপ্রকৃতি আর বাহ্যপ্রকৃতি দুইয়েরই সন্তান। তাহলে দুইয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। তারা একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু; কারণ, তারা উভয়েই প্রাণের সঞ্চার করে, প্রাণকে ধারণ করে রাখে।

তার মানে কোষ, তার মধ্যেকার যাবতীয় উপাদান, কোষের বাইরে বাহ্যপ্রকৃতি, আর সব কিছু মিলে এই মহাপ্রকৃতি আসলে প্রাণেরই আধার... 'বিশ্বভরা প্রাণ'! এই প্রাণের সৃষ্টি হল কবে, কীভাবে? প্রাণ কী, কী তার চরিত্র, কেমন তার বৈশিষ্ট্য এসব বুঝতে গেলে আমাদের কোষের দিকেই তাকাতে হয়। সেদিক থেকে দেখলে আমরা ভির্কো সাহেবের কাছে ঋণী। কিন্তু কোষ নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা দেখলেন, তাঁর ধারণাগুলোর মধ্যে ঘাটতি আছে। তিনি বলেছিলেন, কোষ থেকেই কোষের জন্ম। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোষ যদি প্রাণের প্রতিমূর্তি হয় তাহলে ধরিত্রীর প্রথম কোষটি কোত্থেকে জন্ম নিয়েছিল? একইভাবে বলা যায়, কোষ থেকেই যদি প্রাণের স্ফুরণ হয়ে থাকে তাহলে প্রাণের পূর্বাহ্নে কী ছিল তার ছাপ নিশ্চয়ই কোষের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

সেই পূর্বাহ্ন বা 'প্রি-লাইফ' নিয়ে গবেষণার প্রভাব দর্শন আর ধর্মেও পড়ে। যেমন, সৃষ্টির একটা পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তা নাকি বলেছিলেন, এইবার জগৎ-সংসার আলোকিত হোক, আর অমনি চারদিক উজ্জ্বল হয়ে গেল। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কি বলেছিলেন, এইবার জগৎ-সংসারে প্রাণ জেগে উঠুক, আর অমনি জগৎ প্রাণিত হয়ে গেল? তার কোনো প্রমাণ নেই। তাই প্রাণের উৎপত্তির খোঁজ করতেই হয়। আমরা ভাবি, আমাদের সৌরজগতে একমাত্র এই ধরিত্রীতেই যে প্রাণের অবস্থান, সে কি একটা চূড়ান্ত অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা, নাকি কোনো অজানা সূত্র মেনেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটল? বিজ্ঞানীরা বলেন, আজ থেকে প্রায় চোদ্দো-শো কোটি বছর আগে ঘটেছিল এক মহাবিস্ফোরণ, যাকে বলে 'বিগ ব্যাং'; তা থেকেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। তাহলে কি 'বায়ো ব্যাং' বলেও কিছু ঘটেছিল, মানে জীবসত্তার বিস্ফোরণ?

গবেষকরা আমাদের জানালেন, প্রায় চার-শো কোটি বছর আগে এই ধরিত্রীর বুকে জীবের সৃষ্টি, অর্থাৎ প্রাণের। প্রাণ সৃষ্টির পিছনে ছিল নানান রাসায়নিকের মধ্যে সংযোগ আর সংঘাত। সে এক নৈরাজ্য, একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা, যেন এক প্রলয়রাজ্য। অনেকে তাকে বলেছেন, 'কেওস'। প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে এই প্রলয়রাজ্য থেকে; অজীব থেকে সৃষ্টি হল সজীবের, 'কেওস' থেকে যেন 'কসমস'! তার মানে, প্রাণের পূর্বাহ্ন বলতে এই মহাপ্রলয়কে বোঝায়। এটাই হয়তো সেই 'বায়ো ব্যাং'! তাকে অলৌকিক বলে মনে হলেও তেমন কিছু তো না; বরং গবেষকরা বলছেন, এ এক স্বতঃস্ফূর্ত সংঘটন ('ফেনোমেনন')। যে-যন্ত্রে প্রাণের উচ্ছল সংগীত বাজে তা একতারা; সেই তারটি হল, কোষ। সে জীবের সবচেয়ে বুনিয়াদি উপাদান, প্রাণের আধার। জীববিজ্ঞানের ভাষায় এই সংঘটনকে বলা হয়েছে, 'অ্যাবায়োজিনেসিস'।

কোষ দিয়েই তৈরি জৈব মণ্ডল; জীবজগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, জীববিজ্ঞানের যাবতীয় শিল্পকলা আবর্তিত হয় কোষকে কেন্দ্র করে। জীবের একক হিসেবে কোষ প্রাণেরও একক; আবার সৃষ্টির নেশায় বিভোর হয়ে সে বলে, আমি একাকী, কিন্তু আমি বহুতর হব, 'একোহম বহুস্যাম্'! এই কথা বলে কোষ নিজেকে ভাঙতে থাকে, নিজের প্রতিরূপ গড়তে থাকে। কিন্তু কেন তার অমন মনোবাসনা, কেন তাকে এক থেকে বহু হতে হয় সে যেন বিপুল রহস্য, আমাদের পরম জিজ্ঞাসা। অমন বাসনা পূর্ণ করার জন্যই তার ভিতরে আর বাইরে চলতে থাকে বিচিত্র নাট্যকলা। প্রাণ আমাদের কাছে নানান রূপে ধরা দেয়, বিচিত্র তার অভিব্যক্তি। তার মানে,

বিশ্বপ্রকৃতিতে নিত্যনতুন প্রাণের উৎপত্তি ঘটেই চলেছে। তাকে নিয়েই জীববিজ্ঞানের তুমুল আর অনন্ত গবেষণা।

প্রাণ স্থিতিশীল, কিন্তু এটাই কি তার চরিত্র? অস্থিরতা থেকে তার জন্ম, কোনো এক অস্থিরতাই হয়তো তার অন্তিম পরিণতি; অথচ আবির্ভাব থেকে তিরোধানের সময়টুকু তাকে স্থিতিশীল থাকতে হয়। তা নইলে সে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না; তাকে যে তার বিচিত্র উপাদানগুলোকে কাজে লাগাতে হবে, কোষকে যে এক থেকে বহু হয়ে যেতে হবে, নতুন নতুন কোষ তৈরি করে নিতে হবে, একই শরীরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে হবে। তাই স্থিতিশীলতার সঙ্গে অস্থিরতা, এই আপাত স্ববিরোধিতার মূল চরিত্র। এ যেন এক অস্থির সৃষ্টিশীলতা। কিন্তু যে-কোষের মধ্যে কলেবরে আর সংখ্যায় বেড়ে যাবার মতো এমন সৃষ্টিশীলতা থাকে তার মধ্যে একটা সত্তাও নিশ্চয়ই আছে। সেই কোষীয় সত্তা কি উদ্দেশ্যহীন হতে পারে?

তা নিশ্চয়ই না। আপাতভাবে উদ্দেশ্যহীন মনে হলেও কোষীয় সত্তার মধ্যে কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকেই; পরতে পরতে তা উন্মোচিত হয়। একইসঙ্গে উন্মোচিত হয় তার বিপুল বৈভব, প্রকাণ্ড ক্ষমতা, বিচিত্র আর অভিনব গুণাবলী। কোষের মধ্যে এই যে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে আর সময়ে সময়ে তা অবগুণ্ঠন সরিয়ে বেরিয়ে আসে তাকে আপাত চোখে তার খেয়ালিপনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেই খেয়ালেরও একটা নকশা থাকে, একটা ধাঁচ ('প্যাটার্ন')। তার এই বৈশিষ্ট্যেরই আর এক নাম, ক্যান্সার। কোষ যদি একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে বসেই থাকত, সে যদি সংখ্যায় আর কলেবরে নাই বাড়ত তাহলে জীবের গঠন পূর্ণতা পেত না। আর তাহলে গুণগতভাবে নতুন জগৎ, অনন্ত সম্ভাবনাময় জগৎ তৈরি হত না। ক্যান্সারের উদ্ভব ঘটত না।

কিন্তু কী করা! প্রাণেরই উদ্ভব হয়েছে এক আদিম জলাশয়ের ধারে ('প্রিমিটিভ স্যুপ'); সে ছিল এক 'ক্যান্সার পিণ্ড'। তাই 'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে', সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই বহুতর হয়ে ওঠার বাণী তার অঙ্গে আঁকা হয়ে গেছে। কোষ যে অনন্ত সম্ভাবনার জগৎ তৈরি করে ক্যান্সার তারই অংশ, তবে সেই সম্ভাবনায় উল্লাস থাকে না, থাকে বিষাদ। সে এক নতুন প্রাণ, নতুন তার বিকাশের আয়োজন, নতুনতর তার নিয়ম আর কানুন। সে যেন এক নতুন 'প্রজাতি চরিত্র'। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার সৃষ্টি। তার জন্য কোনো 'কারণ' দরকার হয় না। আমাদের কোষের মধ্যে যে প্রাণসত্তা থাকে তা তার দশ দিকে ছড়িয়ে থাকা মহা-বিন্যস্ত প্রাণেরই একটা অংশ। সেই মহা-জালিকার ('ওয়েব') উপাদানগুলো অনবরত নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে।

একে বলে স্ব-সৃজন ('অটোপোয়েসিস')। সেও ধ্বংস হয়, আসে নতুন প্রাণ, নতুন সৃজন। এই স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ আর বিনির্মাণের খেলা চলতেই থাকে। কোষের এই পরিচালকহীন, অনবদ্য নাট্যকলায় আমরা যাকে 'কারণ' বলে ঠাহর করি তা শুধু পদ্ধতি আর ব্যাকরণের বর্ণনা। আমরা ওই ব্যাখ্যা আর বর্ণনায় ব্যস্ত থাকি, কেননা আমরা ভাবি, 'কারণ' বিনা 'কার্য' হয় না। এই শিক্ষা আমরা পেয়েছি ধ্রুপদি ('ক্লাসিকাল') পদার্থবিজ্ঞান থেকে। কিন্তু সেই শিক্ষার সীমাবদ্ধতা আছে। পদার্থবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বগুলোই সেই সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দেয়। এদিকে জীববিদ্যার মুশকিল হল, সে বহুকাল ধ্রুপদি পদার্থবিজ্ঞানের হাত ধরেই হেঁটেছে। আজও তার একই অভ্যেস। অথচ 'নতুন জীববিদ্যা' নতুন করে ভাবতে চায়। তাই স্বতঃস্ফূর্ততা আর স্ব-সৃজনের সঙ্গে সে নিয়ে আসে আরো একটা ধারণা, অন্যোন্যজীবিতা ('সিমবায়োসিস')।

প্রাণসৃষ্টির প্রথম দু-শো কোটি বছর জীবাণুকুলই ছিল এই ধরিত্রীর একমাত্র বাসিন্দা। ধরিত্রীজুড়ে থাকত তাদেরই বিপাক ক্রিয়ায় তৈরি মহাজালিকা, তারাই নিয়ন্ত্রণ করত ধরিত্রীর আবহ। সে ছিল এক অণুবিশ্বের জগৎ। আমাদের প্রাণিজগৎ আর উদ্ভিদজগতের উদ্ভব ঘটেছে অনেক পরে, সেই অণুবিশ্বের স্নেহছায়ায়। জীবাণুই আমাদেরকে ঘিরে রয়েছে; শুধু তাই না, তারা 'মাইটোকন্ড্রিয়া'-র রূপ নিয়ে আমাদের কোষের মধ্যেও সজীব হয়ে আছে। আমাদের কোষের মধ্যে প্রায় নব্বই ভাগ জায়গাজুড়ে থাকে 'সাইটোপ্লাজম' আর সেই সাইটোপ্লাজম-এর প্রায় পঁচিশ শতাংশ জায়গা জুড়ে থাকে এই অনবদ্য উপাদান, 'মাইটোকন্ড্রিয়া'। সে আমাদের শক্তি সরবরাহ করে। তাতে মনে হয়, আমাদের কোষকে তেজ আর কর্মশক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা, সতত সক্ষম করে রাখার মহান দায়িত্ব যেন জীবাণুরাই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এই মাইটোকন্ড্রিয়ায় 'জিন'-ও থাকে, অথচ তারা আমাদের কোষের 'নিউক্লিয়াস'-এ থাকা জিনগুলোর মতো না; তারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বাধীন। প্রশ্ন হল, এমন একটা স্বাধীন সত্তা আমাদের কোষের মতো অন্য একটা স্বাধীন সত্তার মধ্যে তার বসবাস তৈরি করে নিল কেন, কী করেই-বা? গবেষকরা আমাদের জানিয়েছেন, জীবাণুকোষের মতো ধরিত্রীর প্রাচীন নাগরিকদের সঙ্গে নবোদ্ভূত, অর্বাচীন প্রাণিকোষের প্রাথমিক সাক্ষাৎ হয়তো তেমন মধুর ছিল না। হয়তো তাদের মধ্যে লড়াই হয়েছে, উভয় পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে; কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা সমঝোতায় এসেছে, প্রাণিকোষ জীবাণুকোষকে আত্মস্থ করেছে। কিন্তু তার নিউক্লিয়াস-এ থাকা জিনগুলোর সঙ্গে জীবাণুকোষের জিনগুলো যাতে মিশে না যায় তার জন্য নিউক্লিয়াস-এর চারধারে এক ধরনের আবরণী তৈরি করে নিয়েছে। এই

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, এই পারস্পরিক নির্ভরতারই আর এক নাম, অন্যোন্যজীবিতা।

তার মানে, প্রাণসত্তার বিকাশের জন্য অন্যোন্যজীবিতা একটা অপরিহার্য উপাদান। একসময় অণুবিশ্বই ছিল ধরিত্রীর প্রাণ। সেই প্রাণসত্তা যখন আমাদের কোষের মধ্যে তার স্থান করে নিল তখন জন্ম নিল নতুন এক প্রাণ। সেই নতুন প্রাণের স্বভাব আর গুণাগুণ জীবাণুর চেয়ে আলাদা, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে না। এই নতুন প্রাণ অনবরত নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে। অন্তত একশো কোটি বছর ধরে চলছে এই অপরূপ নৃত্যনাটিকা। অবশেষে এই আধুনিককালে মনে হয়, এই নাটকের শেষ অঙ্ক আগতপ্রায়, আর তা বিয়োগান্ত। কারণ, 'বিজ্ঞ' প্রজাতি ('হোমো স্যাপিয়েন্স') হিসেবে আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসকে অমান্য করে জীবাণুবিশ্বকে আমাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছি। তাই আমাদের চারধারে থাকা জীবাণুবিশ্বও অনবরত নিজেকে পালটাচ্ছে, নতুন করে নতুন রূপ নিয়ে নিজেকে সাজাচ্ছে।

কোষবিজ্ঞানের আধুনিক পাঠ আমাদের এই ধারণায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বতঃস্ফূর্ততার ধারণা কিন্তু নতুন কিছু না। প্রাচীন ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, দার্শনিক প্লেটোও অমন ধারণাই পোষণ করতেন, অ্যারিস্টটলও। বহুকাল এমনকী, ঊনবিংশ শতকেও বিজ্ঞানীরা জীবের উদ্ভবের এই ধারণা নিয়ে তর্ক চালিয়েছেন। তবে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা ওই ধারণা মেনে নেননি; তাঁরা বলেছেন, জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি। ডারউইন বলেছিলেন, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতায় 'স্বতঃস্ফূর্ততার' স্বপক্ষে কোনো তথ্য পাননি। আর লুই পাস্তুর পরীক্ষাগারে প্রমাণ করে দিয়ে বলেছিলেন, এমন ঘুসি মেরেছি যে 'স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন' আর কখনো মাথা তুলতে পারবে না! কিন্তু বিজ্ঞানী ডারউইন বা পাস্তুর বা ভির্কোর তত্ত্ব অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে উঠতে পারেনি। তাই অনেকে বললেন, অলৌকিকতা বাদ দিলে স্বতঃস্ফূর্ততা আর স্ব-সৃজনের ধারণাই যুক্তিগ্রাহ্য।

স্ব-সৃজন হল জীবসত্তার একটা ছাঁদ। স্ব-সৃজনের ক্ষমতা আছে বলেই একটা জীবকোষের মধ্যেকার সূক্ষ্ম উপাদানগুলো নিজেদের মধ্যে প্রাণোচ্ছল সম্পর্ক রাখতে পারে। একটা ভাইরাস, একটা কোষ বা এমনকী, একটা গ্রহ সপ্রাণ না নিষ্প্রাণ তা নির্ভর করে তার মধ্যে স্ব-সৃজনের ক্ষমতা আছে কি না তার উপর। আমাদের জৈবমণ্ডলের প্রতিটি উপাদান, প্রতিটি অংশ যে প্রতি মুহূর্তে নিজেরাই নিজেদের আকার-অবয়ব নিরূপণ করে চলেছে, তার জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা অথবা কোনো পরম শক্তির ('ভাইটাল ফোর্স') দরকার পড়ে না। এমন গুণ আছে বলেই প্রতি পাঁচ দিন অন্তর আমাদের পাকস্থলীর আস্তরণ পালটে যায়, প্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর আমাদের ত্বক পালটে যায় আর প্রতি দু-মাস অন্তর আমাদের যকৃৎও। আমাদের শরীরের আটানব্বই শতাংশ পরমাণু প্রতি বছর বদলে যায় ('রিপ্লেসমেন্ট')।

এমন অদ্ভুত সৃজন ক্ষমতা যার আছে সেই কোষ নিয়ে গবেষণার কি কোনো শেষ থাকতে পারে? তাই কোষ নিয়ে গবেষণার বহর যত বাড়ে ততই তাকে নিয়ে প্রশ্নের বহরও বাড়তেই থাকে। তার সৃজনশীলতাই নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। কোষবিজ্ঞানীদের তাই যেন ছুটি নেই, ফুরসতও নেই। যেমন, এই যে কথায়-কথায় কোষের সাইটোপ্লাজম-এ থাকা মাইটোকন্ড্রিয়ার কথা উঠল, তাকে কী বলা যাবে, শক্তিদায়ী নাকি শক্তিদায়িনী? প্রশ্নটা ওঠে, কারণ, একটা শুক্রাণু আর একটা ডিম্বাণু মিলে একটা ভ্রূণ ('জাইগোট') তৈরি করে; সে একটা নতুন কোষ। কিন্তু এই নতুন কোষে যে সাইটোপ্লাজম থাকে তার প্রায় পুরোটাই আসে ডিম্বাণু থেকে; তার মানে, মায়ের কাছ থেকে। তাহলে ভ্রূণের মধ্যে মায়ের অবদানই প্রধান, মানে 'স্ত্রীধন' বা 'নারীশক্তি'।

অনেকে অবশ্য বলেছেন, ভ্রূণের মধ্যে শুক্রাণুর সাইটোপ্লাজমও সামান্য পরিমাণে থাকে। তা হলেও, সেই সাইটোপ্লাজম-এ যে শুক্রাণু থেকে আসা অতি সামান্য পরিমাণের মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে তা গর্ভনিষেকের পরে আর বেঁচে থাকে না। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য একটা শুক্রাণু দরকার ঠিকই, কিন্তু মানুষের পরিচয় তো তার লিঙ্গে নেই, আছে তার স্বভাবে আর গুণে। সেই স্বভাব আর গুণ ধরা থাকে সাইটোপ্লাজম-এ। অনেকে বলেন, ভ্রূণের যাবতীয় নকশা, যা থেকে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে তার পুরোটাই ধরা থাকে সাইটোপ্লাজম-এ। তাহলে সেখানে থাকা, অনন্ত ক্রিয়াশীল মাইটোকন্ড্রিয়াই স্থির করে দেয় একজন ক্যাসিয়াস ক্লে অথবা মিলখা সিং অথবা মারিয়া শারাখোভার বৈশিষ্ট্য। তার মানে, মাইটোকন্ড্রিয়া আসলে শক্তিদায়িনী। তাই কোষ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, আমাদের পুরুষত্ব নিয়ে অহংবোধের সবটাই নকল নির্মাণ।

কোষচর্চা এইভাবে আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতি আমাদের চোখে কীভাবে ধরা দেবে তা নির্ভর করে আমরা তাকে কোন চোখে দেখব, তার কাছে কোন প্রশ্ন রাখব তার উপর। আমরা জানি, কোষ অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু সে কি সত্যিই সূক্ষ্ম? একটা কোষের ব্যাস মাত্র দশ মাইক্রন, একশোটা কোষ একসঙ্গে থাকলে হয় এক মিলিমিটার। সেই কোষ থেকে তৈরি হচ্ছে তিন ইঞ্চি লম্বা ইঁদুর অথবা ছয় ফুট লম্বা মানুষ অথবা ১৭৪ টন ওজনের তিমি। কীভাবে তা সম্ভব হচ্ছে? একটা ভ্রূণ বা জাইগোট একটা সূচের অগ্রভাগের মতো। অথচ তারই মধ্যে যে বার্তা ('ইনফরমেশন') সঞ্চিত

তাকে তা ষাট লক্ষ রাসায়নিক অক্ষরের (‘কেমিকাল লেটার’) সমান। তাহলে সূক্ষ্মতাকে আমরা কীভাবে বিচার করব?

অমন সূক্ষ্ম ভ্রূণের মধ্যেই থাকে চার হাজার উপাদান যারা প্রত্যেকে কর্মশীল। তাই তাদের মধ্যে অনবরত লেগে থাকে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। একটা জীবাণু কোষের ওজন এক গ্রামের বারো হাজার ভাগের এক ভাগ; অথচ তার ভিতরে থাকে দশ লক্ষ পরমাণু সমেত একটা কারখানা। প্রশ্ন হচ্ছে, এত অপরিমিত উপাদান অমন সূক্ষ্ম, প্রায়-অদৃশ্য কোষের মধ্যে মজুত থাকে কী করে? শুধু বস্তুসমষ্টি হলে কি তা সম্ভব? তাই কোষকে একটা জটিল, অদ্ভুত, তরঙ্গায়িত বিন্যাস বলেই ভাবতে হয়। তার মানে, সে এক অখণ্ডনীয় জটিলতার প্রতিমূর্তি (‘ইরিডিউসিব্ল কমপ্লেক্সিটি’)। কারিগরি বিদ্যায় যত উন্নতি ঘটছে ততই কোষের ‘ব্ল্যাক বক্স’ খুলছে, আমরা তার নতুন নতুন পরিচয়ে ঋদ্ধ হচ্ছি। অবশ্য ঋদ্ধ হচ্ছি নাকি আরো মুগ্ধ হয়ে, বিহ্বল হচ্ছি তা বলা মুশকিল।

আরো বিহ্বল লাগে যখন শুনি, জীবাণু কোষের চারধারে যে আস্তরণ থাকে তাতে এমন উপাদান আছ যা প্রকৃতির অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন, ‘এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড’। সাধেই কি জীবাণু কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী হয়! জীবের মধ্যে এত রহস্যের সন্ধান পেয়ে আমরা নিষ্প্রশ্ন থাকতে পারি না; অথচ প্রশ্নের উত্তর পেয়েও যেন আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই। দার্শনিক, বিজ্ঞানী লিউইস থমাস বলতেন, আরো এক হাজার বছর ধরে কোষ নিয়ে গবেষণা চালানোর পরেও আমাদের কম্পিউটার বলবে, আরো তথ্য চাই, আরো, আরো! কোষের প্রহেলিকা অমনই। আমরা ‘ডিএনএ’-র কথা জানি। অনেকে তাকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলে ভাবেন। তা নিয়ে তর্ক আছে; কিন্তু যা নিয়ে তর্ক নেই তা হল, একইসঙ্গে তার সূক্ষ্মতা আর বিশালত্ব।

ডিএনএ-র আকার প্যাঁচের মতো। মাত্র একটা কোষের নিউক্লিয়াস থেকে ডিএনএ-গুলোকে প্যাঁচ ছাড়িয়ে যদি পর পর রাখা যায় তাহলে তার দৈর্ঘ্য হয় পাঁচ ফুট। তাহলে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের একশো লক্ষ কোটি কোষের ডিএনএ-র মোট দৈর্ঘ্য হিসেব করলে দেখা যাবে, আমরা দু-লক্ষ বার চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারি! আমাদের শরীর তাহলে এই বিশালত্বের প্রতিভূ। সেই শরীরে আছে ক্ষুদ্রান্ত্র আর বৃহদন্ত্র। তারা সর্বদা গতিশীল। তা থেকে অনবরত কোষ খসে পড়ে (‘এক্সফোলিয়েশন’), আবার নতুন কোষ জন্ম নেয়। হিসেব করে দেখা গেছে, অন্ত্র থেকে একশো লক্ষ কোটি কোষ খসে পড়তে সময় লাগে বাইশ দিন। সে তো আমাদের শরীরের সমুদায় কোষের সমান। এই কর্মকুশলতা নিয়েই আমাদের শরীর।

এমন অনুপম, কর্মোদ্যমী কোষ দিয়ে যে-শরীর তার প্রধান উপাদানই হল, জল। তার পরিমাণ প্রায় পঁয়ত্রিশ লিটার। ওজনের হিসেবে আমাদের শরীরের পেশিগুলোর পঁচাত্তর শতাংশই জল, রক্তের পঁচানব্বই শতাংশ জল, হাড়গোড়ের তেতাল্লিশ শতাংশে থাকে জল। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ আর নারীর শরীরে যথাক্রমে ষাট আর পঞ্চান্ন শতাংশই জল। তার মূল কারণ, কোষের মধ্যে যত অণু খেলা করে তার সত্তর শতাংশই জল। শরীরটা আসলে জলে ভর্তি, ডাঙা মাত্র চল্লিশ শতাংশ। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি কোষ নামকরণটা যথার্থ ছিল? নাকি জলই যখন প্রধান উপাদান তখন জলীয় কোনো নাম রাখলেই যথার্থ হত? তখনই আবার মনে পড়ে যায়, আমাদের পূর্বপুরুষরা নাকি মাছকেই আদিমতম জীব বলে অনুমান করেছিলেন, মৎস্য অবতার! আমরা নাকি সেই অবতারেরই বংশধর!

এ কিন্তু সেই পুরাণের গল্প না! সেই গল্পে ভগবান বিষ্ণু মাছকে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর প্রথম সন্তান মনুকে বিরাট বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করতে। সে অন্য গল্প। কিন্তু কেউ কেউ নাকি আজও বিশ্বাস করেন যে, মাছ থেকেই মনুষ্যে বিবর্তন সম্ভব হয়েছে! অবশ্য অনুমানের ইতিহাস অনেক পুরোনো। হনুমানকে আমাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে অনুমানও তো সম্ভব হয়েছিল। সে তো খুব বেশি দিনের কথা না। তো এইসব ভাবতে ভাবতে অন্য আর একটা প্রশ্ন মাথায় আসে। তা এই যে, ধরিত্রী নামটাও কি যথাযোগ্য ছিল? নিজেদের চারধারে মাটি দেখেই হয়তো প্রাচীন মানুষ অমন নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু আরেকটু ভালো করে দেখলেই তো তাঁরা বুঝতেন, এই ধরিত্রীর অন্তত সত্তর শতাংশই জল। তাই সসাগরা পৃথিবী না-বলে সমৃত্তিকা বলাই বোধহয় বাঞ্ছনীয় ছিল।

তো কোষ নিয়ে এত কথা বলার কারণ, আধুনিক এবং উচ্চতর কোষ বিজ্ঞানের গবেষণা আমাদের সামনে যে নতুন নতুন তথ্য আর জিজ্ঞাসা নিয়ে আসছে তাতে মনে হয়, আমাদের চিন্তাভাবনার অভিমুখ পালটানো দরকার। চিরায়ত ভাবনা ছেড়ে নতুন ভাবনার জগতে আমাদের ঢুকতেই হবে। তাতে হয়তো আমরা আরো আলোকিত হব, আরো বিহ্বলও হতে পারি। কিন্তু আমাদের সন্ধানব্রত জারি থাকবে। এ পর্যন্ত আমরা শুধু গোদা গোদাভাবে কোষকে দেখবার চেষ্টা করেছি। এরপর আছে নিউক্লিয়াস। সে আর এক রহস্যের ভাণ্ডার। সেই প্রসঙ্গে পরে আসতে হবে। আপাতত শুধু মনে পড়ে,

‘তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।’

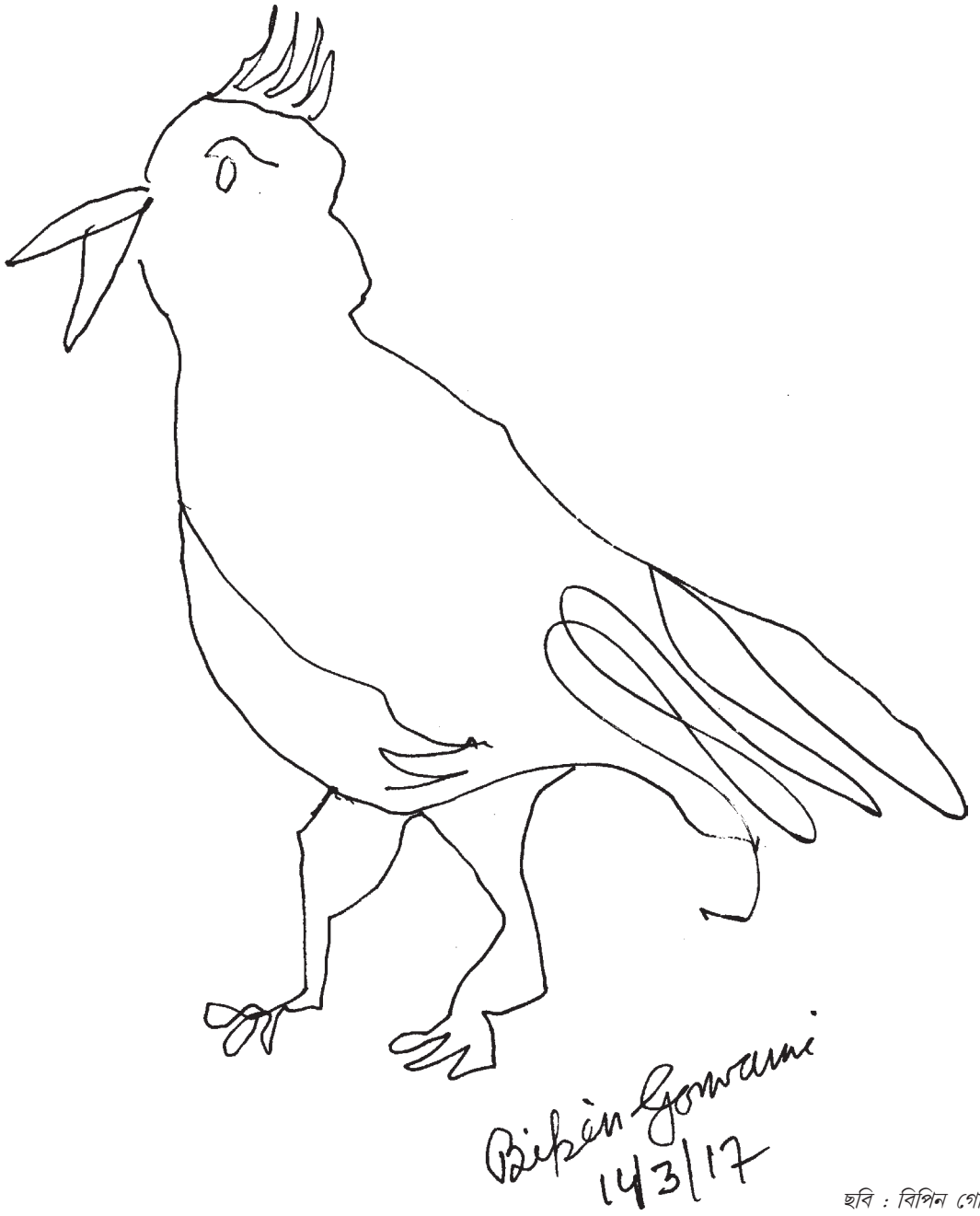

ছবি : বিপিন গোস্বামী

প্রাসঙ্গিক

Biology Revisioned. Willis W. Harman, Elisabet K Sahtouris. North Atlantic Books; 1998.

Celldom Appreciated. Manu Kothari, Lopa Mehta. Bhalani Publishing House; Mumbai, 2015.

The 5th Miracle; The Search for the Origin and Meaning of Life. Paul Davies. Simon & Schuster; Ed I, 2000.

The Music of Life: Biology beyound Genes, Denis Noble, OUP; Ed I, 2008.

The Dialectical Biologist. Richard Levins, Richard Lewontin. Harvard University Press; Ed I 1985.

স্মৃতি সত্তার জাদুঘর! ভবিষ্যতের জাদুঘর!

যশোধরা রায়চৌধুরী

A building in which objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest are stored and exhibited.

স্বল্প শব্দে এই হল মিউজিয়াম বা জাদুঘরের সংজ্ঞা, অন্তত অভিধান তাই বলে। পুরাতাত্ত্বিক বস্তুচয়কে ধরে রাখার জায়গাই হল জাদুঘর। ইতিহাস সেখানে চলে-ফিরে বেড়ায়, জ্যান্ত হয়ে ওঠে। এই সংজ্ঞা থেকে যদি খানিক এগিয়ে যাই তাহলে দেখব শুধু অতীত ইতিহাসই নয়, বরং চলমান ইতিহাসও আছে জাদুঘরের বিষয়বস্তুতে সমাজের চলার পথটাও দেখে নেওয়া যায় সেখানে। বর্তমান যে অতীতের ওপর আধারিত সেকথা বার বার মনে করিয়ে দেয় জাদুঘর, অন্তত জাদুঘরের ভাবনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই সম্ভাবনাটা।

তাই হয়তো ওরহান পামুক যখন তাঁর বই দ্য মিউজিয়াম অফ ইনোসেন্স-এ বলেন, 'Real museums are places where Time is transformed into Space.' খানিকটা ধরতে পারি। আবার রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরিতে, 'আমার মনটাকে বিধাতা নাট্যশালা করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই, জমা করে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ।' অর্থাৎ তিনি জাদুঘরকেই যেন এক নঞর্থক দ্যোতনায় ব্যবহার করছেন। জাদুঘরে রাখা সার দেওয়া অনেক মৃতবৎ বস্তুপুঞ্জ জমা করার বিরোধিতা করেছেন। প্রসঙ্গ যদিও নিজের মন। তবু একথা বলতেই হবে পাশ্চাত্যের জাদুঘরগুলোতে যে সযত্ন অতীত রক্ষার নিদর্শন দেখতে পাই, আমাদের ভারতীয়দের ততটা সংরক্ষণের অভ্যাস নেই। আমরা আমাদের পূজার মূর্তিকে যেমন বিসর্জন দিই, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর চশমা বা লাঠিকেও অনেকসময়ে পুড়িয়ে দিই। পুরোনো ডায়েরি বা চিঠিপত্রও জলাঞ্জলি যায় বা উই-এর খাদ্য হয়ে যায় কারণ আমাদের মাথায় কে বা কারা কবে যেন প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে এই সারসত্য যে সবই মায়া, সকলই নশ্বর।

উলটো দিকে যখন যে-দেশে গেছি, দেখেছি কত ধরনের জাদুঘর। কত তার বৈচিত্র্য, কী বিশাল তার ভাণ্ডার! প্রথাগতভাবে ইউরোপে যখন গিয়েছি কাজে বা অকাজে, টুরিস্ট হিসেবে প্রথমেই গিয়েছি নানান শিল্প সংগ্রহালয়ে। সুবিখ্যাত শিল্পীদের হাতের কাজগুলো রাখা দেখেছি ডেট্রয়েট মিউজিয়ামে, ভিয়েনাতে অথবা মস্কোতে। অসলোতে যেমন মুংখ-এর আঁকার অরিজিনাল দেখেছিলাম, জীবন ধন্য হয়েছে। পারী গেলেই সবাই লুভ্র-এ যাবেনই মূল লিওনার্দো দেখতে। মোনালিসাকে চোখের দেখা দেখবেন।

কিন্তু আজ যে জাদুঘরের গল্পগুলো বলব সেগুলো একটু অন্য। আমারই কোনো-না-কোনো প্রশ্ন বা খোঁজার উত্তর মিলেছিল এক-একটা জাদুঘরে। অথবা স্তম্ভিত বা বলা ভালো একেবারে দ্রবীভূত হয়েছিলাম কোনো জাদুঘরের কেবলমাত্র ভাবনাটা দেখে। কোথাও কোনো-একটা প্রদর্শ বা নিদর্শ বস্তু দেখে সারারাত ঘুম আসেনি। এখনও দৃশ্যটা হন্ট করে।

১। কালো মানুষের দীর্ঘ যাত্রা

অনেকটাই কম বয়স তখন। বাড়িতে কাকার, বাবার, মামার সংগ্রহের রেকর্ড শোনা হত। বড়ো বড়ো ৩৩ ১/৩ আরপিএম এলপি রেকর্ডের পাশাপাশি ছোটো ছোটো ৪৫ আরপিএম ইপি রেকর্ড। সেই রেকর্ডেই শোনা গান, ফাইভ হান্ড্রেড মাইলস। মার্কিন কোনো ব্যান্ডের। সে নাম আর মনে নেই। গানটার সুর যেমন মন কেমন করা, কথা শুনলেও গলার কাছটা কে যেন পেঁচিয়ে ধরেছে, মনে হয়। কালো শ্রমিকরা দক্ষিণের তুলো খেত থেকে উত্তরের শিকাগো অঞ্চলে এসে রেললাইন তৈরি করছে বছরের পর বছর। পাঁচ শো মাইল দূরে এসেছে সে তার নিজের বাবা মা স্ত্রী বা ভাই-বোনেদের থেকে.... যতদিন না রেলপথ তৈরি শেষ হবে ছুটি নেই তার। টাকাও নেই বাড়ি

যাবার। একটা পরার মতো শার্টও নেই তো। তবু ট্রেনের ভোঁ শুনলেই মন ছুটে যায় পাঁচ-শো মাইল দূরের সেই নিজের ঘরে, দেশে।....

If you missed the train I'm on
You will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles,
A hundred miles, a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles
Lord, I'm one, Lord, I'm two,
Lord, I'm three, Lord, I'm four
Lord, I'm five hundred miles away from home
Away from home, away from home,
Away from home, awya from home
Lord, I'm five hundred miles away from home
Not a shirt on my back
Not a penny to my name
Lord, I can't go back home this ole way
This ole way, this ole way,
This ole way, this ole way,
Lord, I can't go back home this ole way

গানটা শুনতাম তারপর থেকে বার বার। অথচ বুঝেও বুঝতাম না যেন ঠিক, এ কালো মানুষের কান্নার প্রকৃত ইতিহাসটা কী?

আসলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভাবলেই মনের মধ্যে যে রঙিন ভোগ্যপণ্যের বুদ্‌বুদগুলো ফাটতে থাকে সেগুলোর বাইরেও আর একটা মার্কিন দুনিয়া আছে ও ছিল। শুধু আমরা তার খবর রাখিনি হয়তো-বা। যদিও সংগীতে জ্যাজ ও ব্লুজ সেই গল্প বলে গেছে দীর্ঘকাল। দাস হিসেবে বিক্রি হওয়া কালো মানুষদের কথা। তাদের লড়াই। প্রথমে কৃষিপ্রধান সমাজে তাদের শ্রমদান। দক্ষিণের দিকের তুলো চাষে তাদের শরীরে প্রতি বিন্দু ঘাম নিংড়ে পড়েছে। তারপর সিভিল ওয়ার। যে অন্তর্যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের দৌড় ওই রুপোলি পর্দার 'গন উইথ দ্য উইন্ড' ছবিটি অব্দি। পরবর্তীতে উত্তরের অঞ্চলগুলিতে তাদের শ্রমিক হিসেবে যোগদান। শিল্পবিপ্লবের সুফলের প্রায় প্রতিটি কাহিনির পেছনেই আছে রেলপথ তৈরি, পাথর ফাটিয়ে রাস্তা বানানো আর স্টিম ইঞ্জিনের গতিপথে পড়ে থাকা অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশার কাহিনি।

আফ্রিকা থেকে জাহাজে করে চালান হওয়া কালো মানুষদের সুরেলা গলা আর ড্রাম-বাজানোর অনবদ্য ছন্দচেতনা, এসবের থেকে দক্ষিণের দিকের রাজ্যগুলিতে ব্লুজ-এর প্রচলন। তুলো চাষের, গম চাষের পরিশ্রমের মাঝে তাদের পিতৃপিতামহের গাওয়া ধর্মীয় চান্ট বা মাঠে কাজের সময়ের ছড়ার মতো করে হাঁক দেওয়ার (আমাদের দেশের পালকিবাহকের হুনহুনা বা মাঝির নৌকো বাওয়ার গান যেমন) সুর...., এই সব মিলিয়ে ব্লুজ।

নিউ অরলিন্স-এর আশেপাশেই জ্যাজ-এর প্রচলন কিন্তু ব্লুজ ও জ্যাজ বিস্তার লাভ করল দক্ষিণ থেকে মিড ওয়েস্টে, কেবলমাত্র ১৯৩০ ও ৪০ দশকেই।

এসব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ছিল আমার মনে। শিকাগোতে বসবাস করা আমার ঘনিষ্ঠ মানুষকেও প্রশ্ন করেছিলাম ব্লুজ গানের এত চর্চা কীভাবে শিকাগোতে এসেছিল? কালো মানুষদের জীবনের গাথা এই ব্লুজ-এর মধ্যে দিয়ে গাওয়া হয়, তার এত প্রচার প্রসার উত্তরের শহর শিকাগোতে কেন?

কীভাবে একদিন রেলপথ তৈরির কাহিনির সঙ্গে এই গল্পটা জুড়ে গেল আর আমার মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্নের নিরসন হল, তাই বলব আজ। ওয়াশিংটন ডি সির এক জাদুঘর। তাই বলে দিল আমায় কাহিনিটা।

২০০২-তে ওয়াশিংটন ডি সি গিয়েছিলাম একটি ট্রেনিং-এ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ন্যাশনাল মল, মূলত টুরিস্টদের ভ্রমণস্থল। একদিকে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, অন্যদিকে সুবিশাল লিঙ্কন মেমোরিয়াল। মধ্যবর্তী অংশে সবুজ পার্ক, সাজানো ভূমি ও জল। মেমোরিয়ালের ছায়া পড়া জলরাশির নিথর পুষ্করিণী। এরই আশপাশে আছে বেশ কিছু জাদুঘর। যেগুলো বিশ্ববিখ্যাত। এবং এখানে প্রায় প্রতিটিতেই প্রবেশ অবাধ। ন্যাশনাল গ্যালারি অফ আর্ট এখানে যেমন আছে তেমনই আছে এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম, সুবিখ্যাত সেই রাইট ভায়েদের এরোপ্লেন-সহ। স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টরি। যেখানে ডাইনোসরের কঙ্কাল থেকে বিশাল ম্যামথ সংরক্ষিত। সবটাই বিস্ময় জাগানো।

তবে আমাকে আক্রান্ত ও মুগ্ধ করেছিল যে অপেক্ষাকৃত ছোট জাদুঘরটি, সেটি অন্য। ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ আফ্রিকান আমেরিকান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার। এটা ওই জাদুঘর পাড়ারই আর একটি রত্ন। কনস্টিটিউশন অ্যাভেনিউতে।

এই জাদুঘরেই এক বেঞ্চিতে বসে একটি দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যমের ছায়াছবিতে জেনেছিলাম কীভাবে অসংখ্য শ্রমিক এসেছিলেন উত্তরে। ততদিনে দক্ষিণের দাস প্রথা রদ হয়েছিল। রদ হয়েছিল তাঁদের শরীরের ওপর মালিকের মালিকানা। কিন্তু দরিদ্র সেই মানুষগুলোর মুক্তি মেলেনি। উদয়াস্ত শ্রম থেকে মুক্তি মেলেনি। আফ্রো আত্মার মধ্যে স্বাধীনতার বাসনাটা যখন ছটফট করছে, ধনতন্ত্রের নতুন এক মালিকানা এসে পড়েছিল শরীরের ওপর। শ্রমিক সত্তা।

সে কাহিনি মর্মবিদারী। কিন্তু আফ্রো আমেরিকান শ্রমিকরা গানের ভেতর দিয়ে, কবিতা বা গল্পের ভেতর দিয়ে, সর্বদা অনমনীয় আশার কথা বলে গিয়েছেন। আজো বলেন। মায়া

এঞ্জেলু অথবা টনি মরিসন তাই ভীষণভাবে আমেরিকান। আফ্রো আমেরিকান সত্তাকে এঁরা এঁদের প্রতিভা দিয়ে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন। বাকি অনেক মূক কালো মানুষ তাঁদের সত্তায় এই একই আইডেন্টিটি বইছেন। এমা ফিতজেরাল্ডের গানে গানে, প্রেমের গানের সুরে, সে সত্তা যেন বিস্তার পায়।

আফ্রো আমেরিকান, অধুনা রাজনৈতিকভাবে বেঠিক শব্দ, 'কালো' মানুষদের নিয়ে গোটা একটা জাদুঘর, তার আশ্চর্য সব অ্যানেকডোট, স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে আমাকে জীবনের পাঠ শিখিয়েছিল। শিক্ষিত করেছিল। মার্কিন জাতিসত্তার একটা দিক উন্মোচিত করেছিল আমার কাছে। হ্যামবার্গার আর ছেঁড়া জিন্স-এর বাইরে, মার্কিনি বলতে কী বোঝায় তার অনেকটাই আমার মনে গড়ে দিয়েছিল। এখানে আছে দৌড়বীর কার্ল লুইস-এর সামগ্রী, আছে বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে তথা মহাম্মেদ আলির জিনিস, তার ভেতরে তাঁর ব্যবহৃত তোয়ালের রোব, ছোটোখাটো জিনিসের পাশাপাশি তাঁর নানা চ্যাম্পিয়নশিপের বিজ্ঞাপন বা হ্যান্ডবিল, নোটিশও আছে। আছে জ্যাজ গায়িকা ম্যাক্সিন সুলিভানের জীবনস্মৃতি।

তখনও আমার জীবনে গুগল আসেনি। হয়তো জানার ইচ্ছাটাও একটু দুর্বার ছিল। তাই এই দেখা আজও জীবন বদলে দেওয়া এক দেখা হয়ে আছে।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাঁটাতারে লেগে থাকা লাল কোট

ঘুমোতে পারিনি সেই রাত। ইউক্রেনের কিয়েভ (ওখানে উচ্চারণ ক্যীব) শহরের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক মিউজিয়াম (ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইউক্রেন ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার)-এ নিয়ে গেছিলেন স্থানীয় গাইড, সোনালি চুল সাদা চামড়ার মিষ্টি মেয়ে ইলিনা। অন্ধকার, কালচে এক বিশাল নিকেতন সেটি। সরকারি সংস্থানে তৈরি তাই কিঞ্চিত অপুষ্টিতে ভুগছে ইদানীং, মনে হয়েছিল আমার। কালো পাথরের ওপর রাখা গোলাগুলি, কামানের গোলা, শেল, এক বা একাধিক ভাঙা প্লেনের অবশেষ ইত্যাদি ঘরে ঘরে। বিষণ্ণতায় চোবানো সেই ঘরগুলি। লোহা দিয়ে তৈরি সোভিয়েট কাস্তে হাতুড়ির চিহ্ন, পতাকা। সৈনিকের তোবড়ানো হেলমেট। কী নেই সেখানে!

১৯৪১ থেকে ১৯৪৪, ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে সোভিয়েট ইউক্রেনের একাংশকে দখল করে অকুপেশন বা অবরোধ করেছিল হিটলার বাহিনী। ফ্যাসিস্ট জার্মানির অবরোধ, সেই ভয়াবহ দিনগুলির স্মৃতি এখানে তাজা হয়ে আছে আজও। নাৎসি যুদ্ধ দামামা বাজছে সোভিয়েট ইউনিয়নের দোরগোড়ায়, বাকি পশ্চিম ইউরোপ পেরোতেই পুব ইউরোপের মুখটাতে, সোভিয়েটের দ্বারপ্রান্ত ইউক্রেনের সীমানা। ইউক্রেনের শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে, খনিতে জল ঢুকিয়ে দিয়ে, কিয়েভের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছারখার করেছিল তারা। সেইসব ভাঙা গির্জে বা বাড়ির কিছু ভয়ংকর ছবিও ওখানে রাখা।

ইলিনা বলেছিল, বেশ গর্বের সঙ্গেই, যে, আমরা ওদের আর বেশিদূর ঢুকতে দিইনি। নাকি কিয়েভেই রুখে দিয়েছিল জার্মান নাৎসি বাহিনীকে সোভিয়েট সৈন্য। ইউক্রেনীয় ছেলেরা। সতেরো, আঠারো বছর বয়স তাদের।

অসংখ্য খবরকাগজ থেকে কাটা খবর আর ছবির মিছিল ছিল এক ঘরে। আর ছিল এক ভয়াবহ ফোটোগ্রাফ। কাঁটাতারে আটকে থাকা কোট। লাল ছোটো কোট। সাত-আট বছরের ছেলের। প্রতীকের মতো। ওই কাঁটাতার দিয়ে পালিয়ে জার্মান সৈন্যের হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করেছিল শিশুটি। বেঁচে ছিল নাকি মারা গেছিল? ধরা পড়ে গিয়েছিল?

পশম দিয়ে মোড়া জল বহনের টিনের ক্যান্টিন, পুরু ধুলোর আস্তরণে মোটা চামড়ার বুটজুতো, ছেঁড়া জামাকাপড়। ইতস্তত যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়ানো মানুষের বেদনার দলিল।

আর একটা ঘরে অসংখ্য চিঠি। বাবা-মাকে লেখা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছেলেপিলের চিঠি। আর তাদের ছবি। ফোটোগ্রাফ। তরুণ, যারা আর কোনোদিন যুদ্ধ থেকে ফেরেনি। হলদেটে পোস্টকার্ড সাইজের সেইসব তরুণদের ছবি, মিসিং পার্সন যারা, সুতো দিয়ে সিলিং থেকে পর পর ঝোলানো। সে এক অপ্রার্থিত আর বেদনাদায়ক চিত্র। সুররিয়ালিস্ট। ঝিম ধরানো।

৩। আর্মেনিয়ার গণহত্যা সংগ্রহালয়

অটোমান তুর্কিরা ছিল আর্মেনিয়দের জাতশত্রু। তাদের ঘটানো গণহত্যায় ১৯১৫ সাল নাগাদ সাত লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ আর্মেনিয় মারা গিয়েছিল।

ইয়েরেভান, আর্মেনিয়ার রাজধানী। আঙুরলতা আর পিচ ফলের বাগানে ভরা আর্মেনিয়া। অপরূপ সুন্দর। দূরে দেখা যায় আরারাত পাহাড়। যে-পাহাড়ের মাথায় রুপোলি টুপির মতো বরফ সারাবছর। আরারাত নামে ফুটবল টিম ১৯৭০ দশকে কলকাতায় খেলতে এসেছিল, মনে পড়ে? এই পাহাড়ের নামে নাম। আর্মেনিয়ার গর্ব সে। সর্বত্র আরারাত পাহাড়ের প্রতীক ছবি, ছড়িয়ে আছে প্রিয় ম্যাস্কটের মতো।

সেই পাহাড়ও কিন্তু চিরশত্রু তুর্কি দেশে। মানে একেবারে ঠিক যেখানে আর্মেনিয়ার সীমানা তার ওপারে।

ইয়েরেভানে দেখেছিলাম আছে ফেমিন মিউজিয়াম। স্মৃতি সত্তায় দগদগে ঘায়ের মতো বাঁচিয়ে রাখা, মনে রাখা, যে, এ দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষ। সে জাদুঘরে আমার যাওয়া হয়নি। গিয়েছিলাম গণহত্যা সংগ্রহালয়ে। সেখানে ছবিতে, গল্পে

কাহিনিতে দেখানো ছিল কীভাবে ১৯১৫ সালে কয়েক লাখ আর্মেনিয়কে বন্দি করে তুর্কির অটোমান সাম্রাজ্যের সৈন্যেরা পার্বত্য মরুভূমির ভেতর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছিল এবং ধীরে ধীরে অর্ধেক বন্দি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।
সেসব মাস এক্সোডাসের ছবি মনে গেঁছে আছে আজও।

৪। হলোকস্ট মিউজিয়াম, ফাঁকা তাক

তেল আবিব। ইস্রায়েলের রাজধানী। সুবিপুল এলাকাজুড়ে হলোকস্ট মিউজিয়াম। একেবারে শুরুর শুরুর কথাও আছে। ইহুদিদের খ্রিস্ট ধর্মের গোড়ার দিন থেকে কীভাবে আলাদা করে, ভিলেন বানিয়ে দেখানো হয়েছে সেই বৃত্তান্ত সাহিত্য গল্পকথা ছবি দিয়ে বোঝানো। তারপর হিটলারের উত্থানের গল্প। প্রতিটি বছরে হিটলার কী কী করেছিলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ অব্দি। নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত প্রতিটি নথি, প্রতিটি ছবি, শব্দও শোনা যাবে কান পাতলে, বক্তৃতার ভিডিয়ো টেপ বাজছে এ-কোণে ও-কোণে।

পাঠকদের অনেকেরই জানা এই বীভৎসতার গল্প। নাৎসিদের নির্মিত এই হলোকস্টের সম্বন্ধে একটাই কথা প্রযোজ্য, বেশিদিন আগে এটা ঘটেনি আর এর যাবতীয় বীভৎসতাকে তাই মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলা যাবে না, উলটে তৎকালীন প্রযুক্তির উচ্চতম মার্গে অবস্থান করেই জার্মান নাৎসিপন্থী ডাক্তার বদ্যি ইঞ্জিনিয়ারদের নির্মাণ ছিল এই মৃত্যুযজ্ঞ। গ্যাস চেম্বার থেকে বেরোনো নগ্ন মৃতদেহের পাঁজা দেখে সারা বিশ্ব ছি ছি করলেও কেউ তো বন্ধ করতে পারেনি এ-কাজ। মৃত ইহুদিদের সোনা বাঁধানো দাঁতের থেকে সোনা বের করে নেওয়া বা জীবিত ইহুদির রক্তে নানা বিষ ঢুকিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার ছবিগুলো যত দেখা যাবে তত বোঝা যাবে চূড়ান্ত 'শিক্ষিত' ও 'সভ্য' পৃথিবীর পক্ষে কতখানি নৃশংসতা সম্ভব।

পোলান্ডের আউৎস উইজের মিউজিয়াম অনেকেই দেখেছেন, আমার দেখা নয়। ওয়াশিংটন ডি সি-তেও একটি অসাধারণ হলোকস্ট মিউজিয়াম আছে।

এই তেল আবিরের সংগ্রহালয়ের শুধু দুটো জিনিসের কথাই উল্লেখ করতে চাই। এক, একটা গোটা ঘর জুড়ে রাখা আছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদিদের আঁকা ছবি কবিতা লেখা, ডায়েরি চিঠি, যা তাঁরা গোপনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে গিয়েছিলেন লোহার কৌটোয় করে মাটির তলায়। যুদ্ধ থেমে যাবার বহু পরে আবিষ্কৃত সেসব শিল্পকর্মে বোঝা যায় একটাই প্রত্যয়। ওঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন পৃথিবী ওঁদের সঙ্গে শেষ হবে না। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আসবে ভবিষ্যতে আবার। তারা আবার ওঁদের লেখা ও ছবি দেখবে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এই ভাবনাটা ভাবা সোজা নয়।

আর আরেকটি গোলমতো ঘর। সে ঘরে অসংখ্য তাক। সেইসব তাকের অনেক অংশ ভরা নানা ফাইল ফোল্ডার দিয়ে। সেসব ফাইল মৃত ইহুদিদের এক-একজনের নামে নামে। যাঁদের হদিশ, দেহাবশেষ, লেখা, পরিচয় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। আর বাকি ফাঁকা তাকগুলো?

আরো অসংখ্য নিখোঁজ বেহদিশ ইহুদিদের জন্য।

ওখানেই লেখা আছে, হে দর্শক, এই ফাঁকা তাকগুলো ভরাবার জন্য আপনাকেও কিছু করতে হবে। এখনও খোঁজ চলছে, হারিয়ে যাওয়া নামহীন মুখহীন সেই গণহত্যায় নিহত ইহুদিদের।

উপসংহার

আমার কথাটি এখানেই ফুরোল। বাকি থেকে গেল আনন্দের আহ্লাদের বিস্ময়ের কিছু দেখাশোনা, কিছু সত্যিকারের জাদু ভরা জাদুঘরের কৌটোর কথা হয়তো। যে বিষণ্ণতার কথা না বললেই নয়, তা হল, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার যে গল্পকথা আমরা শুনেছি, তার চেয়েও বেশি কাতরতার সঙ্গে শুনেছি দেশভাগের কথা। ভারত পাকিস্তান ভাগাভাগির ইতিহাসের বীভৎসতা কিন্তু কোথাও জাদুঘরে ধরা নেই। অন্তত বাংলা আর পাঞ্জাবে নিদারুণ বিচ্ছেদ ও ক্ষতের ডকুমেন্টেশন সেভাবে কোথায়? কিছু বইপত্রে ছাড়া? জাদুঘর ইতিহাসকে প্রকট করে বর্তমান করে দেখায়। অথচ, মুখে মুখে শোনা দাদু-দিদিমার স্মৃতিচারণেই আমাদের কর্তব্য আমরা শেষ করেছি। আমাদের কেন নেই কোনো সংগ্রহালয়, যেখানে রাখা থাকবে সেইসব ছবি, কথা, দলিল?

টাকা দিয়ে যা কেনা যায় এবং যায় না

অমিতাভ গুপ্ত

ট্রাম্পসাহেবের একটা মস্ত গুণ— যেকোনো জিনিসকেই কুৎসিত একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন তিনি। গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার প্রস্তাবটাকেও শেষ অবধি ডেনমার্কের সঙ্গে কূটনৈতিক সংকটে পৌঁছে দিয়েছিলেন প্রায়। এই লেখা ছাপা হতে হতে আরো অনেক জল বয়ে যাবে অতলান্তিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের দুই উপকূলে, আরো অনেক কুকথার স্রোত বওয়াবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তাই একবার মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, ট্রাম্পসাহেব বলেছিলেন, গ্রিনল্যান্ড অঞ্চলটাকে কিনে নেওয়ার কথা ভাবছেন তিনি। আট লক্ষ বর্গমাইলেরও বড়ো এই দ্বীপে বাসিন্দার সংখ্যা এক লক্ষেরও কম। উত্তর মেরুবৃত্তে তো বটেই, গোটা দুনিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ এই গ্রিনল্যান্ড। ডেনমার্কের রাজত্বের অন্তর্গত, অবশ্য গত কয়েক দশক ধরে স্বশাসিত। ট্রাম্পের প্রস্তাবের উত্তরে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ব্যাবসা করতে চাইলে স্বাগত, কিন্তু গ্রিনল্যান্ড বিক্রি করার জন্য নয়। এই কথার উত্তরে ট্রাম্প আরো খানিক মন্দ কথা বললেন, বাতিল করে দিলেন ডেনমার্ক সফর। কিন্তু, আমাদের আলোচনার জন্য সেই কথায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ট্রাম্প কিনতে চেয়েছেন, আর ডেনমার্ক জানিয়েছে যে গ্রিনল্যান্ডকে কেনা যাবে না— আমাদের আলোচনা শুধু এই অবস্থানদুটোকে ঘিরেই।

ট্রাম্পের প্রস্তাবটা প্রথম বারে শুনলে যতখানি অবাস্তব ঠেকে, কিন্তু ততটাই অবাস্তব কি? শিল্পের প্রয়োজনেই হোক বা বাড়িঘর তৈরি করার জন্য, জমি তো কেনা-বেচা চলেই। হাজার বা পাঁচ হাজার একরে যদি আপত্তি না থাকে, আট লক্ষ বর্গমাইলেই-বা নৈতিক আপত্তি থাকবে কেন? শুধু মাপের হেরফেরে নীতি পালটানোর কথা নয়। ট্রাম্পসাহেব যদি বলেন, পঞ্চাশ হাজার বাসিন্দার প্রত্যেকের সম্মতি নিয়ে, প্রত্যেককে তাঁদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে আর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তবেই নেওয়া হবে গ্রিনল্যান্ডের জমি— যাঁদের জমি, তাঁদের সম্মতিক্রমে, কোনো জোরজুলুম ছাড়া, যথেষ্ট ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে যদি জমি অধিগ্রহণ করা হয়, তবে আপত্তি করব কেন? বিশেষত, গ্রিনল্যান্ডের মানুষরা আর্থিকভাবে বেশ কষ্টেই থাকেন। তাঁদের জীবিকার সুযোগ কম, আয়ের পরিমাণও কম। ফলে, আমেরিকার কাছে জমি বিক্রি করে তারা যদি আমেরিকারই কোনো প্রান্তে পুনর্বাসন পান— অনুমান করা চলে, বেশিরভাগ লোকই আগের তুলনায় ঢের ভালো থাকবেন। আর্থিকভাবে, জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানের নিরিখেও। যে স্বেচ্ছা-বিনিয়োগে ক্রেতা এবং বিক্রেতা, উভয়পক্ষই আগের চেয়ে ভালো থাকতে পারেন, তাতে আপত্তি করার কারণ কোথায়?

অর্থনীতির যুক্তিতে আপত্তির কারণ পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। একমাত্র গ্রহণযোগ্য কারণ হতে পারে পরিবেশ। উত্তর মেরুবৃত্ত গোটা দুনিয়ার পরিবেশের পক্ষেই অতি তাৎপর্যপূর্ণ। ডোনাল্ড ট্রাম্প বা শি জিনপিং-রা এই দেশে যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম করতে চান, তাতে পরিবেশের ক্ষতি হবে অপূরণীয়। বিশ্ব উষ্ণায়নের বেগ বাড়বে, অভিঘাতও। তার ফলে গোটা পৃথিবীর যে ক্ষতি হবে, তা বহুগুণে ছাপিয়ে যাবে গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দা আর তাঁদের জমি কিনে নেওয়া রাষ্ট্র বা বাণিজ্যিক সংস্থার সম্মিলিত আর্থিক লাভকে। অর্থনীতির পরিভাষায় এই ক্ষতিকে বলে এক্সটার্নালিটি— অতিক্রিয়া। পৃথিবীর সেই বৃহত্তর ক্ষতির খোঁজ রাখার বাজারের প্রক্রিয়া এই অতিক্রিয়ার হিসেব রাখে না, ফলে বাজারের বাইরের কোনো শক্তিই পারে এই অতিক্রিয়াকে মাথায় রেখে বাজারের প্রক্রিয়া থামিয়ে দিতে। সেই শক্তি রাষ্ট্রও হতে পারে, আবার সম্মিলিত জনমতও হতে পারে।

কিন্তু ট্রাম্পসাহেব যদি গ্রিনল্যান্ডের বদলে অন্য কোনো দেশকে কিনে নিতে চাইতেন? ধরুন, আফ্রিকার কোনো হতদরিদ্র দেশ— যেখানে কলকারখানা তৈরি হলে অথবা মাটির নীচের খনিজ তুলে নিলে, অথবা দেশটাকে আধাআধি চিরে ফেলে কোনো বাণিজ্যপথ তৈরি হলে পরিবেশের ওপর এমন কোনো নাটকীয় প্রভাব পড়ত না, অথচ এই বাণিজ্যিক বিনিময়ে সেই দেশের গরিবগুরবো মানুষগুলো আগের চেয়ে

ঢের ভালো থাকতেন? তাহলে অর্থনীতির কোন যুক্তিতে আপত্তি করতাম সেই কেনা-বেচায়?

হার্ভার্ডের দার্শনিক মাইকেল জে স্যান্ডেল বলবেন, দেয়ার আর থিংস দ্যাট মানি কান্ট বাই। অ্যান্ড দেয়ার আর থিংস দ্যাট মানি ক্যান বাই, বাট শুডন্ট। কড়ি দিয়ে যদি কেনা যায়ও, তবু কেনা উচিত নয়, এমন জিনিস আছে— স্যান্ডেল তাঁর 'হোয়াট মানি কান্ট বাই' বইটিতে সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি ক্রীতদাসের কথা বলেছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় বিক্রি হয়ে যেতে চায়, তবুও সভ্য সমাজের কর্তব্য সেই বিনিময়কে ঠেকানো, কারণ নিজের সম্পূর্ণ সত্তার ওপর পূর্ণ অধিকার কোনো মানুষের নেই— তাকে বিক্রি করার অধিকার সেই ব্যক্তির থাকতে পারে না। আমার সামগ্রিক অস্তিত্ব নামক বাড়িতে আমি ভাড়াটে মাত্র— সেখানে থাকার অধিকার আমার আছে, কিন্তু সেই বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার নেই। অর্থনীতির ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, অস্তিত্বের কোনো বাজার থাকা সম্ভব নয়, কারণ অস্তিত্বের মালিকানা কারও নেই।

এই যুক্তিটাকে আর একটু বাড়িয়ে নেওয়া যায় না? এই অতিজাতীয়তাবাদের যুগে দাঁড়িয়ে দেশ নিয়ে কিছু বলতে ভয় করে— তবু, দেশ নামক ধারণাটি আমাদের অত্যাগসহন অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়? দেশ বলতে যে শুধু তার মানচিত্র নয়, কোনো ভৌগোলিক পরিসীমা নয়— হয়তো 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' ধানের শীষের ওপর যে শিশিরবিন্দুটি দেখেছি আমরা কেউ কেউ, সেটাই কারও কাছে দেশ। কেউ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্বের সেই অংশটা বিক্রি করে দিতে চাইলেও কি তার সেই অধিকার থাকতে পারে? অথবা, বহু প্রজন্ম ধরে অর্জিত এবং চর্চিত স্বশাসনের অধিকার— দেশটাকে নিজের, নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার স্বাধীনতা? সেটাও কি চাইলেই বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে? বাজার অর্থনীতি এই প্রশ্নগুলোর তোয়াক্কাই করবে না। তা বলে প্রশ্নগুলো অবৈধ হয়ে যায় না। কীভাবে বাজার এই যুক্তিটাকে মানতে— অন্তত বিবেচনা করতে— বাধ্য হয়, সেই পথ খোঁজা হল রাজনীতির কাজ।

আরো একটা বড়ো প্রশ্নের জায়গা হল 'সম্মতি'। ক্ষমতা কীভাবে সম্মতি আদায় করে ছাড়ে, আমরা কম-বেশি জানি। কিন্তু, ধরে নেওয়া যাক, সম্মতি আদায়ের জন্য কোনো গা-জোয়ারি করবে না কেউ। যাঁরা রাজি হবেন, প্রত্যেকেই প্রকৃত অর্থে স্বেচ্ছায় রাজি হবেন। বাজার অর্থনীতি বলবে, রাজি হওয়ার পিছনে থাকবে একটা অনিবার্য কস্ট-বেনিফিট অ্যানালিসিস— লাভ-ক্ষতির অঙ্ক। অর্থাৎ, প্রত্যেকে হিসেব করে দেখবেন তাঁরা কী দিচ্ছেন, আর বিনিময়ে কী পাচ্ছেন— যদি পাওয়ার দিকে পাল্লা ঝোঁকে, তবেই তাঁরা সম্মত হবেন। অর্থনীতির যুক্তি বলবে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ সম্পূর্ণ র‍্যাশনাল— কীসে তাঁদের সবচেয়ে ভালো, সেই কথা মাথায় রেখে, তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখেই তাঁরা প্রতিটা সিদ্ধান্ত নেন। অতএব, একটা ভৌগোলিক পরিসরের সব মানুষ যদি স্বেচ্ছায় তাঁদের জমিজমা বেচে দিতে রাজি হন, তবে তার ওপর আর কথা চলে না। সেই সিদ্ধান্তটাই যে তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো, এটা মেনে নিয়ে চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এই যুক্তিটার প্রায় প্রতিটি শব্দে আপত্তি করা সম্ভব, এবং উচিত। প্রথম আপত্তি মানুষের র‍্যাশনালিটি সম্বন্ধে এই নিশ্চয়তা নিয়ে। বিহেভিয়েরাল ইকনমিক্স বা আচরণবাদী অর্থনীতি নামে অর্থশাস্ত্রের একটা গোটা শাখা গড়ে উঠেছে, যার মূল বক্তব্যই হল— প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে মানুষকে যতখানি র‍্যাশনাল বলে ধরে নেওয়া হয়, মানুষ আসলে মোটেই ততখানি যুক্তিসিদ্ধ নয়। তার সিদ্ধান্তে প্রভাব পড়ে হরেক আবেগের, বায়াস বা ভ্রান্তির, পরিস্থিতির চাপের, মানসিক অবস্থার। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলার অবকাশ এই লেখায় নেই, কিন্তু র‍্যাশনালিটি যে আদৌ স্বতঃসিদ্ধ নয়, এটুকু মনে করিয়ে দেওয়া ভালো।

একইরকম জরুরি এটা মনে করিয়ে দেওয়া যে নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে একেবারে নিখুঁত সিদ্ধান্ত নিতে গেলে নিজের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব তথ্য মজুত থাকতে হয় মগজে। শুধু নিজেরই নয়, গোটা দুনিয়ার সব কিছুরই— কারণ, আমাজনের অরণ্যে কোনো প্রজাপতি পাখা নাড়লে শেষ অবধি ভূমিকম্প হতে পারে জার্মানিতে— আর, এখন তো আমাজনে প্রজাপতি পাখা নাড়ছে না, আগুন জ্বলছে দাউদাউ। বাজার অর্থনীতি ধরে নেয় যে আমাদের প্রত্যেকের মগজে ঠাসা আছে এই সমস্ত তথ্য। ধরে নেওয়ার কারণ খুব সহজ— এটা ধরে না নিলে তার পরের যুক্তিগুলো আর সাজানো যায় না। সম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত বলেই বাজার অর্থনীতি দাবি করে, মানুষ স্বেচ্ছায় যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই তার পক্ষে সেরা। কিন্তু, মানুষেরই তো মগজ, সুপার-কম্পিউটার তো নয়। কী করে হিসেব রাখবে এত কিছুর? গ্রিনল্যান্ডের লোকরা যদি স্বেচ্ছাতেই নিজেদের জমি-বাড়ি বেচে স্থানান্তরিত হতে চান অন্যত্র, যদি এই মুহূর্তে ভাবেনও এটাই তাঁদের পক্ষে সেরা সিদ্ধান্ত— ভবিষ্যতের ঘটনাক্রম যে সেই ধারণা পালটে দেবে না, তার ভরসা কোথায়?

জমি বেচে, দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার মতো বিনিময়ের একটা তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রলক্ষণ হল, এই বিনিময়ে যা ছাড়ার, তা ছাড়তে হয় বিনিময়ের মুহূর্তেই— কিন্তু যা পাওয়ার, তার অংশবিশেষ থাকে ভবিষ্যতে। ধরুন, আমেরিকার হাতে দেশ বেচে সবাই স্থানান্তরিত হলেন আমেরিকারই কোনো প্রান্তে। এই মুহূর্তে প্রত্যাশা, মার্কিন অর্থনীতির অংশ হতে

পারলে পালটে যাবে তাঁদের জীবনযাত্রার মানও। তাঁরা ভালো থাকতে আরম্ভ করবেন। এই মুহূর্তে সেই প্রত্যাশার ওজন গ্রিনল্যান্ডের তুষারকঠোর পরিবেশ ছাড়ার ক্ষতির চেয়ে ঢের বেশি হতেই পারে তাঁদের কাছে। কিন্তু, প্রত্যাশা মানেই ভবিষ্যতের গল্প। মার্কিন মুলুকে তাঁরা সাংস্কৃতিকভাবে মানিয়ে নিতে পারবেন; সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁদের পক্ষে মানানসই হবে; বাজারে যে কাজ আছে, তা পাওয়ার মতো এবং করার মতো দক্ষতা তাঁদের থাকবে অথবা তাঁরা তা অর্জন করে নিতে পারবেন; তাঁদের বিদেশি, অভিবাসী পরিচিতি তাঁদের কাজ পাওয়ার বা সামাজিকভাবে বেঁচে থাকার পথে কোনো বাধাবিপত্তি তৈরি করবে না— এতগুলো শর্ত পেরিয়ে তবে সেই প্রত্যাশার বাস্তবায়ন সম্ভব। বিনিময়ের সিদ্ধান্ত করার সময় কেউ কি জানতে পারে যে এর প্রত্যেকটা তাঁর অনুকূলেই ঘটবে? যদি না ঘটে, তখন পুরোনো অবস্থানে ফিরে যাওয়ার উপায়মাত্র থাকবে না। কাজেই, এই মুহূর্তে তাঁরা রাজি হলেও সেটাই তাঁদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত, এমনটা দাবি করা মুশকিল।

কিন্তু, সেই সিদ্ধান্ত যদি ভুলও হয়, যদি তাঁরা ভবিষ্যতে আফশোস করতে বাধ্যও হন, তাতেই-বা আপনি-আমি আপত্তি করার কে? ভুল করার অধিকারও তো মানুষের থাকা উচিত, তাই না? একেবারেই। তবে, সেই ভুলটা যাতে অজ্ঞতাবশত না হয়, সেটুকু নিশ্চিত করার অধিকার আমাদের বিলক্ষণ আছে। যে-জীবনের প্রত্যাশা তাঁরা করবেন, অথবা তাঁদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে, তার মধ্যে কতখানি বাস্তব আর ক-আনা নিখাদ প্রচার, সেটা ভেঙে দেখানোর অধিকার আছে আমাদের। সেই বাস্তবে পৌঁছোতে গেলেও পেরোতে হবে কোন কোন ধাপ, সেগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার অধিকারও আছে। এটাই কিন্তু রাজনীতির কাজ। এবং, পক্ষ নিতে হবে আরো অনেকের, এই বিনিময়ে যাদের মত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ, না-মানুষদের। যেকোনো বিনিময়ই মানুষ-কেন্দ্রিক শুধু নয়, মানুষ-সর্বস্ব। কিন্তু, উত্তর মেরুবৃত্ত হোক বা সাহারার দক্ষিণবর্তী আফ্রিকা, পৃথিবীর কোনো প্রান্তই তো শুধু মানুষের নয়। অন্য প্রাণীদেরও, উদ্ভিদেরও। এই বিনিময়ে তাদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্বও আমাদের, বৃহত্তর রাজনীতির।

লেখাটা একটা বিপজ্জনক জায়গায় চলে গেল। যুক্তিগুলোকে পর পর সাজালে মনে হতেই পারে, এই লেখায় সওয়াল করা হচ্ছে উন্নয়নের বিপক্ষে। দাবি করা হচ্ছে, যে যেখানে যেমনভাবে আছে, ঠিক তেমনটা না থাকলে চলবে না। সেকথা কিন্তু বলতে চাই না। এমনকী, পুঁজিবাদী উন্নয়নেরও সার্বিক বিরোধিতা করতে চাই না। গত দেড়-শো বছরের ইতিহাস সাক্ষী, শিল্পবিপ্লবপ্রসূত উন্নয়ন দুনিয়ার ক্ষতি করেছে অনেক, কিন্তু উপকারও করেছে অপরিসীম। সেই উপকারকে অস্বীকার করে কোন আহাম্মক? এতদিন যা হয়নি, আজ যদি পুঁজিবাদ সেরকম কোনো পথে চলে— একটা গোটা দেশ বা অঞ্চল কিনে নেওয়ার মতো পথ— তাতে যে অবিমিশ্র মন্দই হবে, তেমন ভবিষ্যদ্বাণী করারও কোনো প্রশ্ন নেই। গ্রিনল্যান্ডে পুঁজিবাদী বিস্ফোরণ হলে তার ফল পৃথিবীর পক্ষে ভালো হবে না, এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়— বিশ্ব-উষ্ণায়নের বিপদ এখন দরজায় প্রবল জোর কড়া নাড়ছে— কিন্তু সেই ভালো না হওয়ার দায় অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের, প্রকৃতির ওপর গা-জোয়ারির, দেশ বিক্রি করার নয়। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে, যেখানে উষ্ণায়নের প্রভাব এত প্রত্যক্ষ আর তীব্র নয়, সেখানেও যে দেশ বিক্রির ফল সম্পূর্ণ মন্দই হবে, তেমনটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় কি? বিশেষত সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন চিন বের করে ফেলেছে উপনিবেশ স্থাপনের সম্পূর্ণ নতুন একটা পথ— দেনার দায়ে জড়িয়ে ফেলে কোনো দেশের সরকারকে চিনের অঙ্গুলিনির্দেশে চলতে বাধ্য করা? হয়তো ভালোই হবে সবমিলিয়ে।

কিন্তু, প্রশ্নটা সেই ভালো-মন্দের নয়। বাজার যে যুক্তিতে এই ভালো হওয়ার কথাগুলো সাজিয়ে বলে, তার মধ্যে ফাঁকফোকর কোথায়, খামতি কোথায়— সে কথাগুলো স্পষ্টভাবে বলা জরুরি। টাকা দিয়ে কেনা গেলেও সব কিছু কেনা উচিত হবে কি না, এই ভাবনাটাকে জিইয়ে রাখা জরুরি। তাহলে অন্তত কেনা-বেচার আগে পুরো ছবিটা দেখার চেষ্টা হবে।

পৃথিবীটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই দেখার কোনো বিকল্প নেই।

লোকবাদ কাকে বলে?

মইদুল ইসলাম

রাজনৈতিক তত্ত্বের কর্মকাণ্ডে ইংরেজি ভাষায় আজকাল 'পপুলিজম' নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে কলকাতা নিবাসী এক প্রবীণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উদ্যোগে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ে পপুলিজমকে 'লোকবাদ' ও পপুলারকে 'জনপ্রিয়' এবং 'লোকায়ত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পপুলিজমকে তাই আমরা লোকবাদ ও জনপ্রিয়তাবাদ এই দুই শব্দবন্ধ দিয়ে চিহ্নিত করব। অন্যদিকে 'পপুলিস্ট' শব্দের বাংলা অনুবাদ তিন ধরনের হতে পারে : (১) লোকবাদী (২) জনপ্রিয়তাবাদী এবং (৩) জনমোহিনী। ইদানীং রাজনৈতিক পণ্ডিতরা ইংল্যান্ডে ব্রেক্সিট ভোট, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনকে জনপ্রিয়তাবাদের উত্থান হিসেবে দেখেছেন। লাতিন আমেরিকাতেও বহু দেশে জনপ্রিয়তাবাদের রমরমা দেখা গেছে এবং এখনও ওই মহাদেশে জনপ্রিয়তাবাদের জনপ্রিয়তা বেশ কায়েম আছে বলে অনেক রাজনীতি বিশারদ মনে করেন। আমাদের দেশে নরেন্দ্র মোদীর উত্থান বা পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতিকে জনমোহিনী রাজনীতি ও তৃণমূল দলকে অনেকে জনপ্রিয়তাবাদী দল বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু লোকবাদ বা জনপ্রিয়তাবাদ কি একটি বিশেষ রকমের আন্দোলন বা আবেগ অথবা মতাদর্শ? লোকবাদী দল ও সরকারের পিছনে কি কোনো বিশেষ ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন থাকে? লোকবাদ কি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী ও শ্রেণিস্বার্থ পূরণ করে? জনতা বা জনগণ বলতে আসলে আমরা কী বুঝি আর জনপ্রিয়তাবাদের তত্ত্বের নিরিখে জনগণ বা জনতা কী? এই প্রবন্ধে উপরে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজব।

রাজনৈতিক তত্ত্বের নিরিখে লোকবাদ

লোকবাদ নিয়ে রাজনৈতিক তত্ত্বের সবথেকে প্রধান, যথাযথ এবং বাস্তবধর্মী তাত্ত্বিক হলেন আর্নেস্তো লাকলাউ। তাই তাঁর লেখার ভিত্তিতে আমরা লোকবাদ নিয়ে আলোচনা করব। প্রধানত লাকলাউয়ের 'ওন পপুলিস্ট রিজন' বইটির কয়েকটি তাত্ত্বিক দিক ও বাস্তব রাজনীতির কিছু উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হবে এই প্রবন্ধে। উল্লিখিত বইতে লাকলাউ খুব পরিস্কার করে বলে দিচ্ছেন যে লোকবাদ কোনো বিশেষ আন্দোলন বা আবেগ অথবা মতাদর্শ নয়। লোকবাদী দল ও সরকারের পিছনে কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন থাকে না। লোকবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটা বৃহত্তর জনসমাবেশ গঠন করা সম্ভব। সেদিক থেকে লোকবাদ বা জনপ্রিয়তাবাদ হল জনতা বা জনগণের একটা ধারণা গঠন করার রাজনৈতিক কৌশল যা ক্ষমতার বিপরীতে থাকবে এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, স্বার্থ, সরকার বা দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। লোকবাদ এমন একটি জনসমাগমের রাজনৈতিক কৌশল যা বিভিন্ন রকমের শ্রেণি, গোষ্ঠী, জাত, লিঙ্গ, ভাষার মানুষকে একত্রিত করতে সক্ষম। তাই দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী মতাদর্শের রাজনীতি নির্বিশেষে লোকবাদ হয়। লোকবাদ ছাড়া বড়ো রাজনৈতিক সমর্থন যেকোনো দল বা আন্দোলনের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই লাকলাউ লোকবাদকে রাজনীতির একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য যুক্তি হিসেবে দেখেন। কোনো বিশেষ ধরনের আন্দোলন, দল বা মতাদর্শ হিসেবে নয়। তাই রাজনীতি থাকলে লোকবাদও থাকবে। রাজনীতির সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

জনগণের সমাগম ও জনমোহিনী রাজনীতির একদম প্রাথমিক ভিত্তি হল 'দাবি'। তাই যেকোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দিক থেকে গোষ্ঠী হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল দাবি। এক বিশেষ ধরনের দাবিকে সামনে রেখে কিছু মানুষ একত্রে আসে এবং কোনো একটি গোষ্ঠীর গঠন হয়। তাই রাজনৈতিক যুক্তির বিচারে গোষ্ঠী কোনো প্রদত্ত পরিচিতির উপর নির্মিত নয় বরং লাকলাউয়ের মতে তার গভীর ও মৌলিক ভিত্তি হল দাবি। পরিচিতি বা নামের অবশ্য গুরুত্ব আছে গোষ্ঠীর গঠনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাথমিক স্তরে এক বা একাধিক দাবি পেশের মাধ্যমে

গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে দলিত মানুষ বা সম্প্রদায়ের কথা। যাকে আমরা দলিত মানুষ বলে জানি তা সামাজিক স্তরে অনেকগুলো জাতি দ্বারা বিভাজিত। ভারতীয় সংবিধানেও দলিত শব্দের বদলে শিডিউলড কাস্টস শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দলিত মানুষের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতিভেদ থাকলেও কয়েকটি প্রধান দাবিকে সামনে রেখে বহু জাতিবিভক্ত অনেক মানুষ যারা আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে পিছিয়ে, চতুর্বর্ণীয় হিন্দু সমাজের বাইরে অবস্থিত ও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের বৈষম্য, নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'দলিত' নামক শব্দবন্ধ ও রাজনৈতিক সত্তার পতাকাতলে একসঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পেরেছে। সেই দাবিগুলোর অন্যতম ছিল দলিতদের মন্দিরে ঢোকার দাবি এবং আর পাঁচটা উচ্চবর্ণীয় মানুষের মতো একই মন্দিরে পুজো করার স্বাধীনতার দাবি। তা ছাড়া অস্পৃশ্যতা বিলোপ করার দাবি এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবিকে কেন্দ্র করে এক 'দলিত মানুষের' ধারণাকে নির্মাণ করা সম্ভব হল যা আদতে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। উপরে উক্ত দাবিগুলোকে কেন্দ্র করে যেমন দলিত জনতার নির্মাণ হল তেমন বিভিন্ন জাতি যথা চণ্ডাল, মহার, বাউড়ি, বাগদি, পৌন্ড্র, নমঃশূদ্র, ডোম, পাটনি, চামার ইত্যাদির মতো আরও শত শত জাতে বিভক্ত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছড়িয়ে থাকা ওই মানুষগুলোকে দলিত নামে (যার আক্ষরিক অর্থ বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, দমিত ইত্যাদি) সম্বোধিত করার যে প্রেক্ষাপট তৈরি হল তার ভিত্তি ছিল কিছু দাবি।

এবার আসা যাক দাবিগুলোকে কার কাছে পেশ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে এবং দাবি রচনার পরের ধাপ প্রসঙ্গে। দাবি তোলার মধ্যে কেবল রাজনীতি থেমে থাকে না। দাবিকে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত করতে হয় কোনো একটি ক্ষমতাধর বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে। এই ক্ষমতাধর— ক্ষমতাশীল ব্যক্তি বা শাসক গোষ্ঠী অথবা সরকারও হতে পারে। দাবি কিন্তু প্রথমে একটি অনুরোধের পর্যায়ে থাকে। সেই অনুরোধ যদি মেনে নেওয়া হয় এবং তদুপরি প্রাথমিকভাবে সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে দাবি পূরণ করা হয় তাহলে আর কোনো সমস্যা রইল না। কারণ ব্যাপারটা তখনই চুকে গেল। তাই দাবি পূরণের মাধ্যমে ওই বিশেষ সন্ধিক্ষণে রাজনীতির আর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি হয় যদি কোনো দাবিকে না মানা হয়। কারণ কোনো একটি বিশেষ দাবি না মানার ফলে বৃহত্তর জনসমাজে সেই ক্ষমতার বৃত্ত সামনে চলে আসে যে বা যারা দাবি মানেনি। অর্থাৎ একটা বৈরিতার সীমানা তৈরি হয় যেখানে কিছু মানুষের দাবি একদিকে আর ক্ষমতাধর ব্যক্তি, দল বা শাসক অন্যদিকে। যেই মাত্র একটি দাবিকে মানা হল না তখন সেই দাবি একটা অপূর্ণতার রূপ বা অপূরণীয় দাবি বলে গণ্য হল। হয় সেই অপূর্ণ দাবি মেটাবার জন্য আরও বড়ো আকারের বিক্ষোভ, আন্দোলন, প্রতিবাদ, সংগ্রাম ইত্যাদি সংগঠিত করার একটা সুযোগ থাকবে অর্থাৎ দাবি পূরণের রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি হবে অথবা অনেকগুলো অপূর্ণ দাবির মিলনক্ষেত্র হিসেবে একটা বৃহত্তর জনআন্দোলনের সম্ভাবনা থাকবে। এই বৃহত্তর জনবিক্ষোভের পটভূমি গড়ার পিছনে জনমোহিনী রাজনীতির প্রক্রিয়া কাজ করে যেখানে বহু অপূর্ণ দাবি এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্র, সরকার, ক্ষমতাসীন স্বার্থ, ক্ষমতাধর ব্যক্তি ইত্যাদিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

গণতান্ত্রিক দাবি ও জনপ্রিয় দাবি

লাকলাউ যেকোনো দাবিকে গণতান্ত্রিক দাবি বলে চিহ্নিত করেন। কারণ দাবি কোনো একটি অসহায় ও অবহেলিত মানুষ করছেন একটি বিশেষ মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তি বা শাসকের কাছে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক দাবি বা দাবিসমূহকে অন্যান্য দাবিগুলোর থেকে আলাদা করে গ্রাস বা পূরণ করার সামর্থ্য রাখে ক্ষমতার বৃত্ত। কিন্তু অনেকগুলো অপূর্ণ দাবিসমূহকে একত্রিত করা ও সামঞ্জস্য রূপ দেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি জনপ্রিয় দাবি বা জনপ্রিয় দাবিসমূহতে পরিণত হয়। তাই জনপ্রিয় দাবি ক্ষমতার বৃত্তকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। গণতান্ত্রিক দাবি আর জনপ্রিয় দাবির প্রধান তারতম্য হল প্রথমটি ক্ষমতাসীন বৃত্ত পূরণ করার সামর্থ্য রাখে আর দ্বিতীয়টি ক্ষমতাসীনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবার সামর্থ্য রাখে।

গণতান্ত্রিক দাবির সঙ্গে লাকলাউ 'বিভিন্নতার যুক্তি'-র যোগ দেখেন যেখানে ক্ষমতাসীন বৃত্ত গণতান্ত্রিক দাবিকে অন্য আরো কিছু গণতান্ত্রিক দাবির থেকে আলাদা করে পূরণ করতে পারে। ধরা যাক বাংলায় ডাক্তারদের কোনো সমস্যা হয়েছে এবং ডাক্তাররা কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ করছে, ধর্মঘটে গেছে, কর্মবিরতি পালন করছে। এই চিত্র জুন মাসে ডাক্তারদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলার মানুষ দেখেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন বৃত্ত (এখানে বঙ্গের রাজ্য সরকার) তাদের দাবিগুলোকে মেনে নিল এবং তাদের সমস্যা নিরসনের পথ অবলম্বন করল। তাদের দাবিগুলোকে মেনে নিয়ে একদিকে যেমন অন্য অনেক পেশার দাবিসমূহ থেকে আপাতত ডাক্তারদের দাবিকে আলাদা করে প্রাধান্য দেওয়া হল তেমনি অন্য পেশার মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে একসঙ্গে জোটবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে রহিত করা গেল। যেমন গত কয়েক বছর ধরে বাংলায় ডাক্তারদের মতো স্কুলশিক্ষক, কলেজ-

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পুলিশকে অনেকসময় গুন্ডামি এবং শারীরিক নিগ্রহ ও আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। ডাক্তারদের নিরাপত্তার মতো শিক্ষক সমাজ এবং পুলিশের নিরাপত্তার সংশয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমে গত কয়েক বছর বহুবার আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া সরকারি ডাক্তারদের সঙ্গে সরকারি চাকুরে এবং বাংলার শিক্ষক সমাজের বেতন কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের থেকে কম। কিন্তু ডাক্তারদের আন্দোলনের সঙ্গে অন্য পেশার নিরাপত্তা জনিত দাবি এবং বেতন কাঠামোর উন্নতির দাবিসমূহকে কেন্দ্র করে সরকারবিরোধী কোনো জনপ্রিয় দাবিতে ত্বরান্বিত হল না, কোনো জনপ্রিয় সরকার বিরোধী গণআন্দোলন হল না। অন্যদিকে জনপ্রিয় দাবির সঙ্গে লাকলাউ 'সমানতার যুক্তি'র যোগ দেখেন যেখানে অনেকগুলো অপূর্ণ দাবিসমূহকে সমতা ও তুল্যতার বেষ্টনীতে বেঁধে কিছু অপূর্ণ দাবির মধ্যে একটি সংহতি তৈরি হয় ক্ষমতাসীন বৃত্তের বিরুদ্ধে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণ বা জনতার উন্মেষ হয় একটি সমষ্টিগত বা যৌথ রাজনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে। এই জনগণ কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণির দ্বারা গঠিত নয়। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনেক মানুষের দাবিকে সামনে রেখে একটি জনসমষ্টি। অনেকগুলো অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবি একযোগে যখন একটি জনপ্রিয় দাবির রূপ নেয় সেই জনপ্রিয় দাবিকে একটি বলিষ্ঠ জনপ্রিয়তাবাদী শক্তিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে অনেকসময় জনপ্রিয় স্লোগান, জনপ্রিয় রাজনৈতিক ধারণা (গণতন্ত্র, সমতা, ন্যায়, শান্তি, সম্প্রীতি, ইত্যাদি) অথবা কোনো নেতা বা নেত্রী এবং তাঁর নাম বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ধরা যাক ১৯৭৭ এবং ২০১১-তে বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের কথা।

লোকবাদ এবং বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল

১৯৭২-১৯৭৭ সময়কালে বাংলায় এক অভূতপূর্ব অচলাবস্থা চলছিল। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতা কিছুটা সংকুচিত। বামপন্থীরা সেই সময়ের সরকারকে একটা স্বৈরাচারী ও আধা-ফ্যাসিস্ট সরকার বলত। কৃষক দুর্দশা চরমে। কৃষক দাবিকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ি আন্দোলন হয়েছে। শ্রমিকদের অবস্থা তথৈবচ। বেকারত্ব বাড়ছে। মধ্যবিত্ত চাকুরে থেকে শিক্ষাকুল, প্রত্যেকের মাইনে তার পরের দশকগুলোর তুলনায় বেশ অল্প। আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ কারণ রাজনৈতিক হিংসা এবং বিভিন্ন রকমের গুন্ডামি ও অপরাধ প্রায় লেগেই রয়েছে। কালোবাজারি ও দুর্নীতির রমরমা নিয়ে অভিযোগ উঠছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বেহাল দশা। ১৯৭১-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে আগত নতুন উদ্‌বাস্তু রাজ্যের পরিকাঠামোর উপরে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করার ফলে পরিকাঠামো ব্যবস্থা একদিকে যেমন নড়বড়ে তেমনি সেই নতুন উদ্‌বাস্তুদের পাশে দাঁড়াবার দাবি সামনে চলে এসেছে। পরীক্ষায় গণটোকাটুকির অভিযোগ উঠছে। পরীক্ষার ফল এক বছর বা দু-বছর পর বেরোচ্ছে। এমার্জেন্সির সময়কাল— ২৬ জুন ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত অবস্থা বেশ ভয়াবহ। এইসবের মধ্যে বিভিন্ন বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ফলে জনসমাজে তৎকালীন বাংলার সরকারের একটি স্বৈরাচারী ও অপদার্থতার ভাবমূর্তি তৈরি হল ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের আগে। এরকম একটা প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের নামে বামফ্রন্ট ভোট চাইল। বিপুল ভোটে বামফ্রন্ট জিতল। সেই জনাদেশ কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শপথ ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বৃহত্তর মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় উন্মাদনা তৈরি করতে পেরেছিল। সেইসময় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গণতন্ত্রের মানে ছিল পরীক্ষাব্যবস্থার অনিয়মকে দূর করা। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাকুল তথা সমাজের এক বড়ো অংশের কাছে বাক্-স্বাধীনতা পূর্ণভাবে ফিরে পাওয়া। মধ্যবিত্ত-র কাছে আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ উন্নত হওয়া ও সামাজিক সুস্থিতি। কৃষকের কাছে লাঙ্গল যার জমি তার স্লোগানকে বাস্তবায়িত করা এবং শ্রমিকের কাছে তার অধিকার ফিরে পাবার নাম ছিল গণতন্ত্র। অর্থাৎ 'গণতন্ত্র' এক একটি গোষ্ঠীর কাছে এক এক রকম মানে। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের নামে তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণির এক তাৎপর্যপূর্ণ মানুষ বামফ্রন্টকে ভোট দিয়ে এক জনপ্রিয় দাবি পূরণ করেছিল। সেই জনপ্রিয় দাবি ছিল একটি স্বৈরাচারী ও অযোগ্য সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা। এখানে মনে রাখতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের জয় শুধু শ্রমিক শ্রেণির জয় ছিল না যদিও কমিউনিস্টরা মনে করেন যে আদতে তারা শ্রমিক শ্রেণির পার্টি। জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির নিরিখে ১৯৭৭ সালের জয় একটি অবহেলিত ও দমিত জনগণের জয় ছিল। অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি একটি জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সফল করতে পেরেছিল।

বাংলায় ২০১১ সালের নির্বাচনকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে 'পরিবর্তন' স্লোগানের জনপ্রিয়তা একটা বৃহত্তর জনগণ/জনতা নির্মাণ করতে সফল হয়েছিল। কিন্তু একইসঙ্গে 'পরিবর্তন' নামক শব্দবন্ধ বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে আলাদা মানে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষক সমাজের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষের কাছে মনে হয়েছিল, রাজ্যে শাসক দলের পরিবর্তন হলে তাদের থেকে বলপূর্বক জমি নেওয়া হবে না। কৃষক সমাজের একটা অংশ মনে করল, যে সরকার একদিন ভূমি সংস্কার ও বর্গাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জমি বন্টন করেছিল তারাই যদি আজ জমি কাড়তে উদ্যোগী হয় তাহলে সেই সরকারকে বদল করে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। সিঙ্গুর,

নন্দীগ্রাম, নেতাই এবং লালগড় আন্দোলনের সময়ে শাসনযন্ত্র যেভাবে বহু মানুষের উপর দমন-পীড়ন-নির্যাতন করেছিল তার থেকে রেহাই পেতে বা সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন বহু মানুষ চাইছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অনেকে মনে করল বামফ্রন্ট আমলে তারা আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকল। সাচার রিপোর্টে বিশেষ করে শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির মাপকাঠিতে বাংলার মুসলিমদের বেশ অনগ্রসরতা প্রকাশ পেল এবং তারা অনেকেই সেই অবস্থার একটা পরিবর্তন দরকার বলে মনে করল। বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্তের একাংশ মনে করল যে যোগ্যতা ও মেধার তুলনায় বামফ্রন্ট আমলে একদিকে পার্টিতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে যেখানে পার্টির ক্যাডারদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থেকে শুরু করে সরকারি চাকরি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে, এমনকি ব্যক্তিগত পরিসরে পার্টির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। সঙ্গে ছিল কয়েকটি আর্থ-সামাজিক মাপকাঠিতে বাংলা কয়েকটা বিষয়ে জাতীয় স্তরে পিছিয়ে থাকার কাহিনী। যেমন বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে, ২০১১ আদমশুমারির হিসেবে বিদ্যুৎ যোগাযোগ, পরিশ্রুত পানীয় জল ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার উপলব্ধি এবং টেলিভিশন কেনার ক্ষমতার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয় গড়ের থেকে পিছিয়ে ছিল। এহেন পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার যে বামফ্রন্ট আমলের প্রথম এক-দেড় দশকে ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমিকের অধিকার, সরকারি চাকুরের মাইনে বৃদ্ধি ইত্যাদি নীতি থাকলেও শেষ দশকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বিচার করলে তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। অর্থাৎ অপূর্ণ অনেক গণতান্ত্রিক দাবি পুঞ্জীভূত হয়েছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের পরবর্তীকালে সেই বিভিন্ন অপূর্ণ দাবির পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে থাকল ২০০৮ পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে। শেষে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের স্লোগান একটি জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত হল যখন মানুষ ঠিক করল যে আর নয়, বামফ্রন্ট সরকারকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার সরকার পরিবর্তন দরকার।

লোকবাদ ও মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি রাজনীতি

সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নির্বাচনী কৌশল থেকে পরিষ্কার যে দলিত এবং শূদ্র (মূলত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হিন্দু পরিচিতির' নামে এক বিভাজনের চেষ্টা নির্বাচনে ফায়দা দিয়েছে। যেমন বিজেপি এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের দলিত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে উচ্চবর্ণের তুলনায় ভারতের মুসলমান আসলে বড় অপর, বিরোধী ও প্রতিপক্ষ। তার সঙ্গে আরএসএস-বিজেপি-র বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে একটি কল্পিত মুসলিম তাঁবেদারি ও তুষ্টিকরণের গল্প শোনানো হল। দলিত, আদিবাসী এবং শূদ্র তথা দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের কাছে মুসলিমদের ব্যাপারে বহু দশক ধরে একটা আখ্যান আরএসএস প্রচার করছিল। যার সারকর্ম হল মুসলিমদের ব্যাপারে সদা সন্দিহান থাকতে হবে কারণ তাদের পুণ্যভূমি ভারতে নয় এবং তাই তাদের দেশভক্তি ঠুনকো অথবা তারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সন্ত্রাসবাদে মদত যোগায় এবং তাই তারা আদতে দেশের দুশমন। এই আখ্যানের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই কারণ ভারতের মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রবল সংখ্যাগুরু অংশের, আধুনিক ভারত গড়ার ক্ষেত্রে যে অবদান তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু দশকের পর দশক চলতে থাকা একটি মিথ্যা আখ্যানকে যদি প্রতিনিয়ত পালটা উপাখ্যান দিয়ে মোকাবিলা করা না হয় তাহলে জনমানসের কিছু অংশ একটি নির্মিত আখ্যানকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে।

অন্যদিকে আরএসএস-বিজেপি-র তরফ থেকে আরেকটি আখ্যান সমান্তরালভাবে প্রচার করা হল যে সামাজিক ন্যায়ের নামে কিছু পরিবারতান্ত্রিক দল কয়েকটি মুষ্টিমেয় জাতের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে; আসলে দলিত, আদিবাসী এবং শূদ্র সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষের তেমন উপকার হয়নি। আর এই অবস্থা জাতীয় স্তরে দশকের পর দশক টিকিয়ে রেখেছে উদারবাদী কংগ্রেস দল যাদের নেতৃত্ব একদিকে যেমন পরিবারতান্ত্রিক আর অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিত, বিলাসী এবং সুবিধাভোগী শ্রেণি থেকে আগত। এই পুরাতন সুবিধাভোগী শ্রেণির স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে একদিকে দলিত, আদিবাসী, শূদ্র এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে উচ্চাভিলাষী নতুন মধ্যবিত্তর সমর্থন জোগাড় করতে বিজেপি সফল হল আবার বিজেপির প্রধান মুখ, নরেন্দ্র মোদীর দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসার কাহিনি গরিব মানুষের মধ্যেও সেই নেতার সঙ্গে একাত্মতার একটা জায়গা তৈরি করল। জনমোহিনী রাজনীতির নিরিখে বিচার করলে মোদীর জনপ্রিয়তা তাই একটি লোকবাদী রাজনীতির ফসল। সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আপামর জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনেক মানুষকে নিয়ে গঠিত এমন একটা জনতার জন্ম দিয়েছে যারা পুরাতন উদারবাদী অথচ সুবিধাভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে একটা রাগকে প্রকাশ করছে এবং যারা প্রধানত পরিবারতান্ত্রিক ও তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার কংগ্রেসি ঘরানার রাজনীতির বিরুদ্ধে যা উদারবাদী ও সুবিধাভোগী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছে দশকের পর দশক।

এক্ষেত্রে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'সুদিন' ও 'সকলের সাথে সকলের বিকাশ' স্লোগান এবং ইউপিএ-২ জমানার শেষের দিকে নীতি পঙ্গুতার বিপরীতে মোদীকে জনমানসের সামনে একজন নির্ণায়ক নেতা হিসেবে তুলে ধরার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে মোদীত্বের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সফল হয়েছিল। নির্ণায়ক নেতার ভাবমূর্তি, মোদীর নিম্নবর্ণীয় জাত এবং দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসার আখ্যান, জনমুখী কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং তার সাথে পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদকে জব্দ করার যে সামরিক জাতীয়তাবাদের একটা আখ্যান তুলে ধরা হল তা মোদীত্বের লোকবাদী রাজনীতিকে আবার অধিকতর সফল করল ২০১৯ লোকসভার নির্বাচনে। মোদীর লোকবাদী রাজনীতি আরও সফল হল যখন বিরোধীপক্ষ নির্বাচনি কৌশল এবং জোট বাঁধার ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত ও বিভাজিত ছিল। অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বড়ো রকমের জনআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি যা ইউপিএ-২ আমলে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল।

দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী লোকবাদ

আন্তর্জাতিক স্তরে কেবল বিশেষ ধরনের দাবিকে কেন্দ্র করে একটি মোটা দাগে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী লোকবাদের প্রভেদ করা হয়। যেমন বামপন্থী লোকবাদী রাজনীতির প্রধান দাবিগুলোর অভিমুখ হল পুনর্বণ্টন, বহুসংস্কৃতিবাদ বা বহুবৈচিত্র্যতা, সামাজিক ন্যায়, সামাজিক ঐকতান। এক্ষেত্রে লাকলাউয়ের প্রথম বই 'পলিটিক্স এন্ড ইডিওলজি ইন মার্কসিস্ট থিওরি'র চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায় 'টুওয়ার্ডস এ থিওরি অফ পপুলিজম'-এ উনি আরেকটু বিপ্লবী জনপ্রিয়তাবাদ বা সমাজবাদী লোকবাদের কথা বলেছিলেন। সেই ধরনের সমাজতান্ত্রিক জনপ্রিয়তাবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের দমন এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের অবলুপ্তি। লাকলাউয়ের সতীর্থ তাত্ত্বিক শান্তাল ম্যুফ আবার মনে করেন যে বামপন্থী জনমোহিনী রাজনীতি 'আশার' উপর দাঁড়িয়ে আর দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির ভিত্তি হল 'ভয়'। এই ভয় হল অভিবাসন-কেন্দ্রিক বিদেশাতঙ্ক। গত কয়েক বছর ইউরোপ ও আমেরিকাতে বিদেশিদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়কে অস্ত্র করে দক্ষিণপন্থী লোকবাদের উত্থান ঘটেছে বেশ কয়েকটি দেশে। তাই দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির প্রধান দাবি হল 'অভিবাসী ও বিদেশি তাড়াও'। দক্ষিণপন্থী লোকবাদ অভিবাসী সম্পর্কে নানারকম সন্দেহ ও ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করার রাজনীতি করে। দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির কারবারিরা তাই জনমানসে অভিবাসী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা এবং গুজব ছড়ায় আর মনে করে যে অভিবাসীরা আসলে দেশজ জনগণের পরিচিতি সত্ত্বার দ্রুত অবলুপ্তির কারণ হতে পারে। এছাড়া তারা মনে করে যে অভিবাসীরা দেশীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থান কেড়ে নেয়। তাই তাদের দেশ থেকে তাড়ানো দরকার। অন্যদিকে বহুসংস্কৃতিবাদকে দেশজ জনগণের উপর উদারবাদী অভিজাতদের চাপিয়ে দেওয়া নীতি বলে মনে করে দক্ষিণপন্থী লোকবাদ। আমাদের দেশে নাগরিকপঞ্জির নীতি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মধ্যে এই দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির রেশ প্রবল যেখানে নাগরিকপঞ্জির নীতি প্রধানত একটি ভাষাগত জাতিকে 'বিদেশি' বলার প্রক্রিয়াকে দৃঢ় করে তাদের তাড়াবার তাল করছে আর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মধ্যে দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বকে নির্ণয় করার প্রচেষ্টা চলছে। জাতীয় স্তরে বর্তমানকালে মোদীত্বের রাজনীতি এই দক্ষিণপন্থী লোকবাদের দাবিগুলোকে সামনে রেখেছে আর আঞ্চলিক স্তরে শিবসেনার জন্মই হয়েছিল এই দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির দাবিগুলোকে ভিত্তি করে।

লোকবাদ ও রাজনীতি

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উদাহরণের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে লোকবাদী রাজনীতিতে সফল হয়েছে। বলা যেতে পারে জনপ্রিয়তাবাদ ছাড়া তাদের ওই সফলতা যথাযথ বিশ্লেষণ করা যাবে না। তাদের মতাদর্শ আলাদা হতে পারে, তাদের দাবিগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু লোকবাদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার 'সমানতার যুক্তি' যেখানে বেশ কিছু অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবিকে একযোগে বেঁধে একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতাসীন বৃত্ত/শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই— ওই প্রত্যেকটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে। কিন্তু একটি জনমোহিনী রাজনীতি সফল হবার পরে তা টিকে থাকে কী করে? আরও স্পষ্ট করে বললে শাসক হবার পর লোকবাদী দল নির্বাচনি রাজনীতির ময়দানে কী করে ক্ষমতা ধরে রাখে?

বিভিন্নতার যুক্তির মাধ্যমে শাসক যতদিন বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে পূরণ করার সামর্থ্য রাখবে এবং শাসন প্রণালীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কল্যাণের প্রকল্প ও জনবাদী/জনমুখী নীতি অবলম্বন করার প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়ন করার অবস্থায় থাকবে ততদিন শাসকের শাসন দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা প্রবল। এই নীতি নিয়ে বাংলায় যেমন ৩৪ বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল, পাশের রাজ্য ওড়িশাতে একটি আঞ্চলিক দল দুই দশকের উপর শাসনক্ষমতা ধরে রাখতে পারল। অন্যদিকে শাসককে ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে যে তার বিরুদ্ধে জনপ্রিয় দাবিকে সামনে রেখে এক নতুন জনতার যাতে না উত্থান হয়। বরং শাসক এমন একটি জনতার নির্মাণ করবে যা

বিরোধীপক্ষকে আসলে দুশমন বলে মনে করবে। এই দুই প্রক্রিয়া যেখানে সমান্তরালভাবে দীর্ঘ হয়েছে সেখানে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মেয়াদ দীর্ঘ হয়েছে। যেখানে এবং যখন এই প্রক্রিয়াগুলোর সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে তখন দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে।

তবে এখানে প্রয়োজনীয় কথা হল রাজনীতির প্রক্রিয়া কোনো স্বয়ংক্রিয় চালিকাশক্তি নয়। অর্থাৎ অনেকগুলো অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবিকে একসঙ্গে বেঁধে জনপ্রিয় দাবিতে উত্তরণ ঘটানো স্বয়ংচল অবস্থায় হয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক লড়াই, আন্দোলন এবং দাবির মধ্যে যোগাযোগ ও মৈত্রী ঘটানো একটি পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল। তাই বস্তুগত অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু অপূর্ণ দাবি থাকলেই তা স্বয়ংক্রিয় হয়ে সরকারবিরোধী জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত হয় না। গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে একযোগে বেঁধে ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছোড়ার মতো জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে একটি কঠিন রাজনৈতিক অনুশীলনের প্রয়োজন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসকবিরোধী বৃহত্তর গণআন্দোলনের একটা ভূমিকা থাকে। এই কথা আমরা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন বা ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন থেকে পরিষ্কার জানতে পারি যে কী করে বিরোধীশক্তি ওই নির্বাচনগুলোয় ধরাশায়ী হল যদিও অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবি এবং শাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ কিছু কম ছিল না। তাই ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'ফের একবার মোদী সরকার' বা ২০১৬ সালে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে 'জনগণের ক্ষমতা তাই বাংলায় চাই মমতা' নামক স্লোগান একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রচারের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়তা পেল এবং মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসের পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ ছিল যে পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে সামাজিক কাঠামোর একটা সরলীকরণ হবে যেখানে প্রধানত পুঁজি আর প্রলেতারিয়েত (কারখানা শ্রমিক) সমাজের মুখ্য শ্রেণি হিসেবে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তাদের মধ্যে বৈরিতার ফলস্বরূপ, সংখ্যাধিক্য প্রলেতারিয়াতের রাজনৈতিক জয় থেকে পুঁজিবাদকে উত্তরণ করা সম্ভব হবে। বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল যে একদিকে পুঁজিবাদ আর অন্যদিকে নির্বাচনি গণতন্ত্র যত বিকশিত হয়েছে, সামাজিক কাঠামো আরও জটিল হয়েছে ও শাসনপ্রক্রিয়া নিত্যনতুন কৌশলের মধ্য দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছে। প্রলেতারিয়াত বলতে উনবিংশ শতাব্দীতে যাদের ভাবা হত তাদের সংখ্যা আজ বিশেষ বাড়ছে না। অনেক রাষ্ট্রে তা বরং কমছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে এমন অসংখ্য জীবিকা ও পেশা তৈরি হচ্ছে যাদের ঠিক প্রলেতারিয়াত বলা যায় না। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ তৈরি হয়ে গেছে আর আগামী দিনে রোবটিক এবং কৃত্রিম বুদ্ধির জগৎ আসতে চলেছে যেখানে মানব শ্রমিকের আরও অনেক বেশি কাজ মেশিন করবে। এহেন অবস্থায় বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের প্রভাব শুধু শ্রমিক শ্রেণির উপরে পড়ে না বরং সমাজের বিভিন্ন অংশের উপরে পড়ে— কৃষিজীবী, অরণ্যজীবী, মধ্যবিত্ত পেশাদার, ছোটো কারখানার মালিক, ছোটো ব্যবসায়ী ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীতে আর্থিক বৈষম্য বাড়ছে কিন্তু যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে তাদের সবাই শ্রমিক নয়। একইসঙ্গে মানুষের মধ্যে এমন অনেক পরিচিতি সত্তা আছে যা সবসময় ব্যক্তিকে নিছক শ্রমিক হিসেবে নিজেকে দেখা বা চেনার থেকে লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, জাত ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম হবার প্রবণতা বা সেইরকম কোনো অশ্রেণি পরিচিতি গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধের সম্ভাবনা থাকে। এই বিভিন্ন অশ্রেণি গোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত বা তাদের অপূর্ণ দাবিসমূহকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে সমাজ আজ বহু গোষ্ঠী, শ্রেণি, পরিচিতি ও আর্থিক মানদণ্ডে বিভাজিত। রাজনীতির প্রধান কর্তব্য হল এই বহুধাবিভক্ত ও নানাধর্মী জনসংখ্যার মধ্যে একদিকে জনগণ আর অন্যদিকে ক্ষমতার বৃত্তকে মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা। পুরোনো ধাঁচের পার্টি আজ সমকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দাবিকে একসঙ্গে চালিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্ণায়ক নেতার পার্সোনালিটি কাল্ট আবার কোনো ক্ষেত্রে কিছু পার্টির জোটবদ্ধ মোর্চা জনপ্রিয় হচ্ছে।

উদারবাদী ঘরানার 'এন্ড অফ পলিটিক' (রাজনীতির অবলুপ্তি) ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পুঁজিবাদের জয়ধ্বনি স্লোগান 'এন্ড অফ হিস্ট্রি' (ইতিহাসের অবলুপ্তি) বা কমিউনিস্ট ঘরানার 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি' তত্ত্বের বিপরীতে থেকে উত্তর-মার্কসবাদী রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, লাকলাউ-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে রাজনীতি এক জায়গায় থেমে থাকে না এবং রাজনীতির কোনো অন্তিম লগ্ন নেই। মানবসভ্যতা যতদিন থাকবে রাজনীতিও তার সঙ্গে বেঁচে থাকবে। পরিবর্তনশীল মানবসভ্যতার সঙ্গে রাজনীতিও সদা পরিবর্তনশীল। আর সেই পরিবর্তনশীল রাজনীতির সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে পরিবর্তনকামী লোকবাদ ও জনপ্রিয়তাবাদ তা সে যে নামেই ডাকা হোক না কেন। রাজনীতি আর লোকবাদ একে অপরের পরিপূরক, মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাই রাজনীতির সবথেকে বড়ো ও মৌলিক কার্য হল জনতার নির্মাণ। যে জনতা জনার্দন থেকে জনপ্রিয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাকে মোকাবিলা করবে।

বিস্মৃতপ্রায় অবিস্মরণীয় এক ছাত্রআন্দোলন

মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র

এই প্রবন্ধে আমি এমন একটি ছাত্র আন্দোলনের কথা বলব— যা একদিক থেকে অনন্য, পৃথিবীর ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলা যায়। প্রায় ১১৩ বছর আগে ১৯০৫ সালের শেষাংশে এই বিশেষ ছাত্র আন্দোলনটি সংগঠিত হয়েছিল। এই ছাত্র আন্দোলনই ত্বরান্বিত করেছিল বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আবির্ভাব। দুঃখের বিষয়, এই আন্দোলনের কথা আজ বিস্মৃতপ্রায়। বর্তমান ছাত্রসমাজ এই অভূতপূর্ব ও আকর্ষণীয় ছাত্র আন্দোলনের কথা জানে না, জানলেও মনে রাখাটা প্রয়োজন বোধ করে না। বর্তমানে পরিকল্পিত ও পরিচালিত অধিকাংশ ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি, পদ্ধতি ও প্রাপ্তির লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of Freedom Movement* গ্রন্থে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন— আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দিয়ে। রমেশচন্দ্রের এই মন্তব্য সেভাবে প্রচারের আলোয় আসেনি। কলেজের এমনকী স্কুলের ছাত্ররা এই আন্দোলনে ভূমিকা নিয়েছিল সেই কাহিনিও তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি।

এই রচনাটির কেন্দ্রে পৌঁছোতে গেলে কিছু প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্য সংক্ষেপে বলে নেওয়া প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা যেরকম ছিল, যা উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮৩৫) (William Bentinck)-এর আমল থেকে শুরু হয়েছিল। সেই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের বিদ্বৎসমাজ মেনে নিতে পারেননি। এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রতিবাদের কণ্ঠ সোচ্চার হতে শুরু করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রতিবাদী কণ্ঠকে সংহত করে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখার্জি একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁকে এই শিক্ষা-আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেক মনিষী।

পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন (Lord Curzon) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য নিযুক্ত করেন (১৮৯০-১৮৯২)। তিনি তাঁর সমাবর্তন ভাষণে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে Indian Universities Commission গঠন করেন এবং স্যার গুরুদাসকে একমাত্র হিন্দু সভ্য হিসেবে নির্বাচিত করেন। স্যার গুরুদাস এই কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত-সহ একটি note of dissent দেন। সামান্য কিছু পরিবর্তন করলেও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে লর্জ কার্জন খুব একটা আমল দিলেন না এবং ১৯০২ সালের কমিশনের রিপোর্ট শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল হিসেবে ১৯০৪ সালের ২১ মার্চ তারিখে গৃহীত হয়। এর ফলে ভারতীয় জনতা, পণ্ডিতমহল ও ছাত্ররা ধিক্কার দিতে থাকে।

মতিলাল ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক খুব সংক্ষেপে ভারতীয়দের আপত্তির কথা উল্লেখ করে লেখেন—

১. লর্ড কার্জনের মনে হল ভারতীয় ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়বে এবং তা শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হিসেবে প্রকাশ পাবে। তাই তিনি এমনভাবে এই act তৈরি করলেন যাতে শিক্ষায় শুধুমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে, কোনোরকম বেসরকারি প্রভাব যেন শিক্ষাব্যবস্থা রূপায়ণে না থাকে।

২. লর্ড কার্জন এটাও নিশ্চিত করলেন যে, এই শিক্ষা যেন সত্যি সত্যিই ছাত্রদের কোনোরকমভাবে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রদান করে, যে জ্ঞান তারা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। এমন সমস্ত শক্তপোক্ত ইংরেজি বই এবং সংখ্যায় এতগুলো বই পড়তে হবে যা ছাত্রদের আয়ত্তের বাইরে এবং যার ফলে তারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে।

৩. ইংরেজিতে আগে পাশ মার্ক ছিল ৩৩ শতাংশ। এখন সেটাকে বদলে ৩৭ শতাংশ করা হল। ফলে ছাত্রদের পাশ করা আরো কঠিন হয়ে গেল। ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রের সংখ্যা অনেক কমে গেল— ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ছাত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে লাগল। ফলে ছাত্রদের উচ্চশিক্ষায় যাবার পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হতে শুরু করল। তার ফলে F.A., B.A., M.A. পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার সুযোগ অনেক কমে গেল।

৪. প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে উচ্চশিক্ষার জগৎ সংকুচিত হবে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

এই সমস্ত দেখে শুধু আমাদের দেশের মানুষরাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন না, এমনকী Valentile Chirol-এর মতো প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক মন্তব্য করেন যে, লর্ড কার্জনের এই Act আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যতের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও সতীশচন্দ্র আরো বিভিন্ন প্রতিবাদী স্বরকে সংহত করে ভাগবৎ চতুষ্পাঠী নাম দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন এবং ভারতীয় টোলের আদলে তৈরি করা এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি একটি একটি করে আলোচনা করতে গেলে এবং তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে একটি পৃথক রচনার প্রয়োজন। তাই সেই পথে না গিয়ে এককথায় বলি— জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল— ব্রিটিশ সরকার নির্ধারিত পথে চালিত দেশাত্মবোধ বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার বিষয়, ভাব ও পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার।

এই রচনার কেন্দ্রবিন্দু ছাত্র-আন্দোলন। সেই আন্দোলনের কথা ঠিকভাবে বুঝতে গেলে কিছু প্রাসঙ্গিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সেকথা বলে সেই পটভূমিতে আমরা কেন্দ্রীয় বিষয়টিতে প্রকাশ করব। সেটাও ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পেছনে যে বিশাল ইতিহাস আছে তা সংক্ষেপে বলে না নিলে পরের ইতিহাসটি বুঝতে অসুবিধে হতে পারে। তাই পূর্বের তথ্যগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে লর্ড কার্জন এমন একটি আন্দোলনের জন্ম দেন যা আগে কখনো হয়নি। লর্ড কার্জন তাঁর বঙ্গভঙ্গের ফরমান সরকারিভাবে কার্যকর করেন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। অবশ্য বেশ কিছুকাল আগে থেকেই বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছিল কার্জনের অভিসন্ধির কথা। সংগঠিত করেছিল প্রতিবাদের পরিকল্পনা— বয়কট আন্দোলন। বিদেশি দ্রব্য ও বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা বয়কট, বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রতিবাদের ঢেউ রাজনীতির অঙ্গন যতটা আলোড়িত করেছিল, শিক্ষাক্ষেত্র ও ছাত্রসমাজকে প্রভাবিত করেছিল তার থেকে বেশি বই কম নয়। এর জন্য যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের কথা ভাবা হয়— নিঃসন্দেহে তিনি হবেন সতীশচন্দ্র মুখার্জি। সতীশচন্দ্র রাজনীতিবিদ ছিলেন না; তিনি ছিলেন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের অনেক আগে লর্ড কার্জনেরই আর একটি কুপ্রস্তাব ছিল— Indian Universities Act; একথা আমরা আগেই বলেছি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বাংলার শিক্ষকমহল মনে করেছিল এদেশে উচ্চশিক্ষার পরিসরকে সংকুচিত করতেই ইংরেজ সরকারের এই পরিকল্পনা। প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অনেক মিটিং মিছিলের আয়োজন করা হয়। কিন্তু কাজের কাজটি করেন দূরদ্রষ্টা সতীশচন্দ্র। ১৯০২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ডন সোসাইটি'— যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা নিজেদের আদর্শ ছাত্র, আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা পায়। স্বদেশকে চিনে স্বদেশকে ভালোবেসে দেশের জন্যে করণীয় কাজ করতে প্রস্তুত হয় তারা। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের একটা প্রধান রাশ থাকে পরোক্ষভাবে এই ছাত্র-সদস্যদের হাতে।

ঐতিহাসিক টাউন হলে ৭ আগস্ট একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় পৌরোহিত্য করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর ভাষণে কার্জনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলনের ডাক দেন তার পক্ষে মানুষ সর্বান্তঃকরণে সায় দেয়। শুরু হয়ে যায় বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন। এই আন্দোলনের মধ্যমণি ছিল ছাত্ররা— কৃষক ও শ্রমিক নয়। বিদেশি দ্রব্য বয়কট শুধু নয়, ছাত্ররা বিদেশি শিক্ষা বয়কট করার ডাক দেয়।

১৯০৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সরকারি নিয়ন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে এমএ এবং পিআরএস পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে, তা-ও ছাত্ররা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পরীক্ষার্থী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নেতৃত্বে এমএ পরীক্ষা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনারায়ণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন সেই বছরের এমএ পরীক্ষার্থী আরো একজন অত্যন্ত মেধাবী ও উজ্জ্বল ছাত্র নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। শুধু তাই নয়, রাধাকুমুদ মুখার্জি নামে আর একটি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র পিআরএস পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। বিনয় কুমার সরকার নামে আর একটি ছাত্র যে সেই বছর বিএ পরীক্ষায় ইশান স্কলার হয়েছিল এই বয়কট আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। রাধাকুমুদ,

রবীন্দ্রনারায়ণ, বিনয় সরকার এবং নৃপেন্দ্রচন্দ্র— এই চার জনের মধ্যে প্রথম তিন জন শুধুমাত্র ডন সোসাইটির recognised member ছিলেন না, তাঁরা সকলেই সতীশবাবুর নিজে হাতে গড়া ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সকলেই ১৯০৫ সালের জুন মাস থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ১৬নং বাড়ির দোতলায় একটি মেসে থাকতেন। এই মেসটি শুরু করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখার্জি। সতীশবাবুই এই ছাত্রদের বয়কটের ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করেন ও উৎসাহ প্রদান করেন। সুতরাং সতীশবাবুকেই এই ছাত্রদের spiritual leader বললে ভুল হবে না। এই বাড়িটির একতলায় Field and Academy Club ছিল যে ক্লাবটি সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি ব্যক্তির ক্লাব ছিল। রাধাকুমুদ সতীশবাবুকে spiritual leader of the revolt বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। রাধাকুমুদ তাঁর লেখায় এও বলেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যেই এই আন্দোলনে শামিল হন এবং বেশ কিছু দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন এবং ডন সোসাইটির মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের বাড়িতে অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে বসে ওই কবিতাগুলিকে দেশাত্মবোধক সংগীতে রূপান্তরিত করেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথেষ্ট সাহায্য করেন। সর্বোপরি সিস্টার নিবেদিতা এই উদ্যোগে মদত দেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ওই বাড়ির (১৬ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট) ছাদের ওপর একটি ছাত্র-সমাবেশে গোপনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-বয়কট সূচিকে সমর্থন করে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। বিনয় সরকারের মতে এই বক্তৃতা ছাত্রদের পরীক্ষা বয়কট করার ব্যাপারে উজ্জীবিত করে। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরের কোনো এক সময় এই বক্তৃতাটি ছাত্রদের এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে, নৃপেন্দ্রনাথ এবং রাধাকুমুদ সঙ্গে সঙ্গে একটি বয়কট ম্যানিফেস্টো তৈরি করে তা প্রচার করতে শুরু করে।

বাংলা বিভাগ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন শুধুমাত্র কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জের ঘরে এই আন্দোলনের খবর প্রচার করতে থাকে। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে কলকাতায় ছাত্ররা ঘন ঘন সভার মাধ্যমে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে যোগদান করার অঙ্গীকার করে, মফস্‌সলের ছাত্ররাও এ ব্যাপারে পেছিয়ে থাকে না।

ইংরেজ সরকার এই আন্দোলনের চাপে অস্থির হয়ে পড়ে এবং এই আন্দোলনের ভিত নড়িয়ে দেবার জন্য নানাবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে।

বাংলার অস্থায়ী চিফ সেক্রেটারি আর ডব্লু কারলাইন একটি গোপন সার্কুলার (No. 1629 P – A – dated Darjeeling, the 10th October, 1905) জারি করেন এবং যত ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর আছেন— তাঁদের সকলকে এই সার্কুলারটি পাঠিয়ে দেন। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে-সমস্ত ছাত্র কোনো রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগ দেবে, বিশেষ করে স্বদেশি ও বয়কট মিটিং-এ যোগ দেবে, পিকেটিং ইত্যাদি কাজ করবে, তাদের সকলকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই সার্কুলারটি-ই কুখ্যাত *কার্লাইল সার্কুলার* নামে পরিচিত। ছাত্ররা মনে করে— এটি এমন একটি সার্কুলার যা ছাত্র সম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধ ও আত্মসম্মানে ঘা দেয়। সারা বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায় স্বদেশিবিরোধী নির্দেশনামার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে এবং আন্দোলনে নামে। ছাত্রদের এই রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরেজ সরকারকে বিশেষভাবে বিচলিত করে এবং সরকার পক্ষ থেকে নানারকম দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে থাকে। ছাত্ররা কিন্তু অনমনীয় থেকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

৩ অক্টোবর সন্ধ্যে ৬.৩০টা নাগাদ বড়োবাজারের মোড়ে হ্যারিসন রোডের ওপর একটি ১৬/১৭ বছরের ছেলে একজন বয়স্ক লোককে বিলিতি কাপড় কেনাতে বাধা দেয়। পুলিশ ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যায় এবং ফলে জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশ ৬ জন ছাত্রসহ ৩৭ জন ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করে। শেষপর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর হস্তক্ষেপে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

যদিও আইনি ব্যবস্থা নেবার আগেই এই ব্যাপারটি মিটে যায়, তা সত্ত্বেও DPI Pedlar সাহেব দার্জিলিং থেকে ১৯০৫ সালের ২১ অক্টোবর কলকাতার কোনো কলেজের অধ্যক্ষকে নিম্নলিখিত চিঠিটি (Na T292) প্রেরণ করেন।

> Sir,
>
> As it is aparently established that the marginally named student in the institution under your control was implicated in the Harrison Road disturbance that occurred on the 3rd instant. I am directed by His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal to request you to be as good as to show cause why the student in question should not be expelled from your institution.
>
> I have the honour to be,
> Sir,
> Your most obedient servant
> Sd/- A. Pedlar.

অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলি, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কাগজগুলিতে এই চিঠিটি ছাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সঞ্জীবনী মন্তব্য করে এই চিঠিটি পেডলার সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর একটি জনসভা Field and Academy club-এ অনুষ্ঠিত হল। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করলেন ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল। বক্তা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তাঁরা সকলেই তীব্রভাবে এই সার্কুলারের সমালোচনা করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এ-ও বলেন যে, একটা বেসরকারি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। এই নিয়ে বেশ কিছু আলোচনাসভার পর ২৫ অক্টোবর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'Telegraph' নামক খবরের কাগজে একটা চিঠি ছাপালেন। ছাপালেন। সেই চিঠির শিরোনাম ছিল— "What to do? A proposed University?" কিন্তু এই বেসরকারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে টাকা লাগে। কে টাকা দেবে?

খুব সম্ভবত ২৫ অক্টোবরই ড. শরৎ কুমার মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে এক হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি একথা ঘোষণা করলেন College of Physicians and Surgeons-এর অফিসে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায়। এর পরেই ২৭ অক্টোবর চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল *কার্লাইল সার্কুলার* কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র মুখার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। শচীন্দ্রকুমার বসু নামে চতুর্থ বৎসরের এক ছাত্রের নেতৃত্বে এক হাজার ছাত্রের এক সমাবেশও হয়। সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ *কার্লাইল সার্কুলারের* নিন্দা করে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন।

কলকাতায় যখন এইরকম একটা প্রতিবাদ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে সেইসময় রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট T-Emersion গোপনে রংপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে একটি নির্দেশ পাঠালেন। সেই নির্দেশের পরিপেক্ষিতে রংপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ কে ঘোষ ১৯০৫ সালের ৩১ অক্টোবর এই মর্মে একটি সার্কুলার জারি করলেন— যাতে ছাত্ররা বয়কট, পিকেট এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকে। যদি এর অন্যথা হয় তাহলে তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। সার্কুলারটির বয়ান নীচে তুলে দেওয়া হল।

Circular No. 10.8

Notice is hereby given that if any attempt is made by any boy of the Rangpur Zillah School to take any action in connection with boycotting, picketting and other abuses, his case will be reported to the Inspector of schools, Rajshaye Division, for punishment. Every assistant teacher is requested to explain to the boys that such a practice is absolutely subversive of discipline, and most injurious to their interests and studies. He is also requested to see, both in the school and out of the school, that the boys do not meet together for such purpose, or disturb the peace by taking any part in boycotting movement. If there be any fear of such disturbance, the names of the boys should be reported to the undersigned.

Sd/- A. K. Ghosh
Head Master

বলা বাহুল্য, এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ বিভিন্ন মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল এবং বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার দাবি তুলল। গ্রামাঞ্চলের যে স্কুলের ছাত্ররা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে এই কালা ফরমান অস্বীকার করল তারা হল রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্র। রংপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সেইসময় রংপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক A K Ghosh-কে ১৯০৫ সালের ৩১ অক্টোবর এক নোটিশ জারি করে জানালেন— স্কুলের মধ্যে বা বাইরে যদি কোনো ছাত্র বয়কট বা কোনোরকম রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়, তার নাম স্কুল ইন্সপেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ছাত্রদের জেদ গেল চতুর্গুণ বেড়ে। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা তারা টাউন হলে মিলিত হল এক প্রতিবাদী সভায় এবং বাড়ি ফিরল দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে আর বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। পরের দিনই এক বিশাল ছাত্রসমাবেশে তারা বঙ্গভঙ্গের জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে।

শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে ছাত্রদের ওপর। দোষী ছাত্রদের বলা হয় পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে। অনাদায়ে স্কুল থেকে বহিষ্কার। ছাত্রদের পাশে দাঁড়াল অভিভাবকরা। অধিকাংশ অভিভাবকই জরিমানার টাকা দিতে এবং তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অস্বীকার করলেন। ৭ নভেম্বর জেলা স্কুলের মোট ৩৫০ জন ছাত্রের মধ্যে স্কুলে এল মাত্র ৩২ জন ছাত্র। ছাত্রদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত স্থানীয় লোকেরা বিদ্যুতের গতিতে কর্মতৎপর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থা করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুর ন্যাশনাল স্কুল— যা বাংলা শিক্ষা মানচিত্রে প্রথম জাতীয় শিক্ষাপীঠ যা জাতীয় নিয়ন্ত্রণে, জাতীয় ভাবধারায় শিক্ষাদানের সংকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করে ১৯০৫ সালের ৮ নভেম্বর।

পরের দিনই অর্থাৎ ১৯০৫-এর ৯ নভেম্বর অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ সংলগ্ন পান্তির মাঠে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক। তিনি বলেন, ছাত্রদের সঙ্গে তিনি একমত যে, সরকার চালিত শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে না; বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ একটা

National University চাই। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন— যাবতীয় বিলাসিতা বর্জন করে, টিফিনের সময় অভুক্ত থেকে সেই টাকায় ছাত্ররা পুষ্ট করেছে National University Fund. তিনি ঘোষণা করেন, যদিও তিনি ধনী-ব্যক্তি নন, ছাত্রদের দাবিকে সমর্থন করে তিনি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লাখ টাকা দান করছেন। উল্লাসে ফেটে পড়ে উপস্থিত জনতা। সুবোধ মল্লিককে রাজা উপাধি দিয়ে, তাঁর ঘোড়ার গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিজেরা সেই গাড়ি টানতে টানতে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের Field and Academy Club থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর নিজের বাসভবনে নিয়ে যায়।

চুপ করে বসে ছিলেন না দেশের নেতৃবৃন্দ। তাঁরাও চিন্তাভাবনা করছিলেন। কিন্তু দেরি হচ্ছিল সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। ওদিকে ভেঙে পড়ছিল ছাত্রদের ধৈর্যের বাঁধ। তারা সংকল্পবদ্ধ— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কোনো পরীক্ষায় তারা বসবে না। তাদের জন্যে অবিলম্বে চাই বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা।

১১ নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারে দশ হাজার ছাত্রের এক বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার স্যার আশুতোষ চৌধুরী। ভাষণ দেন সতীশচন্দ্র মুখার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। সকলেই রংপুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ছাত্রদের দাবি সমর্থন করে বলেন: বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ National University প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

ইতিমধ্যে কলকাতার ছাত্রদের মনোবল ভাঙার উদ্দেশ্যে সরকারের Assistant DPI Mr. Russell ছাত্রদের চরিত্র নিয়ে অশ্রাব্য কুৎসা প্রচার করছিলেন। ১২ নভেম্বর Field and Academy Club আবার দশ হাজার ছাত্রের এক প্রতিবাদী সভায় Russell-এর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং ভগিনী নিবেদিতা। সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় ভগিনী নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন— The Present Crisis and the need for a National University.

১৪ নভেম্বর। ছাত্র আন্দোলনের উল্লেখ করে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে একটি ম্যানিফেস্টো পাঠান স্যার আশুতোষ চৌধুরী। ঐতিহাসিক সেই ম্যানিফেস্টোর অংশবিশেষ বঙ্গানুবাদ আমি নিজে লিখছি—

> প্রিয় মহাশয়,
>
> বিরাট সংখ্যক ছাত্র দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে— এ বছর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসবে না। জাতীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপীঠে তারা যোগ দিতে চায়। কিন্তু এরকম কোনো শিক্ষাপীঠ তো নেই— অবিলম্বে তা গঠন করতে হবে।
>
> অনেকের মতো আমিও ছাত্রদের এই আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বুঝিনি। এখন বুঝছি। গত শনিবার ১৭ নভেম্বরের সভায় আমি দেখলাম ১৩ নভেম্বর সোমবারের মধ্যেই ছাত্ররা একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়। অনেক বুঝিয়ে আমি তাদের রাজি করিয়েছি আগামী বৃহস্পতিবার ১৬ নভেম্বর বিকেল ৫টায় তারা যেন অপেক্ষা করে।
>
> অনতিবিলম্বে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেই হবে। নাহলে পরিণাম হবে ভয়াবহ।
>
> ইতি
>
> Sd/- স্যার আশুতোষ চৌধুরী।

১৬ নভেম্বর ১৯০৫। পার্ক স্ট্রিট বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের হলে আয়োজিত বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য সতীশচন্দ্র মুখার্জি, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্দুল রসুল, তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় দুটি Resolution. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রস্তাবিত প্রথম Resolution -এ বলা হয়—

> That in the opinion of the conference, it is desirable and necessary that a National Council of Education should be at once established to organise a System of Education, Literary, Scientific and Technical on National Lines and under National Control.' স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবিত দ্বিতীয় Resolution-এ বলা হয়: 'That this conference, while fully appreciating the devotion and self-sacrifice of the P.R.S., M.A. and other students, is of opinion that it is desirable in the interest they are seeking to serve that should appear in the ensuing examination.

ছাত্র আন্দোলনের জয়জয়কার। প্রতিষ্ঠিত হল National Council— এই বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ। বিনয়কুমার সরকার এই ১৬ নভেম্বরকেই National Council of Bengal-এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছেন— যদিও পরিষদের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা দিবস ১৩০৬ সালের ১১ মার্চ।

বহুজনবিদিত এর পরের ইতিহাস। ১৯০৬ সালের ১৫ আগস্ট যাত্রা শুরু করে ন্যাশনাল কাউন্সিলের প্রথম শিক্ষাপীঠ— Bengal National College: অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দ

এবং কলেজ সুপার সতীশচন্দ্র। এই শিক্ষাপীঠকে রবীন্দ্রনাথ বরণ করেছিলেন 'সজীব মঙ্গল' বলে। বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, আপন অন্তঃসত্তার সজীবত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে ৫০ বছরের সাধনার ফসল হিসেবে ন্যাশনাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়— যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ বিশ্ববিখ্যাত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে ন্যাশনাল কাউন্সিলের সৃষ্টি সেকথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু আমরা জানি না বা জানলেও মনে রাখি না যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ই বিশ্বের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যার শিকড় রয়েছে বিশেষ প্রজন্মের একদল ছাত্রের আত্মত্যাগ, জাতীয় শিক্ষার জন্য একনিষ্ঠ ও অকুতোভয় সংগ্রাম— একটি অনন্য, বিস্মৃতপ্রায়, অবিস্মরণীয় এক ছাত্র আন্দোলন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে।

ছবি : জহর দাশগুপ্ত

আলোর বাইরে

অমিতাভ রায়

আজমেরী গেটের দিক থেকে নতুন দিল্লি স্টেশন থেকে বেরিয়ে বেশিরভাগ যাত্রীই দক্ষিণমুখী। একেবারে উলটো পথে একবার হাঁটলে কেমন হয়।

পায়ে পায়ে মেরে-কেটে এক কিলোমিটার। অথবা তার থেকেও কম। বাঁ-হাতে রামলীলা ময়দান আর ডান পাশে নিউ দিল্লি সিভিক সেন্টারের আঠাশ তলা বিশাল স্থাপত্য দেখতে দেখতে একটু এগোলেই যে ট্রাফিক সিগন্যাল পড়বে সেখান থেকে রাস্তা একমুখী। বাস-গাড়ি-অটোর সঙ্গে এখান থেকেই বামপন্থী না হয়ে উপায় নেই। আর একটু এগোলেই তুর্কমান গেট।

হ্যাঁ, এই সেই তুর্কমান গেট, যা এককথায় বিংশ শতাব্দীর এক দুঃখচিহ্ন। সেকালের শাহজাহানাবাদের দক্ষিণ-মধ্য প্রান্তের আর এখনকার রামলীলা ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোনায় অবস্থিত তুর্কমান গেট আধুনিক ভারতের ইতিহাসে সেইভাবেই পরিচিত। তখন জরুরি অবস্থা বিরাজমান। উনিশ-শো ছিয়াত্তরের আঠারোই এপ্রিল প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হল বস্তি উচ্ছেদ অভিযান। দিল্লির রাজ্যপাল, পুরসভার কমিশনার, স্থানীয় থানার আধিকারিকদের উদ্যোগে এই এলাকার সমস্ত বস্তিকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শোনা যায়, একটু দূরের এক হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবিন লাগিয়ে সেই ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করছিলেন জরুরি অবস্থার যুবরাজ। সেই রণজিৎ হোটেল আজ আর নেই। সেই ভূমিতে গড়ে উঠেছে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনের দিল্লির দফতর।

তুর্কমান গেটের নাম নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ, শাহাজাহানাবাদের বাদবাকি দরজাগুলির সঙ্গে কোনো-না-কোনো জায়গার নাম যুক্ত। এটিই একমাত্র ব্যতিক্রম। হজরত শাহ তুর্কমান সামশুল আরেফিন বায়াবানী সংক্ষেপে শাহ তুর্কমানের সমাধির পাশেই ষোলো-শো আটান্ন-য় এই দরজাটি তৈরি হয়। প্রখ্যাত সুফি সন্ত শাহ তুর্কমান বারো-শো চল্লিশে মারা যাওয়ার পরে এখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। কাজেই মোঘল আমলের অনেক আগে থেকেই জায়গাটি তুর্কমান কবর নামে পরিচিত ছিল।

শাহজাহানাবাদের দক্ষিণ সীমানা বরাবর এখনও দাঁড়িয়ে থাকা *আজমেরী গেট*, *তুর্কমান গেট* আর *দিল্লি গেট* খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কত অনভিজ্ঞ হাতে এই গেটগুলির সংস্কার করা হয়েছে। সংস্কার হওয়া এই গেটগুলি এতটাই কম উঁচু যে এদের ভেতর দিয়ে কোনো হাতির যাতায়াত সম্ভব নয়। শাহজাহানাবাদে যেসব রাজা-মহারাজারা আসতেন তাঁরা তো সুসজ্জিত হাতির পিঠে চেপেই মোঘল দরবারে আসতেন। সংস্কার করার সময় বোধহয় এ বিষয়ে নজর দেওয়া হয়নি।

আসলে উনিশ-শো পঁচাত্তরে জরুরি অবস্থার সময় তুর্কমান গেট এলাকার বস্তি উচ্ছেদের পরে ক্ষোভ প্রশমনের জন্যে সাত তাড়াতাড়ি দরজাটির সংস্কার করা হয়েছিল। আজমেরী গেট, তুর্কমান গেট আর দিল্লি গেট এলাকায় বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াত বেশি বলেই বোধ হয় এই তিন দরজার এমন অক্ষম সংস্কার হয়েছে।

তুর্কমান গেটের কাছেই কালান মসজিদের পূর্ব দিকে সোয়া তিন বর্গমিটারের এক চত্বরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দিল্লির মসনদে আসীন প্রথম নারী প্রশাসক রাজিয়া সুলতানের সমাধি। সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে নারী দিল্লির মসনদে বসে প্রশাসন চালাতেন সময়ের ধারাবাহিকতায় আজ তাঁর সমাধির দুরবস্থা দেখলে মন খারপ হয়ে যায়। স্থানীয় ভাষ্যে জায়গাটির নাম *বুলবুলিখানা*। ধূলায় ধূসরিত অপ্রশস্ত-অপরিচ্ছন্ন চাতালের মধ্যে নিতান্ত অবহেলায় যে সমাধি বেদিটি পড়ে রয়েছে সেখানেই নাকি বারো-শো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রাজিয়া সুলতানকে কবর দেওয়া হয়েছিল। চারপাশে অসংখ্য দোকান, গ্যারেজ আরও কত কী! আর রয়েছে পুঁতির দোকান। তুর্কমান গেট এলাকার পাইকারি বাজারের প্রধান পণ্য পুঁতি। কাচ, প্লাস্টিক তো বটেই আরও কত রকমের যে পুঁতি হতে পারে তা এ-পাড়ায় ঘোরাঘুরি না করলে জানা যাবে না।

আর রয়েছে বই বাঁধাইয়ের কয়েকটি দোকান। দিল্লির বিভিন্ন সরকারি গ্রন্থাগারের পুরোনো বই এখানেই অনেককাল ধরে বাঁধানো হয়। কোনোক্রমে কামরুদ্দিন নামের এক বৃদ্ধের খোঁজ

পেলে অনেক গল্পকথা শোনা যায়। বই বাঁধানোর পেশায় যুক্ত এক কারিগরের নাম কামরুদ্দিন। খুব বেশি দৌড়ঝাঁপ বা খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। তুর্কমান গেট এলাকার কোনো প্রবীণকে জরুরি অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেই পাওয়া যাবে কামারুদ্দিনের অবস্থান। তাঁর নেতৃত্বেই বস্তিবাসীরা গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধ। পুলিশের অত্যাচারে প্রতিরোধ ভেঙে যায়। কামরুদ্দিন প্রাথমিক পর্যায়ে পালিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে যান এবং জেল খাটতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী, কারিগর ইত্যাদি রাজিয়া সুলতান বা তাঁর সমাধি নিয়ে চিন্তা করবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। যথার্থ মর্যাদা দিয়ে রাজিয়া সুলতানের সমাধি সুসজ্জিত করলে বরং তাদের ক্ষতি। অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। অনেকগুলি দোকান-গ্যারেজের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে। রুটি-রোজগার বন্ধ হলে পরিবার-পরিজন কোথায় যাবে? এতগুলি মানুষের উপবাসের দায়িত্ব কে নেবে? পেশাদার রাজনৈতিকরা নিশ্চয়ই এমন পরিস্থিতিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। এতগুলি ভোট বলে কথা।

এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে বারো-শো চল্লিশের চোদ্দোই অক্টোবর এখনকার হরিয়ানার কাইথালে খুন হয়ে যাওয়া রাজিয়া সুলতানের সমাধি নিয়ে কার মাথাব্যথা হবে? দিল্লিতে কি দ্রষ্টব্য স্থানের অভাব পড়েছে? দিল্লি পর্যটনের মানচিত্রে আরেকটি স্মারক যোগ না করলে কী-এমন ক্ষয়ক্ষতি হবে?

দুই

বছর কয়েক আগেও দিল্লির মেট্রো রেলে রেসকোর্স বলে একটা স্টেশন ছিল। এখন তার নাম লোককল্যাণ মার্গ।

মোঘলসরাই বা এলাহাবাদের নাম পালটিয়ে দিলেই যেমন ঐতিহ্য হারিয়ে যায় না ঠিক তেমনি দিল্লির রেসকোর্সের নাম লোককল্যাণ মার্গ করে দিলে তার আভিজাত্য তলিয়ে যায় না। এখানেই রয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন।

নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় ঘিরে রাখা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নিকটতম প্রতিবেশীর ঝুপড়িতে কিন্তু মাছি ভনভন করে। সত্তর বছরের পুরোনো মাছি ভনভন এই ঝুপড়িবাসীরাই (যার পোশাকি নাম বি আর ক্যাম্প) প্রধানমন্ত্রীর নিকটতম প্রতিবেশী।

আক্ষরিক অর্থে ধরলে ঢিল ছোড়া দূরত্ব হয়তো নয়! কিন্তু সাত নম্বর রেসকোর্স রোড-এর (অধুনা লোককল্যাণ মার্গ) নিরাপত্তা বলয় শোভিত সিংহদ্বার থেকে হেঁটে বস্তিটিতে পৌঁছোতে কিন্তু দশ মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

একটি রাস্তার দু-পারের ভারতের মধ্যে আকাশ-পাতাল এত পার্থক্য! সাত রেসকোর্স রোডের উলটো দিকের গলি দিয়ে মেরে-কেটে তিন-শো মিটার ঢুকলেই উনিশ-শো ছেচল্লিশে তৈরি হওয়া দিল্লি রেস ক্লাব। তার পাশের লাগোয়া জমিতে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষের কায়ক্লেশে জীবনযাপন। কোথাও বাঁশ আর ত্রিপল দেওয়া ছাউনি, কোথাও টিনের শেড। অল্প সংখ্যকই ইটের বাড়ি। তারই মধ্যে রাকেশ বনসলের ঘুপচিমতো বিড়ি সিগারেটের দোকান। ক্যাম্পের পুরোনো বাসিন্দা। রাকেশের কথায়,— 'এখানকার রেস ক্লাবের ঘোড়ারাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, কোনও নেতা-মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী নন। ওদের খাওয়ানো, ঘাসের পরিচর্যা, দেখভাল করার কাজ করেই এই বস্তির গুজরান হয়। এখন তো শুনছি, আমাদের নাকি তুলে দেবে। আমরা নাকি জবরদখলকারী। এত যুগ এখানে থাকার পর কোথায় যাব? নতুন কী কাজ করবে এখানকার মানুষ?' সরকারের কাছে এই ক্যাম্পের একটাই আর্জি,— পাকাপাকি থাকার সংস্থান।

উনিশ-শো চল্লিশ নাগাদ শিয়ালকোট থেকে দফায় দফায় মানুষ দিল্লি এসে রাজা সোয়াই মান সিংহের পরিত্যক্ত এই জমিতে নিজেদের বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করেছিলেন। কোনোমতে মাথা গোঁজা গিয়েছিল। গোড়ায় যে সংখ্যা ছিল হাজার খানেক, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কালক্রমে এই বস্তির প্রতিবেশী হন দেশের প্রশাসনিক প্রধান। কিন্তু প্রদীপের তলা একইরকম মাছির ভনভনেই থেকে গিয়েছে।

ক্যাম্পের প্রেসিডেন্ট রমেশ কুমার অতীতে ফিরে গিয়ে বলছেন, 'বিরাশি সালে ইন্দিরা গান্ধী এখানে এসে দুর্গামাতা মন্দিরের উদ্‌বোধন করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন বস্তিবাসীদের পাকা বাসস্থান করে দেওয়ার। কিন্তু তারপর আর কিছু এগোয়নি। দু-বছরের মধ্যে উনি নিজেই চলে গেলেন।' রমেশের উদ্‌বেগ লাগাতার উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তারা যে ঠিক কারা, তা স্পষ্ট বলতে পারছেন না বস্তিবাসীরা। বা বলতে চাইছেন না। শুধু বলছেন, 'এমন নয় যে কোনো নোটিশ এসেছে। কিন্তু কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের উঠে যেতে হবে।'

এখানকার সাংসদ সংসদে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার পরে একদিনও এখানকার হালচাল দেখতে আসেননি। বিধায়ক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সকলের কাছেই নিজেদের পাকা বাসস্থানের আবেদন নিয়ে চিঠি গিয়েছে। কাজের কাজ হয়নি।

অবস্থানগতভাবে অভিজাত এই এলাকায় সরকারি প্রকল্পগুলির অগ্রগতি কেমন? স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ছিটেফোঁটাও যে ঢোকেনি, তা মুম্বইয়ের ধারাভির মতো এখানকার গলিঘুঁজি ঘুরলেই বোঝা যায়। জল সরবরাহের অবস্থাও যে টিমটিমে তা প্রায় হাত ধরে একটা কলের কাছে

নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবে হাফপ্যান্ট পরা বালক শাহাদাত। টিমটিম করে এক বেলা জল আসা ওই কলতলাতেই অন্তত একশো পরিবারের লাইন পড়ে। শাহাদাতের দাদা ইমতিয়াজ দিনমজুর। পাশাপাশি ঘোড়াদের দেখভালের কাজও করতে হয়। ওদের মতে,— 'সরকার নয়, ওই ঘোড়ার ক্লাবই আমাদের মাই-বাপ। উনিশ-শো ছিয়াত্তরে এই বস্তি ছেড়ে সবাই যখন খিচড়িপুরে জায়গা পেয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন ওই রেস ক্লাব সস্তায় শ্রম পাওয়ার তাগিদে অর্ধেক মানুষকে প্রায় জোর করেই রেখে দেয়। কিন্তু ওরাও এখন হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এটা ভিআইপি এলাকা বলে ইট-সিমেন্টও ভিতরে নিয়ে আসা যায় না। কোনোমতে ঘর তৈরি বা মেরামতি করতে হলে রাতের বেলা লুকিয়ে নিয়ে আসতে হয়।'

এখানকার আরেক বাসিন্দা, দিল্লির একটি বাগিচার মালী পরশ রামের বয়স ষাট বছর পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে দেখছেন রাস্তার এপার আর ওপারের মধ্যে থাকা দুই ভারতকে। তাঁরও আতঙ্ক,— আমাদের যেন আর উচ্ছেদের ভয়ে জীবন কাটাতে না হয়।'

প্রদীপের তলায় চিরকালই গভীর আঁধারের আস্তানা। রামলীলা ময়দানে বছরের বারো মাসই দেশের সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রীরা এসে নিয়মিত ভাষণ দেন। নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে থাকা মঞ্চের দু-তিনশো মিটার দূরে অবহেলায় পড়ে থাকা ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিল্লির শাসকের সমাধির আশপাশে একটা বাতি জ্বালানোর কথাও কারও খেয়াল থাকে না। একইরকমভাবে একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ প্রশাসকের আলোকোজ্জ্বল সরকারি বাসভবনের তিন-শো মিটার দূরে বসবাসকারী নিকটতম প্রতিবেশীরা বছরের তিন-শো পঁয়ষট্টি দিন, প্রতিদিনের চব্বিশ ঘণ্টা যেকোনো মুহূর্তে উচ্ছেদের আশঙ্কায় আতঙ্ক আঁকড়ে বেঁচে থাকে।

ছবি : জহর দাশগুপ্ত

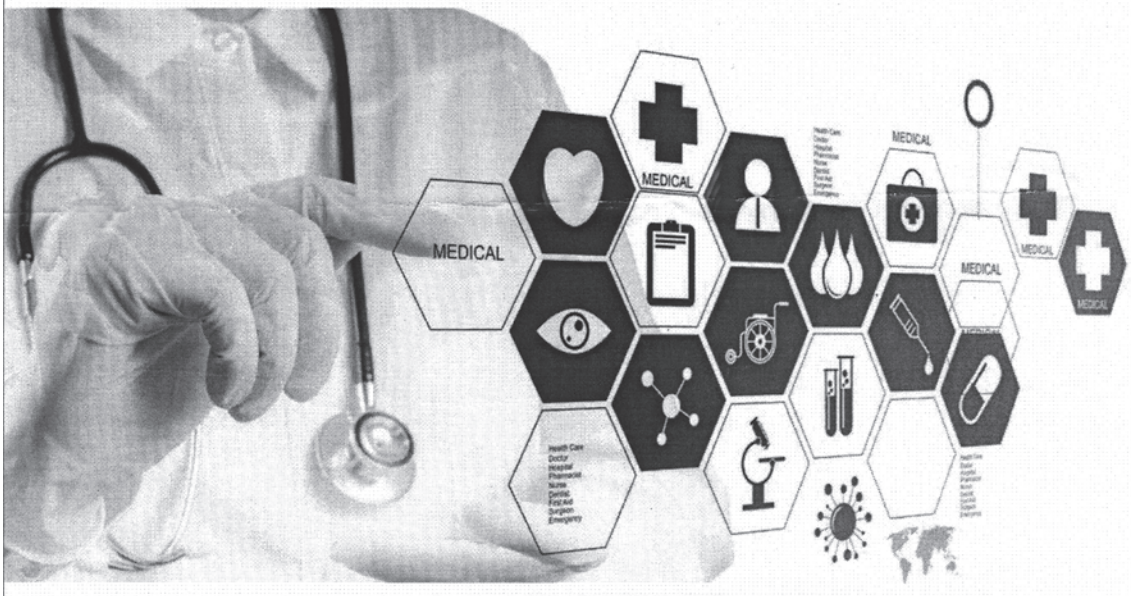

OPEN AT ALIPORE
ESTD.1996
Eastern Diagnostics
ISO 9001:2015 CERTIFIED & NABL ACCREDITED
...because health deserves care
MEDICAL
MEDICAL
MEDICAL
MEDICAL
FACILITY AVAILABLE
PET CT SCAN
SILENT MRI
LOW RADIATION CT SCAN
DIGITAL X-RAY
USG WITH ELASTROGRAPHY
EEG I EMG I NCV
MAMMOGRAPHY
BMD
CARDIOLOGY
UROFLOWMETERY
PATHOLOGY
DENTAL
HEALTH CHECKUP PACKAGES
HOME BLOOD COLLECTION
DOCTOR'S SUPER SPECIALITY CLINIC
5B, Alipore Park Road, (Near SBI Burdwan Rd. Crossing), Kolkata - 27, Ph. (033) 24498080 /81, 46018850
13C, Mirza Ghalib Street, (Near Fire Brigade HQ), Kolkata - 700 016, Ph. (033) 2217 8080 / 81, 4600 1706
Email : eastdiag.ind@gmail.com https://www.easterndiagnostics.com

গণতন্ত্র ও হিজিবিজি ভাবনা

সেমন্তী ঘোষ

প্রাচীন গ্রিস থেকে আধুনিক এই দুনিয়ায় আমরা অনেক রকম শব্দ নিয়ে এসেছি। কখনো একই আকারে, কখনো-বা একটু-আধটু পালটে নিয়ে আমাদের রোজকার কাজে লাগিয়েছি। আরো অনেক রকম শব্দ পড়ে আছে সেই প্রাচীন এথেনীয় শব্দভাণ্ডারে, তার আড়ালে পড়ে আছে আরো অনেক ধারণা, যেগুলো এতদিন আমাদের অত কাজে লাগেনি, কিন্তু এবার হয়তো লাগতে পারে। সভ্যতা বড়ো দ্রুত এগোচ্ছে, এমনই এক দিকে যাকে আর সভ্যতা বলে ওঠা যাবে কি না, তা-ও আমরা জানি না। এই অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে হাঁটার সময়ে, অনিশ্চিতির আতঙ্কে ভুগতে ভুগতে, পুরোনো ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তার থেকে পাঠ কিংবা বার্তা খুঁজতে ইচ্ছে করে। যে পথ দিয়ে চলে এলাম, তা ভুলিয়ে দিয়ে এবার কোথায় চলছি, গভীর অন্ধকারের দিকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি— এ সময়ে ইতিহাসকে স্মরণ করা দরকার নয় কি?

আর তাই, প্রাচীন গ্রিস থেকে আর একটা শব্দকে এবার তুলে এনে অভিষিক্ত করা যায় কি না, ভাবা যেতে পারে। শব্দটি হল 'অকলোক্র্যাসি'। দুটি গ্রিক শব্দ 'অকলো' এবং 'ক্রাটোস'— জনতা এবং ক্ষমতা— এই দিয়ে তৈরি শব্দটি, অর্থ হল 'পাওয়ার অব দ্য মাসেস', যাকে আমরা আজকাল চিনি-জানি সংখ্যাগুরুবাদ বলে। মজা হল, মবোক্র্যাসির মব থেকে অকলোক্র্যাসির অকলো, দুটির বাংলা অনুবাদই আমরা করব 'জনতা'। কিন্তু মবোক্যাসির থেকে অকলোক্র্যাসি অনেকটা আলাদা, এবং সেই পার্থক্যের একটা গভীর গুরুত্বও আছে। মবোক্র্যাসি কথাটা পরবর্তীকালে বানানো কথা, অকলোক্র্যাসি একেবারে খাস এথেন্স-এর 'সিটি-স্টেট' থেকে উঠে এসেছে, যার সঙ্গে 'নাগরিক'-এর অতি ঘনিষ্ঠ যোগ, যে যোগ 'মব' শব্দটির সঙ্গে নেই। আর একটু খোলসা করে বললে, মব কথাটার মধ্যে একটা নেতিবাচক ব্যঞ্জনা আছে— বিচারবিবেচনাহীন উত্তেজিত আবেগচালিত ভিড়ের ব্যঞ্জনা। কিন্তু অকলো-য় তা নেই।

বরং অকলো হল সেই জনতা, যাদের আমরা নাগরিক বলব। যারা একটা দেশ চালানোর কাজে নিজেদের মত দিয়েছে, যাদের মত সেই দেশের প্রশাসনের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে, সেরকম মানুষজন। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা পরিষ্কার করতে প্রাচীন গ্রিসের বিখ্যাত রাজনীতি-দর্শনবিদদের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। অ্যারিস্টটল ও পলিবিয়াস-এর মতে, যখন কোনো সরকার চলে সেখানকার 'ভার্চুয়াস' মানুষদের মত অনুযায়ী, তাকে আমরা বলব ডেমোক্র্যাসি। আর যখন কিছু জনপ্রিয়তাবাদী, জনআকর্ষণে মনোযোগী নেতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেই নেতাদের ক্ষমতাস্থাপনের 'ইনস্ট্রুমেন্ট' বা যন্ত্র হয়ে ওঠে মানুষ, তখন তাকে বলা যায় অকলোক্র্যাসি। অর্থাৎ মবোক্র্যাসির সঙ্গে পার্থক্যের পাশাপাশি ডেমোক্র্যাসি আর অকলোক্র্যাসির পার্থক্যটাও কম গুরুতর নয়।

কথাটা কিছু দিন হল ভাবাচ্ছে। গত পাঁচ-ছয় বছরে ভারতীয় গণতন্ত্র বিষয়ক অনেক লেখাপত্রেই একটি শব্দ বার বার ব্যবহৃত হয়েছে— সংখ্যাগুরুবাদ। কিন্তু গণতন্ত্র আর সংখ্যাগুরুবাদের মধ্যে পার্থক্যটা কী এবং কোথায়, সম্ভবত বিষয়টা সকলের কাছে সরল ও স্পষ্ট হয়নি। আরো একটা সমস্যা। গণতন্ত্র আর সংখ্যাগুরুবাদকে যদি-বা আলাদা করে বোঝাও যায়, গণতন্ত্রের মধ্যেই যে সংখ্যাগুরুবাদ তৈরি হয়, এবং প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির জন্ম প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়, এমনকী ভাবা যায়? সেক্ষেত্রে কি দুটিকে আলাদা করে ধরে নিয়েও এ কথা বলা যায় যে গণতন্ত্রের মধ্যেই আসলে একটা দোষ আছে, প্রায় সেই আদি পাপের মতো?

চারপাশের ঘটনাবলি দেখতে দেখতে গণতন্ত্র বিষয়ে এই দুর্ভাবনাটা হওয়া রীতিমতো স্বাভাবিক। কেবল ভারতের কথাই তো নয়। একের পর এক দেশে ঘটে চলেছে জনপ্রিয়তাবাদী নায়কের দক্ষিণপন্থী উত্থান। আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো উন্নত পশ্চিমি দেশ, কিংবা হাঙ্গেরি বা পোল্যান্ডের মতো তত উন্নত নয় এমন ইউরোপীয় দেশ, কিংবা ভারত বা তুরস্কের মতো অপ্রতীচী গণতন্ত্র। একটি সদ্য-প্রকাশিত পত্রিকায় দেখছিলাম, পিউ রিসার্চ সেন্টার থেকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার আটটি

দেশ নিয়ে করা এক সমীক্ষায় প্রায় ৭০ শতাংশ বলেছেন একই কথা: যেভাবে গণতন্ত্র তাঁদের দেশে কাজ করছে, তাতে তাঁরা বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। অর্থাৎ প্রয়োজনে তাঁরা গণতন্ত্রের খানিক ছেড়ে দিতেও রাজি। এই ধরনের সমীক্ষা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জনপ্রিয়তাবাদী নায়কের কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পথে মানুষের এত উৎসাহ কেন। গণতন্ত্রের মধ্যে জমতে থাকা এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ কাজে লাগিয়েই 'পপুলিস্ট' নেতারা মহাসমারোহে এগিয়ে চলেছেন— এগিয়ে চলেছেন একেবারে নিখাদ নিটোল গণতান্ত্রিক পথেই। সে-দিক থেকে গণতন্ত্র আজ বেশ নিরাপদই বলতে হবে। না, আর তাকে বাইরের কোনো শত্রুর জন্য ভয় করতে হচ্ছে না। এখন সে কেবল নিজেই নিজের বিপদ, আর কেউ নয়। এই সূত্রে ছোটোবেলায় পড়া যোগীন্দ্রনাথ সরকারের একটি বইয়ের 'ছবিতে গল্প' মনে পড়ছে, যেখানে সাপ নিজেই নিজেকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অকলোক্র্যাসির সূত্র হাতে এল। মনে হল এখানে হয়তো কিছু আলো দেখা যায়। 'ভার্চুয়াস' বলতে যদি সংকীর্ণ অর্থে কেবল 'ভালো মানুষ' না বুঝি, 'ভার্চুয়াসিটি' বস্তুটিকে যদি অভিধানগত কিন্তু বৃহত্তর অর্থে 'এবিলিটি' বা পারগতা হিসেবে বুঝি, তাহলে বলতে পারি— গণতন্ত্র যে আবশ্যিকভাবে সংখ্যাগুরুতন্ত্রে উপনীত হবে, এটা ঠিক নয়। গ্রিক দার্শনিকরা কেন ওই শব্দটা তৈরি করেছিলেন, সেই ইতিহাস ভালো করা পড়া দরকার ঠিকই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার খেয়ালে রাখা যে অষ্টাদশ শতক থেকে আবার শব্দটি নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল সে-দিনকার রাষ্ট্রনেতা বা রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের হাতে। জেমস ম্যাডিসন, আলেক্সি দ্য তকভিল, জন স্টুয়ার্ট মিল— এদের নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। এঁদের মনে হয়েছিল, সংখ্যাগুরুর শাসনে সংখ্যালঘুর অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা থাকে। কিংবা অন্যভাবে বললে, সংখ্যায় যাঁরা বেশি, তাঁরা 'পাবলিক ইন্টারেস্ট' অর্থাৎ জনস্বার্থ বিষয়টাকে মাথায় রেখে চলবেনই, তা না-ও হতে পারে। এরই ফলে উদ্ভূত হতে পারে অকলোক্র্যাসি। অর্থাৎ যেখানে সংখ্যাগুরু তার নিজের মতের ছড়ি ঘোরাচ্ছে, তা-ই হল অকলোক্র্যাসি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সম্ভাবনাও তাহলে তৈরি হয়ে যায়— যেখানে সংখ্যাগুরু তার মতবাদের দাপটের ছড়িটি ঘোরাচ্ছে না। এখনও একটি পরিস্থিতি তাহলে সম্ভব। এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার দিকে গণতন্ত্রকে চালনা করতে হবে নিয়ত, এই সতর্কবাণী ঠিকমতো প্রচার করার জন্যই ওই অষ্টাদশ শতকীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের অকলোক্র্যাসির কথা বলতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ম্যাডিসন মনে করেছিলেন, এই সমস্যা কাটানোর একটা পথ রাষ্ট্রকে ভাবতেই হবে, এবং সেই পথে ফেডারালিজম কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয়তা বিশেষ সহায়ক হতে পারে। কীভাবে? অবশ্যই তিনি মার্কিন দেশের বাস্তবের কথা ভাবছিলেন। ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে এত বড়ো একটা দেশে যেখানে অঞ্চলভেদে এত রকম বাসিন্দার সমাবেশ, সেখানে এক অঞ্চলের সংখ্যাগুরু অন্য অঞ্চলে সংখ্যালঘু হয়ে যায়, এবং প্রথম অঞ্চলে ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে তাদের মনে হবে, থাক বাবা, ওখানে আবার আমাদের লোকদের ধরে কী না জানি করবে অন্যরা! একটা বিশালাকার দেশের সর্বত্র সর্বপ্রান্তে একই সংখ্যাগুরু ছড়ি চালাবে, এমন কথা তিনি ভাবেননি, মার্কিন বাস্তবের কথা মাথায় রেখেই ভাবেননি। তবে কি না, সতেরো শতকের এই মার্কিন তাত্ত্বিক যা যেটুকু ভেবেছিলেন, তার থেকে একটা বড়ো সূত্র আমরা পেতে পারি, পরবর্তীকালে যে সূত্র গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোয় নানাভাবে প্রযুক্ত ও পরীক্ষিত হতে শুরু করে। এর নাম 'চেকস অ্যান্ড ব্যালান্সেস'-এর পদ্ধতি।

'চেক' ও 'ব্যালান্স'-এর নীতি মেনেই যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল আমেরিকায়, বা ইংল্যান্ডে, এবং তার ফল হিসেবে ভারতের মতো নবীনতর গণতন্ত্রে, সে আমরা জানি। কিন্তু প্রশ্ন হল— জানি, কিন্তু ততটা গুরুত্ব দিয়ে জানি কি? আস্তে আস্তে এই মৌলিক নীতিটির গোড়াটায় কোপ মেরে মেরে তাকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে বলেই যে আজ সংখ্যাগুরু এমন দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে, এই সংযোগটা আমাদের মাথায় যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে তৈরি হয় কি?

অন্তত ভারতে বসে সেকথা মনে হয় না। এ দেশে গণতন্ত্র বলতে এত বেশি করে ভোট ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কথা বোঝানো হয় যে তার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও অভ্যাস দিকটা নজর এড়িয়ে যায়। ভোটকে গণতন্ত্রের উৎসব বলে অভিহিত করা থেকেই হয়তো এই ভারসাম্যটা নষ্ট হতে শুরু করেছে। তাই নাগরিকের মানসজগতে 'প্রতিষ্ঠান' ও 'প্রাত্যহিক অভ্যাস'-এর গুরুত্ব কমতে শুরু করেছে। ভোট ব্যালটে হচ্ছে না ইভিএম-এ, তাই নিয়ে গণতন্ত্রের ভরাডুবির যত উত্তেজিত আলোচনা আমরা শুনি, পুলিশ বা আদালতকে অকেজো করার হাজারো বন্দোবস্ত নিয়ে অতটা ক্রোধ চারপাশে দেখি না।

অথচ এর জন্য কোনো ভয়ংকর দমননীতির দরকার হয় না, ছোটো ছোটো পা ফেলেই এই 'অকেজো' করে ফেলার কাজটা চলতে থাকে। তুরস্কের সাংবাদিক-লেখক এচে তামালকুরিন একটি অসামান্য বই লিখেছেন 'হাউ টু লুজ আ কান্ট্রি'। তুরস্কের প্রধান শাসক এর্দোয়ান সেখানে যা করছেন গত কয়েক বছর ধরে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে তা ছবির মতো তুলে ধরেছেন এচে। গায়ে শিহরন লাগে এই বই পড়তে গিয়ে। কেননা প্রতিটি ছবির সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা যেন খাপে খাপে মিলতে শুরু করে। এচে লিখেছেন, কোনো এক লেখক বা

সহকর্মী গ্রেফতার হওয়ার পর সেই কেস নিয়ে মামলা চলার সময়ে সাংবাদিকরা যখন ভিড় করেন প্যালেস অব জাস্টিস-এ, তখন কৌশল করে তাঁদের ভুল ঘরে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করানো হয়। অপেক্ষা করানো হয় একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ খবর আসে, ওই ঘরে এসেছেন বিচারক। দৌড় দৌড় দৌড়, প্রবল খোঁজাখুঁজির পর শেষে যখন 'সেই' ঘরে ঢুকতে পারেন সবাই, ততক্ষণে তাঁরা ক্লান্ত বিধ্বস্ত। শুনানি শুরু হলেও তাতে আর তত মনোযোগ দেওয়া যায় না। বিচার সুবিচার না হলেও বেশি কিছু করার থাকে না। কখনো কখনো এক জন দুই জন ছাড়াও পেয়ে যান, সম্ভবত এইটুকু প্রতিষ্ঠা করতেই যে— যা হচ্ছে, সুবিচারই হচ্ছে। ফলে পাঁচ জন ছাড়া না পেলেও এক জন যে পেয়েছেন, তাতেই যেন ক্ষোভে মলম পড়তে থাকে। তার চেয়েও বড়ো কথা, বিচার নামক ব্যবস্থা এবং শাসন নামক ব্যবস্থার মধ্যে যে যোগাযোগ, তাদের মধ্যে 'চেক'-এর পরিমাণ কমতে শুরু করলেও তা নিয়ে কিছু করার থাকে না।

মনে পড়তে পারে, ভারতের হৃদয়স্থলে যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে যখন একের পর এক 'অপরাধী' মারা যান এনকাউন্টার-এ, আর বিচারে নির্ধারিত হয় তাঁদের 'অপরাধ', তখন বিচার আর শাসনের মধ্যে কতটা 'চেক' অবশিষ্ট আছে, কতটাই-বা 'ব্যালান্স', কিছুই যেন স্পষ্ট হয় না। কিংবা সর্বোচ্চ আদালতের মহামান্য ন্যায়াধীশরা যখন বাইরে সাংবাদিকদের ডেকে বিচারপদ্ধতির বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ জানান, তখনও সচেতন নাগরিক হদিশ পান না, কোন পদ্ধতিতে কতটাই-বা গোলযোগ, এবং কারাই-বা সেইসব সমস্যাজনক পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলেছেন। অর্থাৎ কথাটা হল, গণতন্ত্র যেহেতু প্রত্যহ পালনীয় একটি বিষয়, প্রত্যহই যদি তা না প্রহরা দেওয়া হয়, এবং সেই প্রহরা দেওয়ার 'ভার্চুয়াসিটি' বা পারগতাকে যদি বিনষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে যা পড়ে থাকে— তাকে হয়তো প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রহীনতা বলা চলে না, কিন্তু তার মধ্যে গণতন্ত্রের গুণাবলি কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। সেই অঙ্গহারা গণতন্ত্রে অতি সহজেই নীতিহীনতা বা অ-পারগতার বিষয়টাকে সমর্থকের সংখ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। অর্থাৎ গণতন্ত্র তার একটা অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলে নিজেই নিজের ক্যারিকেচার হয়ে ওঠে।

এই 'ভার্চুয়াসিটির'-রই আর একটি দিক— গণতন্ত্রের বিরাট বৈশিষ্ট্য— সামাজিক সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করা। এই জায়গাটাতেই সে সংখ্যাতত্ত্বকে হারিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তি হয়ে ওঠে। সংখ্যার বিচারে কেউ 'গুরু'-র অন্তর্ভুক্ত হবেন, কেউ 'লঘু', কিন্তু তা-ই বলে গুরুত্বের বিচারে যে কেউ ছোটো নন, এই সামান্য কথাটা সমাজে ও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করার একটা আলাদা পারগতা দরকার হয় সত্যিকারের গণতন্ত্রে। যিনি ভোট দিয়েছেন, আর যিনি ভোট দেননি— দুই জনকেই যে ব্যবস্থা 'রক্ষা' করতে পারে, তার নামই গণতন্ত্র। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর সময়ে বসে ঠিক এই জায়গাটায় আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার মনে করেছিলেন, কেননা তা না হলে সে-দিনকার গণতন্ত্র কেবল সমাজের 'ধনী' মানুষদেরই প্রাধান্য দিতে শুরু করবে, এমন আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। এ ভাবনাটাকে অবান্তর বা অবাস্তব বলা যাবে না। এমন করে ভাবতে পারেন, এমন দল বা এমন নেতা আমরা অতীতে দেখেছি। ভবিষ্যতেও দেখব না, এত বড়ো হতাশার কথা বলার সময় হয়তো আসেনি। প্রশ্ন হল, সেই নেতার নির্মাণ কি একটা আকস্মিক ঘটনা? ইতিহাসের খেয়ালখুশি? একটা দল বা গোষ্ঠী যদি কোনোভাবে ক্ষমতাসীন হয়ে বাকিদের উপর অত্যাচার চালায়, তেমন কোনো ভার্চুয়াস নেতা যদি তার হাল ধরার জন্য না থাকেন, তবে কী করণীয়? কেমন করে আটকানো যাবে সেই অন্যায়ের অশ্বমেধ?

এ প্রশ্নের উত্তরে পৌঁছোনোর পথ এই মুহূর্তে খুঁজে চলেছে এ পৃথিবী। হয়তো একটা উত্তর হতে পারে, গোষ্ঠী-পরিচিতির লঘুকরণের মধ্যে। হয়তো উত্তর হতে পারে— পরিচিতির বহুত্ব অনুভব করার মতো 'ঘটনা' ঘটলে গোষ্ঠী-পরিচিতিরও বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব, নেতৃত্বের সমদর্শিতাও সম্ভব। কিন্তু 'ঘটনা'র আবির্ভাব ছাড়া, মানুষের হস্তক্ষেপে তা নিশ্চিত করার উপায় আছে কি না, জানা নেই। আমাদের জানা-বোঝা রাজনীতির কেনই-বা বারে বারে আমাদের পরিচিতির এই কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে তোলে, সেটাই তো বোঝা গেল না এখনও।

সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হল, তত্ত্বে যদি-বা এমন কিছুর হদিশ পাওয়া যায়— ইচ্ছে করলেই মানুষ ঘটিয়ে উঠতে পারে না এমন ধরনের আকস্মিক সম্ভাবনার উপর কি আমাদের প্রায়োগিক রাজনীতি আদৌ নির্ভর করতে পারে? জানা নেই। কিন্তু অকলো আর ডেমো-র পার্থক্য অন্তত এটুকু আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারে যে, ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র যে একেবারে অবধারিতভাবে সংখ্যাগুরুতন্ত্রে পৌঁছোবেই, এটা বলা যায় না। এইটুকু দাবি করার মতো যুক্তি নিয়েই হয়তো এখন আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সামনের দিকে তাকাতে হবে। পুরোনো তাত্ত্বিকদের সাবধানবাণী মনে রেখে প্রকাশ্যে, সম্মিলিতভাবে, অবিচ্ছিন্নভাবে খেয়াল রাখতে হবে— সংখ্যায় যাঁরা কম, কিংবা সামাজিক সরবতায় যাঁরা পিছিয়ে, তাঁদের অধিকার রক্ষা হচ্ছে কি না। তখনই সেই ঈপ্সিত গণতন্ত্রকে আবার নতুন করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

স্মৃতির সরণি ধরে চলতে চলতে

তৃষিতানন্দ রায়

আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল পাবনা শহরে আর মাতুলালয় রাজশাহীতে। পিতৃকুল-মাতৃকুল উভয় দিকই রাজনীতি সচেতন। দাদামশায় গোপেন্দ্রসুন্দর মজুমদার রাজশাহী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। শুনেছি সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় (তখনও 'নেতাজি'-তে ভূষিত হননি) মাতুলালয়ের চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় দীর্ঘক্ষণ মিটিং করেছিলেন রাজশাহীর পুর নির্বাচন নিয়ে। দাদুকে নির্দেশ দেন জিতলে ভাইস চেয়ারম্যান হতে হবে। তিনি হয়েও ছিলেন। মামাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। আমাদের পরিবারের উভয় পক্ষেই অধিকাংশ শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছেছিলেন। তার মধ্যে আমার বাবা একজন। ন-কাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। সরকারি কর্মচারী সংগঠন তৈরিতে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং এর জন্য বারে বারে তাঁকে তৎকালীন সরকারের রোষানলে পড়তে হয়। সেজোকাকা কালীধন ইনস্টিটিউশনে মাস্টারমশাই ছিলেন। শিক্ষক সংগঠনের কাজে যুক্ত হওয়ায় তাঁকেও নানা নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের জেনারেশনেও অনেকেই বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত।

আমার নিজের বামপন্থী চিন্তাভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মূলে কিন্তু আমার বড়ো ভগ্নীপতি অংশুমালী মজুমদার। যশোহর জেলার বিনোদপুর-এর বিখ্যাত মজুমদার পরিবারের ছোটোখাটো টুকটুকে ছেলেটি বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে। ওই সময়েই তার কমিউনিস্ট আন্দোলনে হাতেখড়ি। এটা হওয়ারই ছিল কারণ এই পরিবারের বোধহয় সবাই বামপন্থী। অংশুদার বিচিত্র সব কার্যকলাপ বিশেষ করে পার্টি যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে— রীতিমত রোমাঞ্চকর। কিন্তু তিনি নিজ মুখে এসব কথা কখনো বলেননি, তার বন্ধুদের কাছে শোনা। দিদির বিয়ের সময় আমি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। অল্প কয়েক জন বরযাত্রীদের মধ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যতদূর মনে পড়ে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (লোকায়ত দর্শনখ্যাত), রমাকৃষ্ণ মৈত্র ও অন্যান্য জনেরা। ঘটক ছিলেন উভয় পক্ষের পরম সুহৃদ ও আত্মীয় পরিমল মিত্র (বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী)। বিয়ের পরে অংশুদা যখন প্রথম বার কৃষ্ণনগরের বাড়িতে এলেন তখন আমরা খুদে খুদে অনেকেই আছি। ব্যাগ থেকে বের হল ছোটোদের বিচিত্র সব বই। লেখকের নাম চিন্মোহন সেহানবীশ। সেদিনের সেই স্মৃতি আমার পরিষ্কার মনে আছে। এইভাবে পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত এক বালক অনেক বড়ো বড়ো দাদা পেয়ে গেল। সেদিনের সেই বালক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রায় সব দাদাদের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। আজ আমার জীবনে এদের সকলের অবদান উপলব্ধি করি। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের লাগোয়া যে বাড়িটা পার্টির কমিউন ছিল বিয়ের পরে তা উঠে গেলেও কমিউন স্পিরিটটা কিন্তু বহুকাল অটুট ছিল। সেইসূত্রে আমার অনেক পাওয়া।

আমি কৃষ্ণনগর শহরে দেবনাথ হাইস্কুলের ছাত্র ছিলাম। ১৯৫০ সালে বাড়ি বদল করে আমরা পাকাপাকিভাবে কৃষ্ণনাগরিক হয়ে যাই। বাড়িবদলের কিছুদিন পরে বাবারও চাকুরি বদল। ওই দেবনাথ হাইস্কুলের শিক্ষক। বাবার হাত ধরেই আমার স্কুলযাত্রা শুরু। কবে বাবা সেই হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন তা আজ আর মনে নেই। স্কুল ফাইনাল পাশ করে কৃষ্ণনগর কলেজে এক বছরের প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসে ভর্তি হই। এক বছরের সিনিয়র ছিলেন অনিলদা। মানে অনিল বিশ্বাস, ছোটোখাটো ছিপছিপে অনিলদাকে দূর থেকে আসতে দেখলেই আমরা পালাতাম ভোলাদার ক্যান্টিন থেকে। তাঁর দুই কাঁধে দুই ভারি ব্যাগ বইতে ভরতি। দেখলেই চাপাবে মানে কিনে পড়তে বলবে। তখনই তাঁর এই নিষ্ঠা। এই একবছর ছাত্রকালেই অবশ্য অল্পস্বল্প ছাত্র রাজনীতিতে আমিও অংশগ্রহণ করেছি। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই বলে দেওয়া হল আমাদের সেকশনে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ (সিআর) দাঁড়াতে হবে। আমি কিছু বলব বলব ভাবছি ওদিক থেকে আবার কথা ভেসে এল সব ভালো ছেলেরাই এসএফ করে। তবে আর কী! আমাদের সেকশনে ৪টি সিট ছিল। আমরা দুটি পেলাম। বাদল

আর আমি। বাদল মানে এনবিএ-র বাদল দাশগুপ্ত। বস্তুত পার্টি অন্তঃপ্রাণ বাদল অত্যন্ত মেধাবী হয়েও কেরিয়ার তৈরির দিকে এগোয়নি। আমার সঙ্গে সদা সর্বদা যোগাযোগ আছে।

আমি চলে এলাম কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে। ভর্তি হলাম আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে। হোস্টেল জীবন শুরু। প্রথম দিকে ঘন ঘন কৃষ্ণনগর যেতাম। প্রায় প্রতি সপ্তাহে। ছুটি থাকলে তো কথাই নেই। উদ্দেশ্য একটাই। কৃষ্ণনগরের আড্ডা। সরপুরিয়া, সরভাজার মতো কৃষ্ণনগরের আড্ডাও খুব বিখ্যাত। আড্ডা কিন্তু আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এতে কোনো রাজনৈতিক বিধিনিষেধ ছিল না। রাজনীতির আলোচনা তো হবেই। বিতর্ক হত। মাঝে মাঝে হাওয়া গরম হত। তখনই আবার কেউ না কেউ ঠান্ডা বাতাস বইয়ে দিত। একবার এইরকম পরিস্থিতিতে এক বন্ধু, সে কিন্তু ছাত্র পরিষদের নেতা, ছুটে এসে আমার মুখটা চেপে ধরে বলতে থাকল 'কী হচ্ছেটা কী? সামনে গদাদা বসে বসে সব শুনছে।' গদাদা মানে অমৃতেন্দু মুখার্জি পরবর্তীকালে বামফ্রন্টের দুগ্ধ ও পশুপালন মন্ত্রী। অজাতশত্রু গদাদা মাধবদার দোকানের সামনে আর আমরা পিছনে। উনি চুপচাপ বসে ভাবেন আর আমরা যা করার করি। যাই হোক, এর পরে প্রসঙ্গ পালটে আমাদের 'ঐকতান' ক্লাবে সরস্বতী পুজোর পর কী বিচিত্রানুষ্ঠান হবে, কাদের নিয়ে আসা হতে পারে হয়তো এইসব আলোচনা হয়েছিল। আবার আর এক 'ফুট' চায়ের চুমুকে।

ডাক্তারি পড়াকালীন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলাম না। ছাত্র রাজনীতি বলতে যা বোঝায় সেই পরিবেশ আমাদের কলেজে ছিল না। আমার বাবা-মা সচরাচর কোনো বিষয়েই জোর করে কিছু বলতেন না। কিন্তু আমার অভিভাবকের সংখ্যা সাকুল্যে কম ছিল না। শিক্ষকের ছেলে, হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। অতএব মন দিয়ে পড়াশোনা করাটাই একমাত্র কাজ। ভালো ডাক্তার হয়ে মানুষের ভালো করতে পারলেই দেশের কাজ করা হবে। এই হচ্ছে তখন মূলমন্ত্র। কিন্তু রাজনীতি এড়িয়ে চলা কি অতই সহজ! বিশেষ করে যে সময়ে, যে সামাজিক পরিসরে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ১৯৬৪-১৯৬৯ সাল হচ্ছে আমাদের ডাক্তারি শিক্ষার সময়কাল। সময়টা চিন্তা করুন। ১৯৯৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হল মতাদর্শগত কারণে। এক পার্টি থেকে দুই কমিউনিস্ট পার্টি হল— সিপিআই ও সিপিআই(এম)। ১৯৬৬ সালে দেখলাম দ্বিতীয় খাদ্য আন্দোলন। ১৯৫৯ সালের মতো কলকাতা-হাওড়া-কেন্দ্রিক না। শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে ১৯৬৬-র আন্দোলন। কৃষ্ণনগরে পোস্ট অফিসের সামনে পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল বরাবরের মতো ১৭ বছরের আনন্দ হাইত। ওদিকে ১৫ বছরের নুরুল ইসলাম তৎকালীন ২৪ পরগনার তেঁতুলিয়াতে বা স্বরূপনগরে। সেই স্বরূপনগর যেখানে এখন মতুয়া রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত।

১৯৬৭ সালে আমি ভোটাধিকার পাই। ভোটার লিস্টে আমাদের কয়েক জনের নাম ওঠানোর ব্যবস্থা করেছিল কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দাদা। অতি অমায়িক এই দাদা। অত্যন্ত ভালো ব্যবহার। আমরাও তার প্রতি দৃষ্টিগতভাবে খুবই অনুগত ছিলাম। আগেই বলেছি আমাদের কলেজে তখন এসএফ, ছাত্র পরিষদ এসব ছিল না। সবই বকলমে বিশেষ কোনো দলের কোনো-না-কোনো দাদার হয়ে সরাসরি লড়াই করত। দু-একজন ব্যতিক্রম ছিল বলে মনে হয়, কলেজ রাজনীতিতে যাই হোক ওই ১৯৬৭ সালেই বৃহত্তর রাজনীতিতে ভোটার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পেরে কেমন একটা শ্লাঘা বোধ হয়। এই নির্বাচনেই প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হয় প্রথম বার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে হারিয়ে। প্রথম অকংগ্রেসি সরকার। আমরা তো ভাবলাম বিপ্লব এসেই গেল বোধ হয়। সিপিএম-এর সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রদ্ধেয় অজয় মুখোপাধ্যায়। উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখ করি। প্রথম এই কোয়ালিশন সরকারে সিপিআই ও অন্যান্য দল তো ছিলই। মন্ত্রীসভায় এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিপিআই-এর বিশ্বনাথ মুখার্জি যিনি অজয় মুখার্জির সহোদর। তাঁর স্ত্রী গীতা মুখার্জি সিপিআই-এর সর্বভারতীয় নেত্রী। সারা দেশ ছুটে বেড়ান পার্টির কাজে। কথাটা বলছি এই কারণে যে দাদা অজয় মুখার্জি আর ভাই বিশ্বনাথ আর গীতা মুখার্জির ভিতরে যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, শ্রদ্ধা তা বার বার স্মরণ করার মতো। রাজনীতিগতভাবে সম্পূর্ণ দুই মেরুতে বিরাজ করা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক চিরকাল অটুট থেকেছে। কারণ ব্যক্তিস্বার্থহীন রাজনীতি।

তবে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার মার্চ ১৯৬৭ থেকে নভেম্বর ১৯৬৭ পর্যন্ত ৭ মাস স্থায়ী হয়েছিল। ভিন্ন মতাবলম্বী দল নিয়ে গঠিত এই ফ্রন্ট সরকারের অন্দরমহলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হল।

১৯৬৭ সালেই সিপিএম-এর উত্তরবঙ্গের পার্টি নেতৃত্বের মধ্যেই ভিন্নমতের প্রভাব বেড়ে ওঠে। সেইমতো হল জোতদারদের বেনামি জমি জবরদখল করে তা গরিব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে আর এই আন্দোলন একমাত্র সশস্ত্র পথেই সফল হতে পারে। জলপাইগুড়ির নকশালবাড়িতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দেখা দেয়। সেইসময় যুক্তফ্রন্ট সরকার কিন্তু যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণ করে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৯-এ যখন ফিরে আসে তখনই নকশাল আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ বিস্ফোরণ ঘটে। প্রথম শুরু হয়

জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম সেই নকশালবাড়িতেই। গ্রাম থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হল। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কিন্তু সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করেনি। এর প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় অজয় মুখার্জি নিজেই তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান শুরু করেন। ফলে ১৩ মাসের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও পতন ঘটে। পরে আবার আসব এই প্রসঙ্গে।

আগেই বলেছি নকশাল আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। খুব দ্রুতগতিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। সশস্ত্র এই আন্দোলনে গ্রামের জোতদার, বড়োলোক থেকে শুরু করে শহরের বড়োলোক, পুলিশ, রাজনৈতিক বিরোধী এমন অনেকের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। বিভিন্ন জায়গায় মনীষীদের মূর্তি ভাঙা হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও রেহাই পাননি। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ নকশাল আন্দোলনে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান। কলেজ, হোস্টেল, ডিউটি রুম, এমার্জেন্সি, ক্যান্টিন, গ্রুপ 'ডি' কর্মীদের কোয়ার্টার্স সর্বত্র দিনরাত মিটিং কাজকর্ম চলতে থাকে। সদা সর্বদা চোখ খুলে চলাফেরা করতে হত। হোস্টেলে দুপুররাতে ঘরের মধ্যে জানলা দিয়ে টর্চ লাইটের তীব্র আলো ফেলে ঘুম ভাঙিয়েছে পুলিশবাহিনী। প্রত্যেক ঘরে তল্লাশি চলছে। বারে বারে আমাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে শ্যেন্ দৃষ্টিতে। হাড়-হিম-করা দৃষ্টি। একটা লাল বুকলেট দেখতে পেয়ে তুলে নিল, বুক ঢিপঢিপ করছে। বোঝানো গেল শেষপর্যন্ত যে ওটা একটা ওষুধ কোম্পানির বুকলেট। আর একদিন বিকেলে হোস্টেলে ঢুকে দেখি সারি সারি পুলিশ দোতলাতেই বারান্দায়। কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের জুনিয়র এক ভাইকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ঘোরাচ্ছে আমাদের ভয় দেখানোর জন্য। অনেক দিন পরে খবর পাই ছেলেটি আর নেই। আমরা অনেকেই ছিলাম যাদের ভিতরে ভয় ভয় থাকলেও গতিবিধি স্বচ্ছন্দই ছিল। অনেকসময় বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছি— সে যেই হোক। আমাদের পরামর্শ কিন্তু সবাই অন্তত কানে শুনত যদিও তাকে একান্ত ব্যক্তিগত স্তরে ভালো হোক মন্দ হোক আপনি চান বা না-চান নকশাল আন্দোলন বিশ্বব্যাপী এক গবেষণার বিষয়।

আর একটা কথা বলেই এই পর্ব শেষ করছি। সক্রিয় রাজনীতি এখানে না করলেও শেষের দিকে অর্থাৎ ওই তুমুল দিনে আর জি কর ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ মিলে ছাত্র ফেডারেশনের একটা গ্রুপ আমরা কয়েক জন তৈরি করেছিলাম। তবে তা চলেনি। অধিকাংশ নকশাল পার্টিতে চলে যায়। আমাদেরও ফাইন্যাল এমবিবিএস পরীক্ষায় দিনও এগিয়ে আসতে থাকে।

পরীক্ষা নিয়েও সমস্যা। পরীক্ষা পিছোনো আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কবে আমাদের পরীক্ষা হবে? এমতাবস্থায় ১৯৬৯ সালের সব মেডিক্যাল কলেজের প্রধানত যারা হোস্টেলবাসী তারা মিলে ঠিক করলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মহাশয় সত্যেন সেনের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে তাঁর কাছে যাব। আমাদের এক বছরের সিনিয়র চন্দন রায়চৌধুরীকে বলা হল। চন্দনদা নির্ভেজাল কংগ্রেসি। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্তরে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। বেশ কয়েক বছর আগে দুরারোগ্য ব্যাধিতে পিজি হাসপাতালে ভর্তি ছিল। একদিন তাকে দেখতে যেতে না পারলে আমাকে ডেকে পাঠাত। তখন আমি পিজি-তেই চাকরি করি— থাকিও। এই চন্দনদাই সেদিন উপাচার্য স্যারের সঙ্গে আমাদের সকলকে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের পরীক্ষা যাতে যথাসময়ে করা যেতে পারে সেই প্রতিশ্রুতিও চন্দনদা ছাত্রনেতা হিসেবে দিয়েছিল। পরীক্ষা যাতে পরিষ্কারভাবে হয় সেই দাবিও মানা হয়েছিল। ওই একবারই। তারপরে পরীক্ষা পিছোনোর তো শেষ ছিল না। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে তখন অরাজকতা। মনে পড়ে যায় সেই কুখ্যাত '৭২-'৭৭ সাল। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হলে ১৯৭১ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক স্বল্পকালীন কংগ্রেস সরকার হয়। তারপরই সমস্তরকম অনিয়ম-বেনিয়মের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে ৭২-৭৭-এর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। ১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে সিপিআইএম-এর আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৩, ৮০ ও ১১৩। এই ৭১ সালেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও তজ্জনিত শরণার্থী সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সহযোগিতা স্মরণীয়। এটি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটি বিরাট সাফল্য ছিল। অথচ ৭২-৭৭-এ বামদের হল ১৪টি আসন। কারণ শাসকদল তথা নবকংগ্রেসের ব্যাপক ও নজিরবিহীন ছাপ্পা ভোট। এর প্রতিবাদে বামেরা ৭২-৭৭ পুরো সময়টাই বিধানসভা বয়কট করে। পাঁচ বছর বিধানসভার ভিতরের সুযোগ না নিয়ে বাইরে মানে পথে, জনগণের সঙ্গে থেকেই লড়াই চালিয়ে যায়। আবারও বলি, ৭২-৭৭-এর ইলেকশন মেশিনারির যথেচ্ছাচারে যে অঘটন ঘটে তা সর্বজনবিদিত। ১৯৬৭-'৭১-এ আইনশৃঙ্খলার কিছু অবনতি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ৭২-৭৭-এর মানুষের উপর যে সীমাহীন অত্যাচার হয় পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের দ্বারা সংঘটিত এটি ইতিহাসের একটি ঘৃণ্য কালো অধ্যায়। এই লুম্পেনবাজির সঙ্গে অনেকেই নকশাল আন্দোলনকে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

এরই মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধীর রায়বেরিলি থেকে লোকসভার সদস্যপদ খারিজ করে দেয়। এরপর সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। দেশজুড়ে লাগাতার ধরপাকড় উৎপাত ও তারই প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনে সেই অধ্যায়ের অবশেষে সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭৭ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সেই আন্দোলনের পরে জনতা পার্টি তৈরি হয়। ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে প্রথম বার দেশে জনতা পার্টির অকংগ্রেসি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর কিছুদিন পরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন হয়। বামপন্থী পার্টিরা এই সময় মিলিত হয়ে ফ্রন্ট তৈরি করে এবং নির্বাচনে বামফ্রন্ট জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে সিপিএম এককভাবে ১৭৮ সিটে জয়ী হয়। অর্থাৎ ৭২-৭৭-এর সেই নির্বাচনী প্রহসনে একবারই সিপিএম মাত্র ১৪টি আসন পায়। এরপর থেকে বামফ্রন্ট এক নাগাড়ে জনসমর্থন পেতে থাকে যা ৩৪ বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত অটুট থাকে। জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে প্রথম বামফ্রন্ট শপথ নেওয়ার পরেই রাইটার্স বিল্ডিং থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন সাধারণ মানুষ বামফ্রন্টকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন মনে রাখবেন কথাটা দায়িত্ব; ক্ষমতা নয়। তাঁর সরকার রাইটার্স বিল্ডিং নয় মানুষের সঙ্গে থেকেই সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাবেন। এও স্বীকার করেন প্রথমেই পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় সব পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের সুযোগসুবিধা জীবনযাপনে যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এর পরেই ভূমি সংস্কার, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। ফলে গ্রামের প্রভূত উন্নতি হতে শুরু করে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়তে বাড়তে রেকর্ড করতে থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদনেও প্রভূত উন্নতি হতে শুরু করে। বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রক্তদান আন্দোলন হয়। তৈরি হয় কলেজ সার্ভিস কমিশন এবং পরে ইশকুল সার্ভিস কমিশন যাতে শিক্ষক নির্বাচন নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত হয়। শিক্ষাজগতে শৃঙ্খলা ফিরে আসতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও শিক্ষানীতি প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি না থাকার জন্য প্রচুর সমালোচনা হয়। কেউ কি বলতে পারে কোনো আলোচনা সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হয়েছে? বামফ্রন্টের সময়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতও অনেক বাড়তে থাকে। বছর বছর শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভরশীল কেন্দ্রের উপর। সার্বিক আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থার কথা ভাবা উচিত। বিশ্বায়ন, তার সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির চাপ সরাসরি সরকারের উপর এসে পড়ে। পুরোনো সংক্রামক ব্যাধিগুলোর সঙ্গে নতুন নতুন অন্যান্য ব্যাধি যা আমাদের দেশে আসতে শুরু করে তাদের প্রতিরোধ থেকে শুরু করে উৎকৃষ্ট মানের সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি হাসপাতালেই হত। ফলে সরকারি হাসপাতালে ভিড় বাড়া তখন থেকেই কিছু পাওয়ার আশাতেই। অত্যধিক রোগীর চাপে শৃঙ্খলা, বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই হয়েছে। তাই বলে উদ্দেশ্যকে কি সাধুবাদ দিতে বাধা আছে! স্বাস্থ্য আন্দোলন হয়েছে প্রতিনিয়ত মানুষকে সচেতন করার জন্য। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছর চালিয়েছে ভালো-মন্দ মিশিয়ে। এরপর যখন নতুন করে শিল্পোন্নয়নের কাজ শুরু হল তখনই বিরোধীদের মাথায় হাত পড়ল, তাহলে কি আরো ৩৪ বছর? কী করে বন্ধ করা যায়? 'ম্যান মেড বন্যার' তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরাই জানেন কী করে বন্ধ করা যায়। কী করে বন্ধ করা হল!

সবশেষে বলি, ভারতের সংবিধানে তো প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের কথা বলা আছে। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিযোগিতায় শামিল হয়। একদল জিতবে আর অন্যদলগুলি জিতবে না। এই তো? অথচ ইদানীং আমাদের রাজ্যে দেখি জয়ী বা পরাজিত দলগুলি কেমন বিভিন্ন ধরনের হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। সবাই চায় চিরকাল ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে। হ্যাঁ, ক্ষমতাই। সেই যে জ্যোতিবাবু বলেছিলেন ১৯৭৭-তে সরকারি দায়িত্বের কথা, সেটাই ক্রমে ক্রমে ক্ষমতায় পর্যবসিত হয়েছে। সংবিধানের সেই 'মানুষের সরকার, মানুষের জন্য সরকার বা মানুষের দ্বারা সরকার' মোটেও নয়। জনগণকে শাসন করবে, দমন করবে, কখনো কখনো দান করবে। 'তোমার শীল, তোমার নোড়া তোমারই ভাঙছে দাঁতের গোড়া', এ কিন্তু চিরকাল চলে না। পৃথিবীর ইতিহাস তা বলে না। নাহলে আগামী দিন কিন্তু আরো ভয়ংকর।

ছবি : ধীরাজ চৌধুরী

ছবি : গোপাল সান্যাল

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

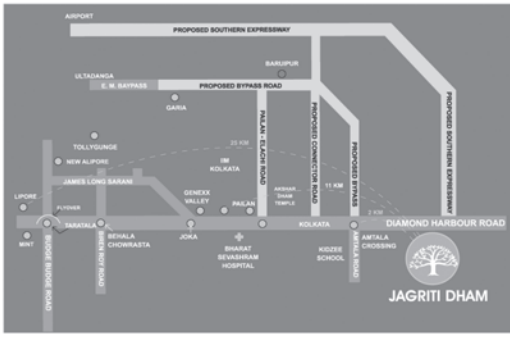

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503
contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

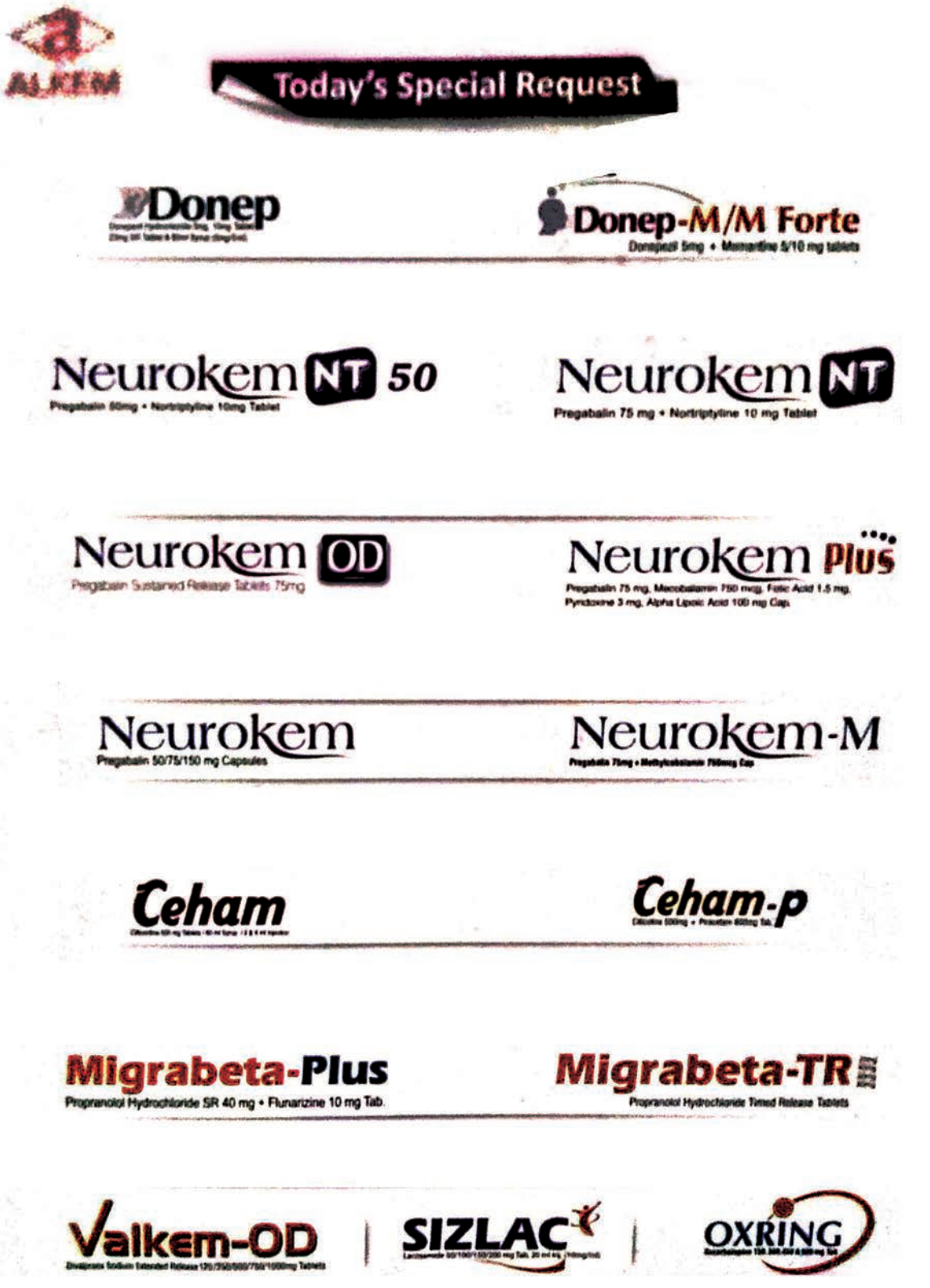

Today's Special Request

Donep

Donep-M/M Forte
Donepezil 5mg • Memantine 5/10 mg tablets

Neurokem NT 50
Pregabalin 50mg • Nortriptyline 10mg Tablet

Neurokem NT
Pregabalin 75 mg • Nortriptyline 10 mg Tablet

Neurokem OD
Pregabalin Sustained Release Tablets 75mg

Neurokem Plus
Pregabalin 75 mg, Mecobalamin 750 mcg, Folic Acid 1.5 mg,
Pyridoxine 3 mg, Alpha Lipoic Acid 100 mg Cap.

Neurokem
Pregabalin 50/75/150 mg Capsules

Neurokem-M

Ceham

Ceham-p

Migrabeta-Plus
Propranolol Hydrochloride SR 40 mg • Flunarizine 10 mg Tab.

Migrabeta-TR
Propranolol Hydrochloride Timed Release Tablets

Valkem-OD

SIZLAC

OXRING

With Compliments from

Levera

Levetiracetam 250 / 500 / 750 / 1000 mg Tabs & 100 mg / ml Sol.

Leverage to Life

Rejunex CD3

Vitamin D3 1000 IU + Calcium Carbonate 500 mg + Methylcobalamin 1500 mcg + Alpha-Lipoic Acid 200 mg + Benfotiamine 150 mg + Inositol 100 mg + Chromium Picolinate 200 mcg + Pyridoxine 3 mg + Folic Acid 1.5 mg Tabs

A wall of Protection

Zevert PVG NF

Betahistine 16 mg + Piracetam 400mg + Vinpocetine 5mg + Ginkgo Biloba Extract 60 mg + Cholecalciferol 400 I.U. Tabs

The Complete Care

Rexipra

Escitalopram 5/10/15/20 mg tabs

Provides more... with less !

ALTIMA | INTAS
A DIVISION OF INTAS

WITH BEST COMPLEMENTS FROM

LUPIN MINDVISION

Makers of .....

STALOPAM PLUS

(ESCITALOPRAM10mg+CLONAZEPAM.5mg)

Welcome to Kolkata's most advanced Eye Hospital

PBA EYE

Priyamvada Birla Aravind Eye Hospital
Lasik Department

With Best Compliments from :–

A

WELL-WISHER

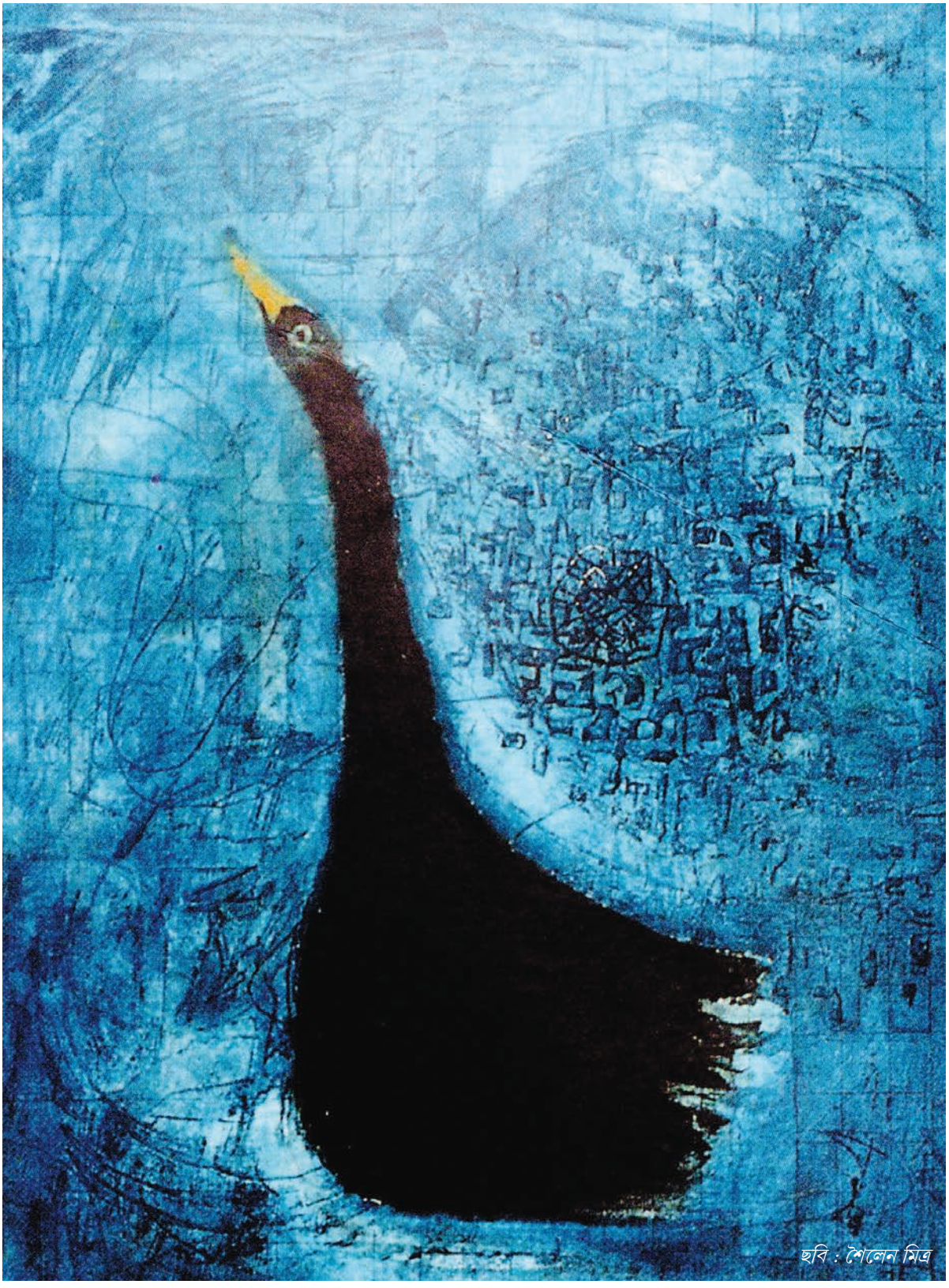

ছবি : শৈলেন মিত্র

Because,
in **Neuropathy**

Gabapin is Safer & Tolerable than Pregabalin

GST

means

1. Rudroju N, Bansal D, Talakokkula ST, Gudala K, Hota D, Bh
and anticonvulsants in painful diabetic neuropathy: a networ
2. Haanpää ML, Gourlay GK, Kent JL, Miaskowski C, Raja SN,
Neuropathic Pain and Other Medical Comorbidities. Mayo Cli

Aquila (A Division of INTAS) | INTAS

Issue date 1st October 2019. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 7, Issue 19-20 Arek Rakam

Peerless Hospital
And B. K. Roy Research Centre

your destination for ethical healthcare

most prompt and appropriate emergency response

maximum clientele satisfied; accounting for repeat footfall / references

services are offered across 40 medical and surgical specialities

Committed to create trust and confidence in private *Healthcare*

- Strong emphasis on Clinical Audits and Clinical Excellence
- A teaching Hospital with NABH accreditation
- Exceptional value for money

25 Years

Thank you for your trust

★ ★ ★ ★ Google review

"Dated- 29th August 2019"

Peerless Hospital & B. K. Roy Research Centre

360 Panchasayar, Kolkata-700094
Ph : 033 24320075 / 4849 24x7 HelpLine : 033 4011 1222 Appointment cell: 033 4033 3333
E-mail : ph.enquiry@peerlesshospital.com Website: www.peerlesshospital.com

NABH

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.